আমাদের
সিরাজউদ্দৌলা
কিছু গল্পকথা

নবাবজাদা আলি আব্বাসউদ্দৌলা

আমাদের

সিরাজউদ্দৌলা

কিছু গল্পকথা

[প্রকৃত- পরিবেশ ♥ ইতিহাস-ঐতিহ্য ♥ বন্ধন-ভালোবাসা]

নবাবজাদা আলি আব্বাসউদ্দৌলা

১৯ সেপ্টেম্বর নবাব সিরাজউদ্দৌলার
২৮৮তম শুভ জন্মদিনে
আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

আলীগড় লাইব্রেরী
১৫৮ ঢাকা নিউ মার্কেট, ঢাকা-১২০৫
ফোন- ৯৬৬২৯৪২, ০১৭১১-৫২৮৪৪৬

www.pathagar.com

আমাদের সিরাজউদ্দৌলা কিছু গল্পকথা
নবাবজাদা আলি আব্বাসউদ্দৌলা

প্রকাশক
মোহাম্মদ জুম্মা
আলীগড় লাইব্রেরী
১৫৮ ঢাকা নিউ মার্কেট, ঢাকা-১২০৫
ফোন- ৯৬৬২৯৪২, ০১৭১১-৫২৮৪৪৬
email : aligarhnewmarket@gmail.com

©
গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ISBN : 978-984-91473-6-7

প্রকাশকাল
১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ নবাব সিরাজউদ্দৌলার শুভ জন্মদিনে

মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ জুম্মা

মুদ্রণ
আলীগড় প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৪৯/২ নর্থ সার্কুলার রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫

পরিবেশক
আলীগড় লাইব্রেরী
১৫ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

উৎসর্গ

তবুও বাঁধন...
এই বাঁধন দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী,
নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশসহ
এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সাথে।
এই বাঁধন শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ তারিক চৌধুরীর
(বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও শিল্প উদ্যোক্তা) সাথে,
আমার হৃদয় ছোঁয়া ভালোবাসার
এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করছি আপনাদের প্রত্যেককে।

www.pathagar.com

প্রারম্ভিক কথা

প্রকৃতি-পরিবেশ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, বন্ধন-ভালোবাসা সভ্যতার প্রামান্য দলিল। যেকোনো জাতরি গৌরবময় অগ্রযাত্রায় ইতিহাস অনন্য ক্রিয়াশীল ভূমিকা রাখতে পারে।

সৃজন ও সীমক্ষার ক্ষেত্রে মানুষ সব সময় সন্ধান করে পূর্বপুরুষদের, খুঁজে বেড়ায় অতীতকে। অতীতের সবকিছু নির্বিচারে গ্রহণ না করলেও অতীত শক্তি যোগায় নতুন পথে এগুবার, পথেয় হয় পথ চলার। সময় সবকিছুকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পালায় কিন্তু পারে না একেবারে মুছে দিতে, নিজের অজান্তেই রেখে যায় চিহ্ন। এ চিহ্নটুকু ছাপার অক্ষরে ধরে রাখার জন্যেই এই প্রয়াস।

বন্ধুরা উক্ত বইটিতে শুধু চেয়েছি হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে তুলে ধরতে, তা করতে গিয়ে অতীতকে দেওয়া হয়েছে প্রাধান্য। তারপরও অনেক কিছুর খোঁজ নিতে পারিনি সময় ও সাধ্যের সীমাবদ্ধতায়। তথ্য-উপাত্ত, ভালোবাসা, সাহস দিয়ে সহযোগিতা করেছেন জনাব জুম্মা (আলীগড় লাইব্রেরী, নিউ মার্কেট, ঢাকা); সিনিয়র সাংবাদিক উম্মুল খায়ির ফাতিমা; রাবেয়া বেবী (মহিলা অঙ্গন, দৈনিক ইত্তেফাক); রঞ্জু চৌধুরী (শৈলি, দৈনিক সমকাল); বিউটি আক্তার (আমার জীবন, দৈনিক আমারদেশ); সিনিয়র সাংবাদিক ফকরে আলম (দৈনিক কালের কণ্ঠ); রেদওয়ানুল হক (সাহিত্য, দৈনিক সংগ্রাম); রেহানা পারভীন রুমা (আমার জীবন, দৈনিক আমারদেশ); এ. কে. এম. মাহবুব উল হক (সাবেক আই জি, বাংলাদেশ পুলিশ); ড. মুহাম্মদ ফজলুল হক (প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়); ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ গোলাম মোস্তাফা (নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৮ম বংশধর); তরুণ রাজনীতিবিদ মুহাম্মদ তারিক চৌধুরীসহ আরও অনেকে। প্রত্যেককে আমি শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। উক্ত বইটি নতুন প্রজন্মের মাঝে ভালোবাসার সৌরভ ছড়াবে এই শুভ কামনায় আমি ঐতিহ্যের ৯ম প্রজন্ম সকলকে সব বিভেদ ভূলে লাল সবুজের পতাকা তলে, দেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে এক হবার আহ্বান জানাই।

নবাবজাদা আলি আব্বাসউদ্দৌলা
হ্যালো : ০১৯১২৮১৫৯৪০

www.pathagar.com

সূচীপত্র

হৃদয়ের বন্ধনে Shab ৯
স্বাগতম ... বন্ধুত্বের বাগানে ১০
বাংলার গর্ব নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবার ১২
হৃদয়ের বন্ধনে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ১৮

আলিবর্দী খাঁর পিতৃভূমি ইরাক

মরুর দেশে ২৩
শান্ত স্নিগ্ধ এক শহর ২৮
নাজাফ ৩৪
কুফা ৩৭
ফোরাত নদের শহরে ৪২

আলিবর্দী খাঁর মাতৃভূমি ও জন্মভূমি ইরান

পারস্যের গল্পকথা ৪৮
হৃদয়ে ছোঁয়া ভালোবাসা ৪৯
অপরূপ ইরান ৫৬
সৌন্দর্যের দেশে ৬২
পৃথিবীর স্বর্গ ইস্পাহান ৬৭
কাশান ৭২
তেহরান ৭৩
কোম ৭৮
মাশহাদ ৮২
শাহনামা খ্যাত কবি ফেরদৌসির সমাধিতে ৮৭
সাত রঙের দেশে ৯০
পারস্যের ফুলবনে ৯৩
পারস্যের সৌরভ ৯৭

ঐতিহ্যের ছোঁয়ায় ইন্ডিয়া

বীর দেশপ্রেমিক সিরাজউদ্দৌলার জন্মভূমিতে ১০৬
দার্জিলিং ১০৯
ইতিহাসের শহর আলিনগর ১১১
দীঘা টু উড়িষ্যা ১১৪
নানান রঙে রঙিন গোয়া ১১৬
চীন ও ভারতের সীমান্ত পথে ১১৯
নবাব সিরাজউদ্দৌলা শূন্য করুন বাংলা ১২০

www.pathagar.com

লাল সবুজের হৃদয়ে বীর সিরাজউদ্দৌলা ১২৭
রঙে ঢঙে ঢাকা ১৩৪
- ঢাকার ঐতিহ্য মসলিন ১৩৯

ঢাকার হৃদয়ে ঐতিহাসিক নিদর্শন ১৪১
- সেই বেগুনবাড়ি ১৪৪
- সেই পিলখানা ১৪৪
- চার্লস ড'য়লির দৃষ্টিতে ঢাকা ১৪৪
- বড় কাটরা ১৪৫
- আহসান মঞ্জিল ১৪৫
- লালবাগ কেল্লা ১৪৬
- শিশু পার্ক ১৪৭
- নন্দন পার্ক ১৪৭
- চন্দ্রিমা উদ্যান ১৪৭
- শিশু মেলা ১৪৭
- ওয়াটার কিংডম ও ফ্যান্টাসি কিংডম ১৪৭
- বোটানিক্যাল গার্ডেন ১৪৭
- যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলা ঢাকায় ১৪৮
- ঢালিউডের মুকুটহীন সম্রাট ১৪৮
- ঢাকায় নবাব পরিবার ঃ ১৫০
- ঢাকায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিষদ ১৫১
- ঢাকার বাতাসে ভালোবাসার রং ১৫৬
- ঢাকার অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে ১৬০
- হোসাইনি দালান ১৬০
- ফুলে ফুলে সাদা ঢাকা ১৬১
- ঢাকায় বিদেশি শিক্ষার্থী ১৬৩
- ফালসা ১৬৪
- ঢাকার বাগানে নিম ১৬৪
- ঢাকার মিষ্টি ১৬৫
- ঢাকাই জামদানি ১৬৬
- জাতীয় স্মৃতিসৌধ ১৬৬
- ধামরাইয়ের তামা-কাঁসা-মৃৎশিল্প পাড়ায় ১৬৭
- রায়েরবাজার পালপাড়ায় ১৬৮
- ঢাকার রমনা পার্ক ১৬৯
- বুলবুলি ১৭০

www.pathagar.com

- পাখিপ্রেমী নারী ১৭১
- ঢাকায় ওড়ে কত পাখি ১৭২
- চিড়িয়াখানা ১৭৪
- টমটম ১৭৫
- বইল গাড়ি ১৭৬
- বাংলার তাজমহল ১৭৬
- বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর ১৭৭
- ঢাকার বসন্তে ফুলের বাহার ১৭৭
- ঢাকার বাগিচায় তুলসী ১৭৮
- অতিথি পাখি ১৭৯
- প্রকৃতির নাচন ১৭৯
- ফাগুনের ঢাকা ১৮০
- মোহাম্মদপুরে মোস্তাকিমের কাবাব ১৮১
- সেন্ট যোসেফ ১৮১
- ফলবীথি হর্টিকালচার সেন্টার ১৮১
- মোহাম্মদপুরে কাপড়ে কারচুপি ১৮২
- নবান্ন উৎসব ১৮২
- ঢাকার বাংলা নববর্ষ ১৮৩
- প্রাণের ঢাকা ১৮৪

কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর ১৮৬
শান্ত স্নিগ্ধ খুলনা ১৯২
রানী ভবানীর নাটোরে ১৯৫
পুণ্ড্রনগরী বগুড়া ১৯৬

বাংলার যুবরাজ
সৈয়দ গোলাম আব্বাস (আরেব) ১৯৮

ঐতিহ্যের ফুল
সৈয়দা হোসনে আরা বেগম ২০৩

ঐতিহ্যের তারকা প্রোফাইল
সৈয়দ গোলাম মোস্তফা ২০৯

ঐতিহ্যের মিষ্টি আলো
গুলশান আরা বেগম ২১২
বাংলার গর্ব নবাব সিরাজ পরিবারের স্মরণীয় দিবসসমূহ ২১৩
ঐতিহ্যবাহী বেগম লুৎফুন্নিসা পরিবারের স্মরণীয় দিবসসমূহ ২১৪
সমকালীন প্রতিক্রিয়া ২১৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হৃদয়ের বন্ধনে Shab

Shab একটি ফার্সি শব্দ। সুন্দর অনেক কিছুর মাঝেই এর অবস্থান, কেউ বলে একে... সুন্দর, কেউ বা বলে... রাত্রি। আর আমরা বন্ধুরা Shab-কে পেয়েছি প্রকৃতি আর ঐতিহ্যের ছোঁয়ায়। তাইতো Shab রয়েছে ফুলের সৌরভে হৃদয়ের বন্ধনে।

সুন্দরের আরেক নাম Shab। রোজ রোজ পৃথিবীর সৌন্দর্যে চুপিসারে দেয় উঁকি এক দুষ্ট রবি। আকাশের বুক জুড়ে আলো-ছায়ার খেলা করে আঁকে প্রভাত ছবি। ঝিরি ঝিরি বাতাসে ভেসে আসা সুবাসে মনে লাগে দোল, কোনো এক পরশে কি জানি কি আবেশে হৃদয় ব্যাকুল। পাল তোলা নাও চলে বয়ে যাওয়া নদী জলে, মাঝি ধরে গান, পাখি তার ডানা মেলে ছুটে যায় দূর নীলে ফেলে পিছুটান। দীঘল ঐ মাঠে, হায় সবুজের দেখা পাই, ধান রাশি রাশি দিগন্ত সীমানায় রোদ্দুর ছুঁয়ে যায় প্রভাতের হাসি।

এরই মাঝে তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে বন্ধুত্বের আলোকচ্ছটায় ফুলের সৌরভ ছড়াতে শুরু করেছে। সে কি গুঞ্জরণ! পাখির কলরব! বাতাসে উড়ে যাচ্ছে প্রজাপতির ডানায় ঐতিহ্যের ভালোবাসার সুবাসিত মিষ্টি আহ্বান।

আমরা একঝাঁক তরুণ Shab বন্ধুত্বের বন্ধনে। ভালোবাসি প্রকৃতিকে, খুব বেশি ভালোবাসি, যতটা ভালোবাসে ঐ পাখি তার আকশটাকে, পাহাড় তার ঝরনাকে, মেঘ তার বৃষ্টিকে, ভ্রমর তার ফুলকে। ভালো যদি লাগে প্রকৃতির ভালোবাসায় ঐতিহ্যের বন্ধনে বন্ধুত্বের আনন্দে হারিয়ে যাওয়ার এই আহ্বান। তবে স্বপ্ন সাজে এসো বন্ধু হাত বাড়ায় Shab বন্ধুত্বের হৃদয় মাঝে।

(দৈনিক আমার দেশ, আমার জীবন, ২৯ মার্চ, ২০১০)

ছোট্ট একটি পৃথিবী, যার প্রতিটি কণা ভালোবাসায় পূর্ণ, বলতে পারি প্রকৃত ভালোবাসার মিষ্টি বন্ধন নেই আজ কোথাও, কখনও সম্পর্কের সোনালি সুতোয় ছিল বাহারি ফুলের কারুকাজ, আজ সেই সুতোয় কারুকাজ অনেকটাই ম্লান। বেশি সময় নাই বা থাকি এ জগতে তাতে কি? তবুও পৃথিবীর এককোণে গড়ে তুলব এমন এক সম্পর্কের অটুট বন্ধন। যার সত্য কাহিনী যুগ যুগ ধরে থেকে যাবে সবার মুখে মুখে। উদাহরণ হবো আমরা প্রকৃত বন্ধুত্বের সম্পর্ক হবে এমনই, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হবে আরও রঙিন। এমনি এক সম্পর্কের অনন্য ভুবন গড়তে উদ্যোগী Shab ফ্রেন্ডশিপ গার্ডেন। 'Shab' অর্থ সুন্দর। এ এমন এক মিলনমেলা যেখানে তরুণরা সমবেত হবে এমন এক ছাদের নিচে, যেখানে

www.pathagar.com

থাকবে না কোনো ফাটল, থাকবে না হিংসা-বিদ্বেষ, ভুল বোঝাবুঝি, হবে শুধু Shab বন্ধুত্ব মানুষ আর প্রকৃতির মাঝে। প্রকৃতিপ্রেমী তরুণরা ভালোবাসবে সুবাসিত ফুল, ভালোবাসবে প্রজাপতির ছুটে চলা, ভালোবাসবে পাখিদের কোলাহল, ভালোবাসবে স্বচ্ছ পানিতে মাছ ও ডলফিনদের দৌড়ঝাঁপ, ভালোবাসবে সবুজঘেরা বনে হরিণের পাল আর খরগোশদের ছুটেচলা, ভালোবাসবে উঁচু-নিচু সবুজ পাহাড়, ভালোবাসবে তারায় ভরা চাঁদনি রাত, ভালোবাসবে অপরূপ আশ্বিন, ভালোবাসবে প্রকৃতির সুন্দর সব সৃষ্টি। প্রকৃতির সৌন্দর্যের গভীরতায় হারিয়ে যেতে চলুন বেরিয়ে পড়ি নতুন কোনো সৌন্দর্যের খোঁজে। ঐতিহ্য আর প্রকৃতির মাঝে বন্ধুত্বের স্পর্শ খুঁজতে Shab -এর আয়োজন।

(২৮.৯.২০০৯ দৈনিক আমার দেশ, আমার জীবন)

স্বাগতম ... বন্ধুত্বের বাগানে

ইট-কাঠের এই শহুরে জীবনে, প্রতিটি দিনই যেন কর্মব্যস্ত মানুষের ছুটে চলা। আর দিনের শেষে ক্লান্ত শরীর নিয়ে ঘরে ফেরা। জীবনটা এখানে একদম নিরামিষ তাই মন চায় দূরে কোথাও প্রকৃতির মাঝে সুন্দর মনের বন্ধুদের সাথে হারিয়ে যেতে। কিন্তু সমস্যা, লম্বা ছুটির সঙ্গে দলবেঁধে বন্ধুরা মিলে ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ কমই আসে ব্যস্ত নাগরিক জীবনে। তবে সম-মনা বন্ধু থাকলে আর সত্যি সত্যি 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা....' মনটা থাকলে প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া মোটেও কঠিন কিছু নয়। পা বাড়ালেই মিলবে ঘাস-ফুল নদী-সমুদ্র-পাহাড়-পর্বত-অরণ্য-পশুপাখি-প্রকৃতির অপূর্ব সব সৌন্দর্য। গ্রামবাংলায় পাবে মমতাময়ী মায়ের আদর-ভালোবাসা আর আপ্যায়ন, ঠিক যেমনটি আমার মা আমায় ভালোবেসেছিল বা আপনার মা আপনাকে ভালোবেসেছিল, অনেকটাই সেরকম। এসব কিছুই সম্ভব এই অপরূপ রূপসী বাংলায়। কারণ রূপসী বাংলার প্রকৃতির সাথে মিশে প্রকৃতির মতো উদার মন, মমতায় ভরা মনের অধিকারী বাংলার মানুষ, বাংলার মায়েরা, বাংলার প্রকৃতি। শুধু বেরিয়ে পড়ার অপেক্ষা। তাই, যেমন কথা তেমন কাজ। কখনো দলবেঁধে, কখনো বা দু'তিন জনসম-মনা বন্ধু মিলে দেশ-বিদেশ ভ্রমণে উপভোগ করলাম প্রভাতে শিশির ধোয়া দুর্বাঘাসের পরে বৃত্তমুক্ত শেফালির লুটোপুটি, উদাসী বাতাসে কাশফুলের হিল্লোল আর শুভ্র মেঘের রথে শরৎ সুন্দর আশ্বিনকে। কখনো ধানখেতের সমারোহ, ফুলে ফুলে সাদা কাশবন, টগর, গোলাপ,

www.pathagar.com

হাসনাহেনা, মালতিলতা, জবা, জিনিয়া, অপরাজিতা, বনতলে দোপাটির বাহার, আর সেই সঙ্গে উপভোগ করলাম দেশ বিদেশের সৌন্দর্য। চোখে ধরা দেয় নানান দেশের অপরূপ সব সৌন্দর্য.... গাছ-গাছালি পশুপাখি আর উঁচু নিচু পাহাড়। ফাল্গুনে ঘুরে এলাম নেত্রকোনা। উপভোগ করলাম সুমেশ্বরী নদী-বিজয়পুর পাহাড়ি এলাকা। মন মাতানো এক অভিজ্ঞতা। মনে পড়ে, মাস্তি-ফান আর বন্ধুত্বের স্মৃতি লাউয়াছড়ার পথে। স্মৃতিতে ঘুরে ফিরে বারবার আসে... রাজকিয় মুর্শিদাবাদ ভ্রমণের সুন্দর কিছু স্মৃতিকথা। মনে পড়ে কলকাতায় কাটানো দিনগুলো। উপভোগ করলাম লালমনিরহাটের বাউরা বাজার, জামগ্রাম। উক্ত গ্রাম ভারত সীমান্তের কাছে অবস্থান করাতে নো ম্যানস ল্যান্ডে অবস্থান কারী বাংলাদেশি ও ভারতীয়দের জীবনযাত্রা দেখার সুযোগ হলো। খুব কাছ থেকেই দেখতে পেলাম কিছু কাঁটাতারের বেড়া কীভাবে দু'দেশকে বিভক্ত করে রেখেছে। পাটগ্রামে অবস্থিত তিন বিঘা করিডোর খুবই সুন্দর দর্শণীয় একটি স্থান। না দেখলে জীবন বৃথা হয়ে যেত। লালমনিরহাট ভ্রমণ আমার কাছে সত্যিই খুবই স্মরণীয়। সিলেটের মাধবকুণ্ড, জাফলং, সু-দৃশ্য সারি সারি চা বাগান সেই সাথে কিছু স্মৃতি নয়নে আজও ভাসে। মন চায় আবারো হিমালয় কন্যা নেপাল ড্রাগনের দেশ ভুটান আলোকিত শারজায় ঘুরে আসি। আর ঘুরে আসতে মন চায় বন্ধুত্বের ভালোবাসা, আপনজনের স্মৃতিতে ঘেরা শান্ত স্নিগ্ধ ইরান আর ইরাকের সৌন্দর্যের মাঝে।

বন্ধুরা চলুন, ঘুরে আসি আমরা জানা-অজানা পৃথিবীর অপরূপ সব সৌন্দর্যের কাছাকাছি। যেখানে আপনি, আমি, আমরা, আর কিছু সুন্দর মুহূর্ত, প্রকৃতি থাকবে আপন হয়ে। এমনি এক প্রকৃতিতে মিশে যাবার আহ্বান, প্রকৃত অটুট বন্ধুত্বের বন্ধনে। স্বাগতম... আপনাকে।

আসুন... নতুন যুগে, নতুন সম্পর্কের বাগান গড়ি : পৃথিবীতে সুখ বলে যদি কিছু থেকে থাকে তার নাম সুন্দর মিষ্টি সম্পর্ক, তার নাম বিশ্বাস। সুন্দর মনের যদি হয় কেউ, আপনের চেয়ে বেশি আপন, তাহলে ঠিক যায় কেটে দিন-রাত কখন। ছুঁয়ে যেতে প্রাণের গভীরে, বন্ধু আসবে কি তুমি, প্রকৃত আপন হয়ে? সকলের জন্য উন্মুক্ত রইল, সম্পর্কের আকাশ। এসো ভাগাভাগি করে নিই সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলো। উন্মুক্ত করি মুক্ত চিন্তার দ্বার। তবে হাত বাড়াও.... আর চলে এসো বন্ধু, মেতে উঠি আমরা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ বন্ধুত্বে, হাসি-আনন্দ আর উল্লাসে, জীবনের এই ছোট্ট সময়ের সুন্দর পথে। রাঙিয়ে দেই জীবন পৃথিবীর অপূর্ব সব সৃষ্টির রঙে। সকলকে সু-স্বাগতম, এই বন্ধুত্বের বাগানে।

(দৈনিক ইত্তেফাক, তরুণ কণ্ঠ- ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৭)

www.pathagar.com

"বাংলার গর্ব নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবার"

নবাব আলিবর্দী খান, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, বেগম লুৎফুন্নিসা ও বাংলার গর্ব সিরাজউদ্দৌলা পরিবার শুধু নামই নয়... লাল সবুজের হৃদয়ও বটে। তাইতো বাংলার লাল সবুজের হৃদয় জুড়ে গর্বিত এই পরিবার ছিল, আছে, আর যুগ যুগ ধরে রয়ে যাবে সকলের হৃদয় মাঝে।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ঔদার্যের জন্য, বাংলার মানুষের কাছে আজও আলিবর্দী, সিরাজ, লুৎফা নামটি তুলনাহীন। তাঁরা দেশপ্রেম ও বীরত্বগাঁথায় নিজেকেই বিলিয়ে গেলেন লাল সবুজের মাঝে। তাইতো তাঁরা সকলেই এদেশের মাটি-আলো-হাওয়ায় আজও মিশে আছেন।

নবাব আলিবর্দী খান, বেগম শরফুন্নিসা, আমিনা বেগম, জয়েন উদ্দিন, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, বেগম লৎফুন্নিসা, উম্মে জোহরা প্রত্যেকে ছিলেন বিশাল সুন্দর মনের মানুষ। তাঁদের পারিবারিক চিন্তা-চেতনাও ছিল ভীষণ সুন্দর, দায়িত্ববোধ মানুষ শুধু পারিবারিক সীমানার মধ্যে নির্দিষ্ট ছিল না, দূরের লোকজনের প্রতিও ছিল তাঁদের সমান সহানুভূতি ও সহমর্মিতা। সকলকে সাহায্য করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতেন প্রত্যেকে। সুখে-দুঃখে বাংলার মানুষের বন্ধু হয়ে পাশে থাকতেন তাঁরা।

মোগল আমলে রাষ্ট্রীয় ভাষা ফার্সি থাকলেও নবাব আলিবর্দী, নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁদের প্রিয় পরিবার বাংলার প্রকৃতি, সংস্কৃতি, ভাষা, আচার-ব্যবহারের অনেক কিছুকেই বড্ড বেশি আপন করে নিয়েছিলেন। তাঁরা ফার্সি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় সমান দক্ষতা রেখেছিলেন। তাইতো নবাব আলিবর্দী ও সিরাজউদ্দৌলা, তাঁদের প্রিয় পরিবার-পরিজন নিয়ে লাল সবুজের হৃদয়ে বাংলা নববর্ষ, বসন্ত উৎসব, নবান্ন উৎসব ভালোবাসার বন্ধনে পালন করতেন। তাঁরা সকল ধর্ম বর্ণ গোত্রের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। তাইতো তাঁদের শাসনামলে সকল ধর্মীয় উৎসব পালন হতো হৃদয়ের বন্ধনে।

নবাব আলিবর্দী, নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁর প্রিয় পরিবার বাংলার সুখে হতেন সুখী আর বাংলার দুঃখে হতেন দুঃখী। তাঁরা অত্যন্ত উদার মনের মানুষ ছিলেন। কারো কোনো বিপদের খবর শুনলে সবার আগে সাহায্যের জন্য দৌড়ে যেতেন, যে যার অবস্থান থেকে। যুগের ব্যবধানে আজও নতুন যুগে লাল সবুজের হৃদয়জুড়ে আলিবর্দী-শরফুন্নিসা, আমিনা-জয়েনউদ্দিন, সিরাজ-লুৎফা-উম্মে জোহরার ভালোবাসার বন্ধনের গল্প মিশে আছে লক্ষ কোটি প্রাণে। বাংলার মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, কিষাণ-কিষাণী, শ্রমিক-মজুর, জেলে-তাঁতিসহ সকল

www.pathagar.com

শ্রেণির মানুষ ও প্রকৃতির সাথে নবাব আলিবর্দী ও সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের এক নিবিড় আত্মিক স্পর্শ রয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে বাংলার গর্বিত এই বীর দেশপ্রেমিক পরিবারের ভালোবাসার সুর আজও বেজে উঠে লাল সবুজের হৃদয় জুড়ে।

বিশিষ্ট সমাজসেবক মুহাম্মদ তারিক চৌধুরী বলেন, "প্রাচীনকালে বাঙলা বলতে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে বুঝানো হতো, বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, গৌড়, বঙ্গ, হরিকেল, সমতট, বঙ্গাল প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন বাঙলার সীমাও অপরিবর্তিত ছিল না। মুসলমান শাসনমলে সর্বপ্রথম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল একত্রে 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিত হতে শুরু করে এবং মোগল আমলের ১৫১৬ইং সাল হতে ১৭৫৭ইং সালের নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যু পর্যন্ত বাংলার সুলতান/নবাবদের শাসনকার্য পরিচালিত হতে দেখা যায়। বিশেষভাবে বাংলা পুনঃএকত্রিত হয় যার সময়কাল ছিল ১৬১৬ইং সাল, উক্ত সময় হতে ১৭৫৭ইং সালের নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যু পর্যন্ত। বীর দেশপ্রেমিক আলিবর্দী খাঁ বাৎসরিক খাজনার বিনিময়ে মোগল সম্রাট হতে বাংলার নবাবি গ্রহণ করেন এবং যা পরবর্তীতে বীর দেশপ্রেমিক মীর্জা মোহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলার ২৩ শে জুন ১৭৫৭ইং সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। অর্থাৎ পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ সূর্য অস্তমিত হয়। পরবর্তীতে মীরজাফর ও তাঁর পরিবার বাংলার নবাব হিসেবে পরিচিত হলেও এরা ছিল ব্রিটিশদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাজানো পুতুল নবাব। দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও পতনের মূল কারণ ছিল ৩টি। প্রথমত, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতি মীরজাফর ও অন্যান্য সেনাপতি ও সৈন্য বাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতা।

দ্বিতীয়ত, মোগল সম্রাটদের গৃহকেন্দ্রিক রাজনীতি ও শাসনকার্যের অচলাবস্থা এবং তৃতীয়ত, যা মূল ভূমিকা হিসেবে বিবেচ্য- বাঙলার জনসাধারণের মধ্যে অর্থ সম্পদ রক্ষা ও অধিক লোভ লালসার কারণে ২৩ জুন ১৭৫৭ইং সালে পলাশী পতনের পর হতে ২রা জুলাই ১৭৫৭ইং সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যু পর্যন্ত এ অঞ্চলের জনসাধারণ নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ও মোহগ্রস্ত ছিল। বিশেষভাবে বিশ্লেষণযোগ্য যে, পলাশী চক্রান্তের যৌক্তিকতা খুঁজে বের করার জন্যে ইংরেজ ও কিছুসংখ্যক হিন্দু ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনার নামে কত কিছুই না লিখেছেন। তারা এক্ষেত্রে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টায় বহু কাল্পনিক কাহিনী রচনা করেছেন। তারা নানাভাবে নবাব পরিবারসহ নবাব সিরাজের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে খাটো করে পলাশীর ইতিহাসকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাস ইতিহাসের গতিতে চলে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে না। সাময়িকভাবে তারা কিছুটা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে

www.pathagar.com

পারে। কিন্তু ব্যাপক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এসব উত্তেজনা কাজে আসে না। ব্রিটিশ শাসনামলে যা কিছু লিখিত হয়েছে, তা সবই মুসলিম নবাব/সুলতানদের সত্য ইতিহাস বিকৃত করে লেখা, ঠিক তেমনই বীর দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজকে খাটো করার লক্ষ্যে বাঙলার প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করা হয়। ফলে তৎকালীন মুসলিম শাসকদের পক্ষে প্রামাণ্য দলিল ও রচনার মতো সাহসী ব্যক্তিত্বের সন্ধান তেমন পাওয়া যায় না। যেমন ১৭২৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলায় জন্মগ্রহণকারী নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে মাত্র ১৪ মাস ১৪ দিনের মধ্যে পূর্ণিয়া থেকে আলীনগর হয়ে পলাশী পর্যন্ত ১১০০ মাইল পথ চলতে হয়েছে, পাঁচটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতে হয়েছে, তাকে তো আলেকজান্ডারের চেয়েও দ্রুতগতিতে পথ চলতে হয়েছে। দিন কাটাতে হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা অশ্বপৃষ্ঠে, রাত কাটাতে হয়েছে ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করে। অর্থাৎ ইতিহাস বিকৃতকারীদের দ্বারা রচিত ইতিহাস যেমন সাহসী বীর সিরাজউদ্দৌলাসহ মুসলিম শাসনের প্রকৃত ইতিহাস ধ্বংস করার প্রয়াসে অনেক মিথ্যা ইতিহাস রচনা করে গেছেন ঠিক তেমনি পরবর্তীতেও তাদের কর্মতৎপরতা চলছে। বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থা মূল্যায়ন করা যায় শুধু ১৭৫৭ইং তৎকালীন বাংলার অবস্থার মতন। আমাদের বর্তমান শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেয়েছে তথাপি অর্থ সম্পদ রক্ষা ও অধিক লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে বাংলাদেশের জনগণ এক প্রান্তিক সময় অতিক্রম করছে। যার দরুন দেশ আজ চরম অনিশ্চয়তায় আছে। বাংলাদেশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বঙ্গীয় অঞ্চলে মানুষ এবং অত্র অঞ্চলে সমাজ সর্বসময় নিগৃহীত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, বঞ্চিত ও শোষিত অঞ্চল ও সমাজের অংশ হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে পরোজাতি যখন ঘুরে দাঁড়ানোর ও আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার আশায় বুক বেঁধেছিল তখন থেকে আমাদের এ প্রাণপ্রিয় জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধার পরিকল্পনা অনুযায়ী এই জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উচ্চাভিলাষকে কাজে লাগিয়ে আবার পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার পাঁয়তারা শুরু হয় যা প্রতিনিয়ত অতিক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। লাল সবুজের বাংলাদেশে কার্যকর স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য বাংলার বীর সন্তান দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজউদ্দৌলার মতো সৎ, নীতিবান, ত্যাগী, নির্ভীক, ঈমানদার, দেশপ্রেমিক নেতার প্রয়োজন। তাহলেই খুব স্বল্প সময়ে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। এগিয়ে যাবে বীর নবাব সিরাজের আদর্শ, চেতনা, ভালোবাসা বুকে লালন করে বহুদূর। মোগল স্বাধীন বাঙলার নবাব আলিবর্দী খাঁর প্রপৌত্রী ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার কন্যা উম্মে জোহরা ওরফে কুদসিয়া বেগম এবং মুরাদউদ্দৌলা (সিরাজউদ্দৌলার ভাই

www.pathagar.com

ইকরামউদ্দৌলার পুত্র)- দের নবম রক্তধারা সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেবের সাথে আমার পরিচয় ৯ই আষাঢ় ১৪২১ বাংলা সনে।

পরিচয়ের কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের সম্পর্ক খুবই গাঢ় বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থানে চলে গেল। জনাব আব্বাস আরেব (নবাবের ৯ম বংশধর) এর ব্যবহার, কথপোকথন আমাকে এমনই মোহিত করেছে যে, এক কথায় আমি মুগ্ধ। আলাপচারিতায় জানতে পারি দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজউদ্দৌলার আদর্শ, চেতনা, ভালোবাসায় এক নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তরুণ প্রজন্মকে সাথে নিয়ে হাতে হাত রেখে হৃদয়ের বন্ধনে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর প্রতিটি কাজ ব্যতিক্রমধর্মী, গবেষণা ধর্মী ও প্রশংসনীয়। তাঁর এই মহৎযাত্রায় সঙ্গী হতে পেরে আমি গর্বিত। হৃদয় ছোঁয়া ভালোবাসায় গড়া ঐতিহ্যবাহী নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের সকল উদ্যোগ সফল ও প্রতিষ্ঠিত হোক লাল সবুজের হৃদয় জুড়ে, লাল সবুজের প্রতিটি হৃদয়ের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বাংলার যুবরাজ সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেব- কে।"

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ ফজলুল হক বলেন, "বাঙলার দেশপ্রেমিক বীর নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে আমার লেখা প্রতিটি বইয়ের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দীর্ঘ কয়েক বছর হাজারের উর্ধ্বে চিঠি এসেছে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে গবেষণাধর্মী আরও কিছু নতুন বই ছাপানোর জন্য। আমরা দেশপ্রেমিক জনতা এটাও উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব বাঙালি মনে এক চিরন্তন ভালোবাসা ও সহমর্মিতার স্থান দখল করে আছেন। বাংলাদেশের গণমন ও জনমত উপেক্ষা করে আমার বর্তমান স্বাধীন দেশের কোনো সরকারই গবেষণাভিত্তিক নতুন ইতিহাস নির্মাণে ভূমিকারা রাখার কথা বিবেচনাও করেনি। এটা দুঃখজনক। নবাব সিরাজউদ্দৌলা-বাংলার স্বাধীনতার জন্যে জীবনদানকারী প্রথম শহীদ বীর। নবাব সিরাজউদ্দৌলা-বাংলার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। নবাব সিরাজউদ্দৌলা- বাংলার প্রতিটি হৃদয়ে হৃদয়ে। তাইতো বলি জনমত উপেক্ষা করার স্পর্ধা যাদের তাদের অন্তত গণতান্ত্রিক বলা যায় না। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ঐতিহাসিক ও শিক্ষক সমাজের কোনো বিশেষ উদ্যোগ আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি। বাংলাদেশের সুশীল সমাজ ও সরকারের মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধহীনতা সত্যিই দুঃখজনক। আমার জীবনের দীর্ঘকালীন গবেষণায় ও নিরপেক্ষ জনমত যাচাইয়ে আমার কাছে স্পষ্টতর হয়েছে যে বাংলাদেশিদের মনে নবাব সিরাজউদ্দৌলা আজও শীর্ষে অর্থাৎ প্রথমে অবস্থান করছেন। তাইতো বাঙালির প্রতিটি দেশিপ্রেমিক মন আজও নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁর প্রিয় পরিবারের আপনজনদের সঠিক ইতিহাস জানার আগ্রহ ও কৌতূহল নিয়ে আমার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা

www.pathagar.com

করে। প্রবাসী বাংলাদেশি, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি, দেশপ্রেমিক যুবসমাজ, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, বাংলার শিক্ষিত সাধারণ জনগোষ্ঠী, কৃষক, জেল, তাঁতি, দিনমজুর সবার মাঝেই এ আগ্রহের সমাবেশ লক্ষ করে আমি আনন্দ পেয়েছি এবং গর্ববোধ করি সিরাজ বাংলার সন্তান, বাংলার গর্ব। তাইতো বহুযুগের ব্যবধানে আজ বাংলার আমজনতা নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারকে বাংলার গর্ব বলে আখ্যায়িত করে।"

২৩ জুন ২০১৪ইং যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে ঐতিহাসিক পলাশী দিবস। জাতীয় প্রেসক্লাব ঢাকার কনফারেন্স লাউঞ্জে সংঘটিত হয়েছে ঐতিহাসিক পলাশী দিবস এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৮ম বংশধর জনাব সৈয়দ গোলাম মোস্তফা ও ৯ম বংশধর নবাবজাদা আলি আব্বাসউদ্দৌলাকে যথাযোগ্য- সেন্টার ফর মিলিটারী হিস্ট্রি ঢাকার পক্ষ থেকে এক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। আলোচনার বিষয় ছিল 'পলাশীর শিক্ষা'। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাবেক সেনাপ্রধান এম. নূর উদ্দিন খাঁন তার বক্তব্যে বলেন, "ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের সম্মান জানাতে হবে।" বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক এম.পি জনাব গোলাম মাওলা রনি দিনটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, "এই অনুষ্ঠানে এসে আমি দিনটির গুরুত্ব আরো বেশি করে উপলব্ধি করতে পারছি। তিনি আরও বলেন, এটা উপরওয়ালার শুকরিয়া যে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৮ম বংশধর ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ গোলাম মোস্তফা ও ৯ম বংশধর সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেব ওরফে নবাবজাদা আব্বাসউদ্দৌলা বেঁচে আছেন। প্রবন্ধ পাঠক ড. রমিত আজাদের সাথে সহমত ঘোষণা করে আমিও বলতে চাই যে, এই ঐতিহ্যবাহী পরিবারটিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হোক। জাপান যদি তাদের রাজবংশকে আড়াই হাজার বছর টিকিয়ে রাখতে পারে, ইংল্যান্ড যদি তাদের রাজপরিবারকে আটশত বছর ধরে রাখতে পারে, তাহলে আমরা কেন বাংলার গর্বিত দেশপ্রেমিক নবাব পরিবারকে (৮ম রক্তধারা সৈয়দ গোলাম মোস্তফা ও ৯ম রক্তধারা সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেব ওরফে নবাবজাদা আব্বাসউদ্দৌলা) মর্যাদা দেব না? আমি ভবিষ্যতে আমার কলামে বিষয়টি নিয়ে লিখব ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও তুলে ধরব।" একে একে আলোচকদের সকলের কণ্ঠে প্রায় একই সুর ছিল... "বাংলার গর্ব নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবার"। আলোচনা সভা শেষে লাল সবুজের প্রতিটি হৃদয়ের গর্ব নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৮ম ও ৯ম প্রজন্ম সৈয়দ গোলাম মোস্তফা এবং সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেব ওরফে নবাবজাদা আলি আব্বাসউদ্দৌলাকে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও সম্মানিত নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে মিডিয়ায় উপস্থিতিতে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

www.pathagar.com

নবাব সিরাজউদ্দৌলা রক্তধারার নবম প্রজন্ম সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেব এর সাথে জনপ্রিয় একুশে টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক ইলিয়াস হোসাইন এবং তরুণ রাজনীতিবিদ মুহাম্মদ তারিক চৌধুরী

নবাব সিরাজউদ্দৌলার শুভ জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে এন টিভির পর্দায় চলচ্চিত্র পরিচালক দেবাশীষ বিশ্বাসের এর সাথে নবাব পরিবারের নবম প্রজন্ম

www.pathagar.com

হৃদয়ের বন্ধনে নবাব সিরাজউদ্দৌলা

১৪২১ বাংলা সালের ৪ আশ্বিন (১৯ সেপ্টেম্বর) এবং ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো বাংলার সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান, লাল সবুজের প্রতিটি হৃদয়ের গর্ব নবাব সিরাজউদ্দৌলার ২৮৭তম জন্মবার্ষিকী। নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিষদ ৪ঠা আশ্বিন ১৪২১ শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকাল তিন ঘটিকায় আজকের সমাজের উজ্জ্বল সব নক্ষত্রের আলোয় আলোকিত করে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ২৮৭তম জন্মবার্ষিকী আলোচনা সভা। সম্মানিত মেহমানদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঐতিহ্যবাহী নবাব সিরাজউদ্দৌলা প্রজন্মের অষ্টম ও নবম বংশধর পিতা-পুত্র জনাব ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ গোলাম মোস্তফা ও সৈয়দ গোলাম আব্বাস ওরফে নবাবজাদা আলি আব্বাসউদ্দৌলা। আরও উপস্থিত ছিলেন নতুন ধারার বাংলাদেশ গঠনের অগ্রজ লাল সবুজের উজ্জ্বল নক্ষত্র তরুণ কণ্ঠ জনাব মুহাম্মদ তারিক চৌধুরী, মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহম্মদ ইব্রাহিম বীর প্রতীক, শিক্ষাবিদ ড. রমিত আজাদ, সিনিয়র সাংবাদিক উম্মুল খায়ের ফাতিমাসহ আরও অনেকে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সম্মানিত সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমান। জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকায় বাংলার গর্ব বীর দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজউদ্দৌলার জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিষদের উজ্জ্বল নক্ষত্র মুহাম্মদ তারিক চৌধুরী।

৪ আশ্বিন (১৯ সেপ্টেম্বর) ১৪২১ শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিষদ আয়োজিত লাল সবুজের বীর পুত্র দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজউদ্দৌলার ২৮৭তম জন্মদিন উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমান বলেন, "সিরাজউদ্দৌলা স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের প্রতীক। দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হলে সিরাজউদ্দৌলার চেতনা হৃদয়ে ধারণ করতে হবে।" লাল সবুজের হৃদয়ের আজ ও আগামীর তরুণকণ্ঠ জনাব মুহাম্মদ তারিক চৌধুরী বলেন, "দেশে কার্যকর স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য নবাব সিরাজউদ্দৌলার মতো সৎ, নীতিবান, ত্যাগী, নির্ভীক, ঈমানদার, দেশপ্রেমিক নেতার প্রয়োজন। তাহলেই খুব স্বল্প সময়ে দেশ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, এগিয়ে যাবে বহুদূর- সেই প্রত্যাশায় দেশবাসীর পক্ষ

www.pathagar.com

থেকে বাংলার গর্ব ঐতিহ্যবাহী নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারেরর ৮ম ও ৯ম প্রজন্ম ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ গোলাম মোস্তফা ও সৈয়দ গোলাম আব্বাসকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। কারণ আপনারাই আমাদের গর্ব, আপনাদের নিয়েই আমাদের এ পথ চলা"।

জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত নবাব সিরাজউদ্দৌলার ২৮৭তম জন্মবার্ষিকীতে (৪ আশ্বিন ১৪২১) বীর দেশপ্রেমিক লাল সবুজের হৃদয় নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৯ম প্রজন্ম নবাবজাদা আলি আব্বাসউদ্দৌলা বলেন ... "১৭২৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলার কোলে সিরাজউদ্দৌলার জন্ম। এই দিনে নবাব আলিবর্দী খানের জন্মদিন থাকাতে নানা-নাতির ভালোবাসার বন্ধন ছিল অনেক মিষ্টি মধুর। সিরাজরা ছিলেন ৩ ভাই, ২ বোন। সিরাজের স্ত্রীর নাম বেগম লুৎফুন্নিসা। একমাত্র মেয়ে উম্মে জোহরা, সিরাজের প্রিয়তমা স্ত্রী বেগম লুৎফুন্নিসা ১৭৬৭ সালে কন্যা উম্মে জোহরাকে ১৪ বছর বয়সে সিরাজের আপন ভাই ইকরামউদ্দৌলার পুত্র মুরাদউদ্দৌলার সাথে বিয়ে দেন। দুই আপন ভাইয়ের ছেলেমেয়ের বিয়ে হওয়াতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের বংশের বাতি জ্বলতে থাকল, যা আজও বর্তমান।

নতুন এই যুগে, ঐতিহ্যের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে ঐতিহ্যবাহী নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের নতুন প্রজন্ম। চলুন বন্ধুরা, ঐতিহ্যের বন্ধনের হাত ধরে আমরা এগিয়ে যাই নতুন স্বপ্নের দিকে। আর লাল সবুজের প্রতিটি হৃদয়কে আলোকিত করি বীর দেশপ্রেমিক সিরাজউদ্দৌলার আদর্শ, চেতনা ও ভালোবাসায়।

বাংলার প্রতিটি হৃদয়ের কাছে আমি দোয়া প্রার্থী। আপনাদের পাশে নিয়েই আমাদের এ পথ চলা। সকলকে, আসসালামু আলাইকুম।"

নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিষদের উদ্যোগে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তে বাংলার বীর সিরাজউদ্দৌলার ২৮৭তম জন্মদিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনে উক্ত সেমিনারে উপস্থিত থেকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ৮ম ও ৯ম প্রজন্ম সৈয়দ গোলাম মোস্তফা ও সৈয়দ আব্বাস আরেবকে যারা দোয়া, ভালোবাসা ও আশীর্বাদ করেছেন... সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমান, বিশিষ্ট তরুণ রাজনীতিবিদ মুহাম্মদ তারিক চৌধুরী, শিক্ষাবিদ ড. রমিত আজাদ, মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহম্মদ ইব্রাহিম বীর প্রতীক, কর্নেল (অব.) শেখ আকরাম আলী, অধ্যক্ষ জি এম সালাহউদ্দীন, সাংবাদিক উম্মুল খায়ের ফাতিমা। সাবেক ছাত্রদল নেতা তালুকদার মোঃ মনিরুজ্জামান মুনির. বীর

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধা বিএনপি নেতা শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর, জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান, মুসলিম লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য নবী চৌধুরী, বিশিষ্ট কলামিস্ট মোঃ নুরুল হুদা চৌধুরীসহ আজকের সমাজের বিশিষ্ট সব ব্যক্তিবর্গ। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল, "অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে নবাব সিরাজউদ্দৌলার আত্মত্যাগের মূল্যায়ন।"

১২ আশ্বিন ১৪২১ (২৭ সেপ্টেম্বর), স্থান গুলশান ক্লাব ঢাকা। উক্ত তারিখে গুলশান ক্লাবের উদ্যোগে বীর দেশপ্রেমিক সিরাজউদ্দৌলার উত্তরসূরি লাল সবুজের হৃদয়ের নবাবের ৯ম প্রজন্ম সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেবকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো জমজমাট সাহিত্য আড্ডা। সেই সাথে সাংস্কৃতিক মনা বুদ্ধিজীবী সমাজ পালন করলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার ২৮৭তম জন্মবার্ষিকী। উক্ত অনুষ্ঠানের মধ্যমণি ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৯ম বংশধর সৈয়দ গোলাম আব্বাস। আর তাঁকে ঘিরেই চলে জাম্পেশ সাহিত্য আড্ডা। আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন আজকের সমাজের উজ্জ্বল সব নক্ষত্র। তাঁদের মধ্যে অন্যতম জনাব এ. কে. এম মাহবুব উল হক (সাবেক আই.জি, বাংলাদেশ পুলিশ), জনাব মুহাম্মদ তারিক চৌধুরী (নতুন ধারার বাংলাদেশ গঠনের অগ্রজ, বিশিষ্ট তরুণ রাজনীতিবিদ), জনাব শেখ জসিমউদ্দিন (বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ), জনপ্রিয় টি.ভি অভিনেত্রী মুনিরা ইউসুফ মেমী, ফ্যাশন ডিজাইনার জনাব নয়ন, a টি.ভির চেয়ারম্যান ও এম.ডি মুহাম্মদ আব্বাস উল্লা, গুলশান ক্লাবের সম্মানিত পরিচালকবৃন্দসহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। গুলশান ক্লাবের পক্ষ থেকে উক্ত অনুষ্ঠান পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন জনাব সৈয়দ আল ফারুক এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ভক্ত নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারকে নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ গবেষণাকারী শ্রদ্ধেয় জনাব এ. কে. এম মাহবুব উল হক। উক্ত আলোচনা সভায় আলোচকরা একে একে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁর পরিবারের প্রতি হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেন। বিশিষ্ট তরুণ রাজনীতিবিদ মুহাম্মদ তারিক চৌধুরী বলেন, "মোগল স্বাধীন বাঙলার নবাব আলিবর্দী খাঁর প্রপৌত্রী ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার কন্যা উম্মে জোহরা ওরফে কুদসিয়া বেগম এবং মুরাদউদ্দৌলা (সিরাজউদ্দৌলার ভাই ইকরামউদ্দৌলার পুত্র) - দের ৯ম বংশধর সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেব এর সাথে আমার পরিচয় ৯ই আষাঢ় ১৪২১ বাংলা সালে, আমার আয়োজিত পলাশী দিবসের এক আলোচনা সভায়। পরিচয়ের কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের সম্পর্ক খুবই গাঢ় বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থানে চলে গেল। নবাবজাদা আব্বাস আরেবের ব্যবহার, কথপোকথন

www.pathagar.com

আমাকে অনেক বেশি মোহিত করে। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ঘিরে তিনি যেসব স্বপ্ন দেখেছেন, সেগুলো বাস্তবায়নে আমি তাঁর পাশে ছিলাম, আছি, থাকব। আপনারাও এই ঐতিহ্যবাহী পরিবারের নতুন প্রজন্মের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সিরাজউদ্দৌলার আদর্শ, চেতনা, ভালোবাসায় গড়া নতুন দিনের বাংলাদেশ গঠনে এগিয়ে আসবেন নিশ্চয়ই।" পাশাপাশি তিনি আরও বলেন... নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁর প্রিয় পরিবারকে নিয়ে আজও ইতিহাস বিকৃতি হচ্ছে এর বিরুদ্ধে তরুণ সমাজকে একসাথে প্রতিবাদী কণ্ঠ তুলতে হবে।

গুলশান ক্লাব ঢাকা আয়োজিত নবাব সিরাজউদ্দৌলার শুভ জন্মদিন আলোচনা সভায় নবাবজাদা সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেব বলেন.. "সিরাজউদ্দৌলা শুধু নামই নয়, লাল সবুজের হৃদয়ও বটে। বাংলার ইতিহাসে দেশপ্রেম আর বীরত্বের কথা খুঁজতে হলে যাদের কথা সবসময় মনে করতে হবে, তাঁদের মধ্যে বাংলার স্বাধীনতার জন্য জীবন দানকারী শহীদ বীরদের শীর্ষের প্রথম নামটি নবাব সিরাজউদ্দৌলা। আজ সিরাজ নেই। তবে তিনি এখনো বেঁচে আছেন আমাদের মাঝে, অন্য রূপ-রঙে আপন কেউ হয়ে, কাছের কেউ হয়ে।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের পাশে থাকার জন্য বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই পরিবারের পক্ষ থেকে আমি ঐতিহ্যের ৯ম প্রজন্ম শ্রদ্ধেয় সকল সাংবাদিক বন্ধুদের এবং উক্ত পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষি সকলকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।"

বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আই.জি, এ. কে. এম. মাহবুব উল হক বলেন, "নবাব সিরাজউদ্দৌলা লাল সবুজের সোনার বাংলাকে ঘিরে যেসব সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা তাঁর শাসন আমলে কিছুটা বাস্তবায়িত হয়, যার সুফল সেকালের বাংলার মানুষেরা ভোগ করেছে। আর লাল সবুজকে নিয়ে বাকি সব স্বপ্ন বাস্তবায়নের আগেই দেশি- বিদেশি বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন, তাদের কর্তৃক নিহত হন। বীর দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজউদ্দৌলার অসম্পূর্ণ স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছেন তাঁর রক্তাধার ৯ম প্রজন্ম নবাবজাদা সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেব। তাঁর পাশে থেকে সহযোগিতা, দোয়া, ভালোবাসা, আশীর্বাদের হাত বাড়িয়েছি আমি, আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু নবাব সিরাজউদ্দৌলা গবেষক, শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ ফজলুল হক (প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)। আমাদের এ শুভ যাত্রায় আপনাদের সকলকে সু-স্বাগতম।"

(দৈনিক সমকাল, শৈলি- ১৯.১১.২০১৪ইং)

www.pathagar.com

উদ্দৌলার শুভ জন্মদিনে গুলশান ক্লাবের
ছিলেন নবাব পরিবারের নবম প্রজন্ম

াকা প্রেসক্লাবে নবাব সিরাজউদ্দৌলার শুভ
ন নবাব পরিবারের অষ্টম এবং নবম প্রজন্ম
আব্বাস, সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল
জের গুণীজন

www.pathagar.com

আলিবর্দী খাঁর পিতৃভূমি ইরাক

মরুর দেশে

আরবভুক্ত দেশ ইরাকের কথা যে কারো কল্পনায় ভেসে উঠলে মনে হবে.... ু-ধু বালিয়াড়ির কথা। যেখানে সূর্য প্রখর রৌদ্র ছড়ায়। বিশাল প্রান্তর জুড়ে শুধুই ালোর ঝিকিমিকি খেলা। বাস্তবে ইরাকে গিয়ে এ সত্যতা অনুভব করতে ারলাম। মুরুভূমিকে আমরা যত দুর্গমই ভাবিনা কেন, সেখানেও প্রাণের স্তিত্বের দেখা মেলে। জীবনের স্পন্দন সেখানেও প্রাণবন্ত। সেখানে ফুল ফোটে, পাখি গায়। মানুষ দলবেঁধে চাষাবাদ করে এবং যে যার কাজে ব্যস্ত সময় াটায়। তবে যারা মুরভূমির দেশকে জানে তারা এর বিপদকে সমীহ করেই ুজে নেয় এর অপার সৌন্দর্য ও বিস্ময়। পাহাড় পর্বত ও মরুভূমির দেশ ইরাক মণে দেখতে পাই.... সামান্য বৃষ্টির ছোঁয়া পেলেই রাতারাতি প্রাণের নাচন শুরু য়ে যায়। আর যাকে মনে হয়েছিল শুকনো ডাল তাতে দেখা যায় পাতার কুঁড়ি। গও আর কাঁটায় ফুলের কলি দেয় উঁকি। ন্যাড়া বালির ময়দান দু'দিনেই ছেয়ে ায় সবুজ ঘাস-পাতায়। রকমারি রঙিন ফুলে চোখজুড়ানো রূপ। কয়েক াপ্তাহের জন্য মরুভূমিতে যেন স্বর্গের শোভা বসে।

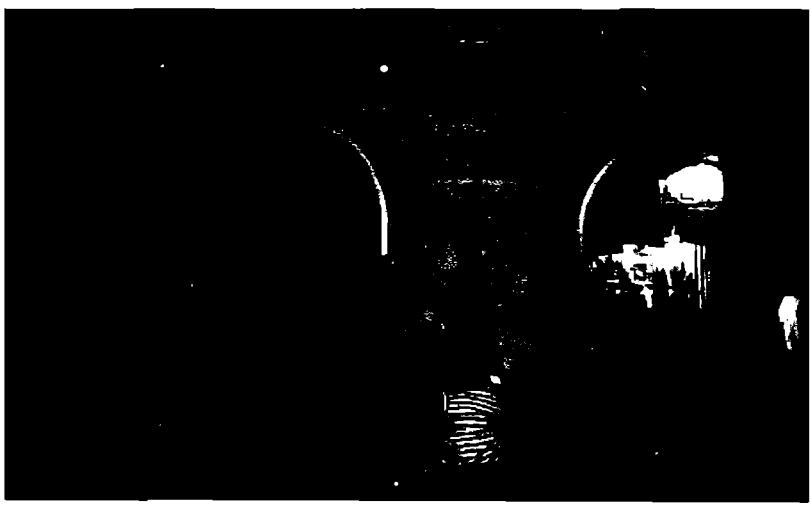

কারবালার ট্রাফিক সিগনালের সামনে ইমু ও মুনমুন

বসন্তে মরুর দেশ ইরাকজুড়ে অজস্র তৃণ ফুলে বর্ণিল হয়ে ওঠে। তখন াহাড় পর্বত ঘেরা মরুভূমির এই দেশটিকে আর প্রাণহীন, রুক্ষ অঞ্চল মনে হয় া। মরুর দেশের এসব ফুলের মধ্যে ডেইজি অন্যতম। এদের অনেক রঙ- াদা, লাল, পার্পল, হলুদ ইত্যাদি। দূর থেকে একঝাঁক তারকা মনে হয়।

www.pathagar.com

এখানকার হলুদ রঙের ডেনডেলিয়ন ফুলও দেখকে চমৎকার। সারাবছর এদের বীজ মাটিতে লুকায়িত থাকে। বসন্ত শুরু হওয়ার আগে যখন বৃষ্টি হয় তখন গাছ জন্মে। গাছ জন্মানোর ১ মাসের মধ্যেই ফুল হয়। মাইলের পর মাইল ধরে ডেনডেলিয়নের হলুদ কার্পেট মরুভূমিকে ভিন্নমাত্রা দান করে। মরুভূমির কষ্টসহিষ্ণু উদ্ভিদ প্রজাতি আলোও। এরা লিলি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘ মঞ্জরিদণ্ডে হলুদ রঙের অসংখ্য ফুল ফোটে। গাছটিকে দূর থেকে ঝোপের মতো মনে হয়। মরুভূমির প্রধান গাছ হচ্ছে ক্যাকটাস। ক্যাকটাস কাঁটাযুক্ত ঝোপালো গাছ। এদের আছে গরম সহ্য করার মতো দারুণ গুণ। ক্যাকটাস গাছ দেখতে অতটা বাহারি না হলেও এদের ফুল বেশ আকর্ষণীয়, মরু অঞ্চলের সবচেয়ে আজব গাছ হচ্ছে বাওবাব। দীর্ঘ খরা উপেক্ষা করে এরা বছরের পর বছর টিকে থাকতে পারে। গাছটি তার বিশাল কাণ্ডে শতশত গ্যালন জল ধরে রাখে। এতে নিজের জীবন তো বটেই, তৃষ্ণার্ত মানুষ বা পশুদের জীবনও বাঁচায় গাছটি। দশটন ওজনের শাগুয়ারো নামক গাছ প্রায় ১৫০ বছরের অধিক সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। কোনো কোনো গাছ যেমনঃ মেসকুইট, পানির সন্ধানে তার শিকড় ৮০/৯০ ফুট পর্যন্ত গভীরে বিস্তার করে। পাহাড় পর্বত ঘেরা মরুভূমির দেশ ইরাক। দেশটি ভ্রমণে বাংলাদেশ থেকে ভিসা পেতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, বহু জটিলতার পর .... ইরাকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান নুরী আল মালেকীর বিশেষ অনুমোদন নিয়ে, আমরা বাংলাদেশের ১০ জনের অধিক একটি দল ইরাকের নাজাফ বিমানবন্দরে প্রবেশ করি। দেশটির প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অনুমোদনপ্রাপ্ত ভিসা দেখার পরও নাজাফ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আমাদের দীর্ঘ ১৩ ঘণ্টা আটকিয়ে রাখল এবং ভিসাতে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের সত্যতা যাচাইয়ের পর অফিসার আলি আমাদের পাসপোর্ট রেখে, সেগুলোর ফটোকপি দিয়ে বল্লেন... "এগুলো ইরাক ভ্রমণে আপনাদের কাজে আসবে। আর ইরাক ভ্রমণ শেষে দেশটিকে বিদায় জানাবার সময় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে পাসপোর্টের ফটোকপি জমা দিয়ে অরজিনাল পাসপোর্ট নিয়ে দেশ ত্যাগ করতে পারবেন।" আলাপচারিতায় বিমানবন্দরে কর্মরত বাংলাদেশি ক্লিনারদের কাছে জানতে পেলাম, নিরাপত্তাজনিত কারণে দেশটিতে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ আরও কিছু দেশের নাগরিকদের প্রবেশে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আছে। তাঁদের মতে উক্ত দেশসমূহের নাগরিকরা ইরাকে প্রবেশ করে জঙ্গী তৎপরতা চালায়, শত শত নিরীহ লোক হত্যা করে। যার দরুন ইরাক সরকার ইমামগণ (আ.) এবং আহলে বাইত (আ.) এর সদস্যদের মাজারসমূহ যেয়ারত করতে আসা যায়েরদের (যেয়ারতকারী) নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা, শৃঙ্খলারক্ষী ও সামরিক বাহিনীকে বিশেষ নির্দেশ প্রদান করায়, সমগ্র ইরাকজুড়ে পথে পথে অলিতে গলিতে মাত্রাতিরিক্ত চেকিং এর ব্যবস্থা আছে। এত কিছুর পরও স্বার্থান্বেষি দেশি বিদেশি অপশক্তিরা সমগ্র ইরাককে অশান্ত করে রাখতে উদ্যত। আজকের ইরাক পশ্চিমা বিশ্বের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকলেও, পরোক্ষভাবে পশ্চিমা বিশ্ব দেশটির প্রতিবেশী কিছু রাষ্ট্রকে সঙ্গে নিয়ে

www.pathagar.com

ইরাক প্রশাসন নিয়ন্ত্রণে ছায়ার মতো কাজ করে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের স্বর্গ ইরাক আজ অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইরাক ভ্রমণে দেখতে পাই চারপাশে ধ্বংসস্তূপ আর ধ্বংসস্তূপ। এই ধ্বংসস্তূপের মাঝে কখনো দাঁড়িয়ে ছিল বহুতল বাসভবন, কল-কারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিপনীবিতান, শিল্পপ্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্থাপনাসমূহ। ইরাক, খনিজ তেল সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ অথচ দেশটিতে অবস্থানকালে দেখতে পাই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮ ঘণ্টার লোড শেডিং চিত্র। তাই দেশটির জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের কথা চিন্তা করে ইরান সরকার বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছে। দেশটির কারবালা প্রদেশে অবস্থানকালে জানতে পাই ইরান সরকার কারবালাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে পাওয়ার প্লাট নির্মাণ কাজে হাত দিয়েছে। এর ফলে খুব দ্রুতই তাদের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হবে। দেশটির 'সামারাহ' প্রদেশ যাবার পথে চোখে পড়ল আর্মি এবং পুলিশের বিশাল গাড়ির বহর, নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা অস্ত্র তাক করে রেখেছে। যুদ্ধে ব্যবহৃত ট্যাংকও সামারাহর উদ্দেশে যাচ্ছে। আমাদের গাইড জানিয়েছিল ইরাকের সামারাহ প্রদেশ অনেকেই গোলোযোগপূর্ণ। তারপরও বের হয়েছিলাম হয়তোবা সব ঠিকঠাক হবে এই ভেবে। রাস্তায় যুদ্ধ যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে মাঝ পথেই আমরা সামারাহ যাবার পরিকল্পনা বাতিল করলাম। ক্ষতবিক্ষত ইরাকের নাজাফ, কুফা, কাজমায়েন, মুসাইয়াব, কারবালাসহ আরও কয়েকটি প্রদেশ ঘুরে দেখার সুযোগ পাই। দেশটির ক্ষতবিক্ষত করুণ অবস্থা দেখতে দেখতে নিজের অজান্তেই চোখের দু'কোণ দিয়ে দু'তিন ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। ইরাক ভ্রমণে দেখতে ও জানতে পেলাম সে দেশের মানুষ অনেকেই সৎ। তাইতো তাদের সৎ ও সুন্দর জীবনযাপন চোখের সামনে ফুটে উঠল বহুবার। ইরাকিরা শৌর্যবীর্যে পশ্চিমাদের চেয়ে কোনো অংশে কম না। যেহেতু তারা শান্তিপ্রিয়। তাই অকারণে বা ছোট ছোট কথায় নিজ শক্তি প্রদর্শন করেন না। ইরাকিরা বন্ধুপ্রিয়, তাইতো দেশটির তরুণসমাজ ও অন্যান্যরা সহজেই বিদেশিদের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। আর ইরাকিদের আচার-ব্যবহারে তাদের সহজ-সরল আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ইরাকি তরুণদের সাথে পরিচিত হয়ে দেখতে পেলাম তারা যথেষ্ট ফ্যাশন সচেতন ও বন্ধুপ্রিয় জাতি। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে দেশটির তরুণসমাজ, নিজের জন্য নির্ধারণ করছে মার্জিত পোশাক, সানগ্লাস, সুজ, হেয়ার স্টাইল, গলার চেইন। তাদের সামগ্রীক স্টাইল দেখে মনে হলো ডিজুইস কালচারকে তারা বড্ড বেশি আপন করে নিয়েছে। সমগ্র ইরাক জুড়ে অজস্র ফ্যাশন সেলুন গড়ে উঠেছে, সে দেশটির তরুণসমাজের জন্য। তারা সেখানে ড্রু প্লাকসহ তারুণ্যের পছন্দের সব স্টাইল বেছে নিয়ে নিজেকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলে। যদিওবা ইরাকি কিশোর-তরুণরা মেকাপ গেটাপ ছাড়াই শারীরিক গঠনে অনেক বেশি আকর্ষণীয় সুন্দর চেহারা ও সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী। তবুও তারা হালফ্যাশনে নিজেকে সাজিয়ে নিতে পছন্দ করে। ফ্যাশন সচেতন দেশটির তরুণসমাজ ধর্মকর্মের বিষয়ে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। তাইতো তারা সময়মতো নামাজ কালামসহ

www.pathagar.com

ইবাদত বন্দেগিতে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। ইরাক ভ্রমণে প্রতি পদে পদে... মোঃ সুমন আলী ও তার বন্ধুরা, খোরশেদ আলম, জাকিরুল ইসলাম, কামাল, আব্দুর রহিম, আরোজ আলী, সালেকুল ইসলাম, মাসুদ, সাঈদ ভাইসহ আরও অন্যান্য বাংলাভাষি বাংলাদেশিরা সব রকম সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিলেন। আমরা তাদের প্রকৃত বন্ধুসুলভ আচরণে মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ। ইরাকের উন্মুক্ত বাজারে বাংলাদেশি দক্ষ জনশক্তি ও পণ্যের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। দেশটির হোটেল বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন অনেক বাংলাদেশি। তবে তারা কেউই বৈধভাবে আসেননি। ইরাকে বাংলাদেশের (তথ্যটি আমাদের ভ্রমণকালীন সময়কার) কোনো দূতাবাস নেই। দেশের দক্ষ জনশক্তি ইরাকে পাঠাবার নেই কোনো সরকারি সৎ উদ্যোগ। বিস্ময় বাংলাদেশ!! ইরাক ভ্রমণে দেখতে পাই জানতে পাই সে দেশটিতে কর্মরত বাংলাদেশিদের করুণ অবস্থার কথা। নিজেকে লুকিয়ে বাঁচিয়ে, কখনোবা জেল হাজত খেটে, প্রিয় বাংলাদেশ ও নিজ পরিবারের মুখে হাসি ফুটাতে কষ্ট করে হলেও দীর্ঘ সময় থেকে টিকে আছেন কঠিন কোমোলে গড়া ইরাকে। ইরাকের বিপনি বিতান ও বাজার ঘুরে দেখতে পাই... সে দেশটির উৎপাদিত পণ্যের চেয়ে ইরান, ইন্ডিয়া, ইউক্রেন, চায়না, তুরস্ক, সৌদি আরব, সিরিয়া, লেবানন, পাকিস্তানসহ আরও অন্যান্য দেশের পণ্যসামগ্রীর সয়লাব। অথচ সম্ভাবনাময় এই দেশটিতে বাংলাদেশি পণ্যের কোনো নামগন্ধ নেই। বাহারে বাংলাদেশ! বাহারে বাংলাদেশি সরকার!! ইরাকি তরুণদের অনেকেই বাংলাদেশ সম্পর্কে অবগত। তাদের মতে ... "তোমরা বাংলাদেশি জনগণ অনেক অতিথিপরায়ণ ও বন্ধুপ্রিয়, তোমাদের কাছে পেয়ে আমরা গর্বিত। আমাদের দেশ ঘুরো আর আমাদের দেশের কথা তোমাদের দেশে তুলে ধরো, ধন্যবাদ তোমাকে ইরাক ভ্রমণে আসার জন্য।"

ইরাকের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ। দেশটির রাজধানীও বটে। বাগদাদে অল্প সময় অবস্থানকালে দেখেছি ... পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে তকতকে হাস্যোজ্জ্বল শহর। একটি আধুনিক শহরের নাগরিক সব সুযোগ-সুবিধা পর্যন্ত এখানে। কাজমায়েন এটি বাগদাদের অন্তর্ভুক্ত উপ-শহর। এ উপ-শহরে রয়েছে পবিত্র দু'টি রওজা। অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মানুষ কাজমায়েনে অবস্থিত ইমাম মুসা এবং ইমাম ত্বাকীর রওজায় ধর্মীয় ভালোবাসায় চলে আসেন। কাজমায়েন একটি অত্যাধুনিক চাকচিক্যময় উপশহর, সেখানে অবস্থানকালে তাদের বাজারও বিপনি বিতানগুলো দেখলেই বুঝা যায়, উপ-শহরটি অনেকাংশে পাশ্চাত্যের আদলে গড়া।

ইরাকের মুসাইয়াব প্রদেশে আছে... অন মুসলিম বিন আকিলের পুত্র মুহাম্মদ আর ইব্রাহিম এর ছোট্ট সন্তানদের মাজার।

ইরাকে কারবালা প্রদেশের নিকটে কুরবে কারবালায় বেশকিছু মাজার আছে তাদের মধ্যে অন্যতম- অন ইবনে আবদুল্লাহ, যিনি বিবি জায়নাবের পুত্র এবং

www.pathagar.com

হুর এর পবিত্র রওজা। হুর যিনি প্রথমে দুষ্ট ইয়াজিদ বাহিনীতে থাকলেও পরবর্তী সময়ে নিজ ভুল বুঝতে পেরে ইমাম হোসেনের সহচর হন। কারবালা প্রদেশের প্রবেশদ্বার ঘেঁষেই কুরবে কারবালার অবস্থান।

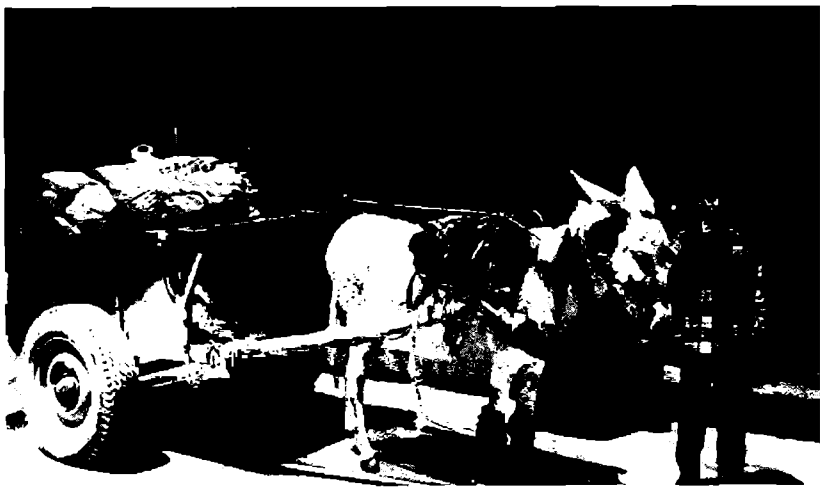

ইরাকের কারবালায় একটি শিশুর সাথে একটি গাধার চিত্র

বন্ধুরা চলুন ...

ইরাকে ব্যবহৃত নিত্যদিনের শব্দমালার সাথে পরিচিত হয়ে নিই... শাহি (ঈগল, দেশটির জাতীয় পাখি), লা (না), হ্যাঁ (মানে, yes), ফুজ/বেশ (মূল্য), দিনার (টাকা), বে রোক সাদ কুম (অনুগ্রহপূর্বক/এসকিউজমি), আল আফ (দুঃখিত/ Sorry), নিসা/ ইমরা (মহিলা অর্থে ব্যবহৃত হয়), রাজুল (একজন পুরুষ), রিজাল (বহু পুরুষ), আরবানা (ঠেলাগাড়ি), আবু আরবানা (ঠেলাওআলা), জেবিদ (বাটার ওয়েল), হাজ্জি (জনাব/ Mr.), অগা (মানে, তুমি এদিক আসো)। ইরাকে ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষার প্রচলন নায়ের মতো, তাই ইরাকিদের সাথে কথা বলতে নিত্য প্রয়োজনীয় আরবি শব্দের ব্যবহার জানলে ইরাক ভ্রমণ সহজ হয়ে যাবে। ইরাকের পবিত্র রওজাসমূহ জিয়ারতের জন্য ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এবং ইরান থেকে বহুসংখ্যক যায়ের আসেন। তাই দেখা যায় কিছুসংখ্যক দোকানি হিন্দি, ফার্সি এবং ইংরেজি ভাষায় প্রয়োজনীয় অল্প অল্প জ্ঞান রাখেন। তবে এরকম দোকানির সংখ্যা খুবই কম। সৌভাগ্যক্রমে ইরাকের কারবালা প্রদেশে ২/৩টি দোকানি হিন্দি ভাষা বুঝতে পারাতে, আমাদের কেনাকাটায় যথেষ্ট সুবিধা হয়।

www.pathagar.com

শান্ত স্নিগ্ধ এক শহর

"সালাম হো সালাম, এ্যায় সাইয়্যেদাকে লাল, সালাম হো সালাম, ইয়া হোসাইন আপকে আপনোকে নাম"

বন্ধুরা .... আপনাদের সকলকে 'আস সালামালেকুম'। চলুন আমরা গল্প কথায় আরব দেশের কথা জেনেনিই। সুবহান আল্লাহ! এতো এক পবিত্র মানে শান্তির শহর। ইরাকের কারবালা, এত সুন্দর একটি প্রদেশ, যার বারবার প্রশংসা করতে মন চায়। সবকিছুই সাজানো গোছানো, পরিপাটি। প্রকৃতির নিয়মে, কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা চোখে পড়ল না। মাঝে মাঝে সেখানকার ফুল কথা হয়ে ওঠে, সে অতীতের বেদনাদায়ক অনেক কথা বলতে চায়। ছড়ানো পাপড়িতে তার মাঝে মাঝে হাসি লেগে থাকে, কখনো বা দুঃখ। সৌরভ ছড়িয়ে দিয়ে সে সবাইকে আহ্বান করে... এসো সুন্দরের পথে, এসো কল্যাণের পথে। কারবালার... ফুলগুলো যেন কথা, পাতাগুলো যেন চারিদিকে তার পুঞ্জিত নীরবতা। গাছপালা হচ্ছে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রাণ। যেখানে কোনো গাছ নেই সেখানে কোনো প্রাণ নেই। তাইতো কারবালায় প্রচুর গাছপালা আছে, আছে মনের শান্তির সব কিছু। কারবালার চারপাশে ছড়িয়ে আছে অপার সৌন্দর্য। তা দেখে এক নিমিষেই মন ভরে যায়। ইরাকের পাহাড় পর্বত মরুভূমি ঘেরা এই প্রদেশে মানুষ যখন ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে পথে বের হয় তখন গাছের ছায়া খোঁজে। আবার বসতে গেলে গাছের ছায়ায় বসে। ভালোবেসে সুন্দর ফুল ফলের গাছগুলো ঘরের পাশে লাগিয়ে রাখে। প্রদেশটির জনগণ পরিবেশ সংরক্ষণে বেশ সচেতন। যেখানে সেখানে কোনো পলিথিন বা বর্জ্য পাওয়া যাবে না। সেখানকার পরিবেশ কর্মীরা এসব বর্জ্য কুড়িয়ে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো করে রাখে। শহরটির রিম-ঝিম ঝিরি-ঝিরি বৃষ্টিতে পাখিরা আনন্দে মেতে উঠে, হাঁসগুলো গলা ছেড়ে ডাকতে থাকে। ফুল-ফসল-গাছপালা, মরুভূমি প্রকৃতির আশীর্বাদে নবরূপে সাজ সাজ রব। চারপাশটা হয়ে ওঠে সতেজ সুন্দর। গাছের পাতাগুলো বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে চকচকে হয়ে ওঠে। সেই চকচকে সবুজ রংটা যেন আলো ছড়াতে শুরু করে। আর এভাবেই কারবালার চারপাশ জুড়ে কত সব বিচিত্র রঙের বাহারি ফুল ফোটে আর স্বাগতম জানায় অতিথিদের। বন্ধুরা... সমগ্র কারবালার প্রতিটি দৃশ্য হৃদয় ছোঁয়া। ইরাকের এ প্রদেশটি নানারকম সৌন্দর্যে ভরপুর... প্রদেশটিতে প্রবেশ সময় আলাপচারিতার পরিচিত হই আব্বাস নামের এক তরুণের সাথে। সে আমার দু'গালে চুম্বন করে তাদের প্রদেশটি ঘুরে দেখার জন্য স্বাগতম জানায় এবং সে আমার দিকে বন্ধুত্বের হাত উন্মুক্ত করে। ইরাকি তরুণটি যখন জানতে পারে তার এবং আমার নামে মিল আছে তখন সে আরও বেশি উচ্ছ্বাসিত হয় এবং Face book এর মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষার আহ্বান জানায়। একইভাবে কারবালার বিভিন্ন স্থানে কাশেম, হোসাইন, হাসানসহ আরও অন্যান্য ইরাকি তরুণদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে আমি

www.pathagar.com

মুগ্ধ। তারা অনেকেই সৎ, স্বচ্ছ, সুন্দর ও বন্ধুপ্রিয়, তাদের মিষ্টি মধুর আচরণেই সেটি প্রকাশ পায়। ভোরের আলোতে ইরাকের কারবালা প্রদেশ ব্যস্ত নগরীতে পরিণত হয়। কিশোর তরুণ এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা ফজরের আযানের পূর্বে যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে ইমাম হোসাইন, হযরত আব্বাসের পবিত্র রওজাসহ অন্যান্য পবিত্র স্থানে দু'রাকাত ফজরের নামাজ পড়ে, যে যার কর্মব্যস্ত জীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একইভাবে জোহর আসর এবং মাগরিব এশার নামাজও তারা যথাযথ সময়ে আদায় করে থাকেন। শাব-এ জুম্মা এবং জুম্মা নামাজে কারবালায় প্রচুর লোকের আগমণ ঘটে। জুম্মার নামাজের পূর্বেই সকল দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। আর নামাজ শেষে সরকারি এবং বে-সরকারিভাবে যায়েরদের জন্য রওজার ভিতর ও বাইরে বিনামূল্যে সুস্বাদু খাবারের সু-ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। খাদ্যসামগ্রীগুলো খুবই মানসম্মত, যা বিনামূল্যে বিতরণ করতে দেখা যায়। কারবালার পবিত্র রওজাসমূহ যিয়ারত করতে আসা দরিদ্র যায়েরদের বিনামূল্যে কম্বলসহ গুরুত্বপূর্ণ বস্ত্রসামগ্রী খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করে ইরান, ইন্ডিয়াসহ আরও কিছু দেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এক্ষেত্রে ইরাক সরকারের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা তারা পেয়ে থাকেন। সমগ্র কারবালা জুড়ে পথে পথে দেখা যায় সুস্বাদু মিনারেল ওয়াটারের ব্যবস্থা, সাথে আবার রয়েছে ওয়ান টাইম ব্যবহারের গ্লাস। এটিও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাওয়া যায়। আমরা বাংলাদেশি ভ্রমণ সঙ্গীরা খালি বোতলে ঠাণ্ডা পানি ভরতে গেলে ইরাক কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকজন নিজ থেকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন এবং খালি বোতলগুলো ঠাণ্ডা পানিতে ভরে দেন। একইভাবে কারবালার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যায়েরদের যাতায়াতের জন্য... বিনামূল্যে মিনিবাস, অটোরিক্সাসহ অন্যান্য যানবাহনের সু-ব্যবস্থা আছে, শহরটির বিভিন্ন পথ পারাপারের সময় লক্ষ করা যায় যানবাহনের চালক গাড়ি থামিয়ে পথ পারাপারকারীদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন। কারবালার সুপ্রভাত সকালে দূর দূরান্ত থেকে আগত বোরখা পরা দরিদ্র রমণীরা বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী বিক্রয় করে থাকেন। সকালের নাস্তায় তন্দুর রুটি মাখন আর সেদ্ধ ডিম বিক্রি করতে দেখা যায়। আর কিছু দরিদ্র রমণী ও পুরুষ সকালবেলা গাধার গাড়ি চালিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী নির্ধারিত গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত থাকেন।

কখনো এই জাতি ছিল ধনসম্পদশীল, ইউরোপীয় এবং কিছু দুষ্ট প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কূটকৌশল চালে, আজ তারা হত দরিদ্র। অপকৌশলকারীরা এই জাতির মেরুদণ্ড ভাঙার বারবার অপকৌশল করেও সম্পূর্ণ সফল হয়নি। কারণ ৯০% ইরাকি সৎ, পরিশ্রমি, ধার্মিক। বর্তমানে ইরাকের অধিকাংশ স্থান আজও অশান্ত। অপশক্তিরা নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে দেশটিতে জাতিগত, ধর্মগত দাঙ্গা ফাসাদ বাঁধিয়ে পর্দার আড়াল থেকে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করছে। আর এই রক্তের হুলি খেলায় শহীদ হচ্ছেন সে দেশের সাধারণ জনতা। বন্ধুরা... মানুষ এতটা নিষ্ঠুর নির্মম, স্বার্থপর হতে পারে চিন্তা করলে অবাক লাগে!!!

www.pathagar.com

বাংলাদেশি শিশু আলীশান এর প্রতি ইরাকি তরুণের ভালবাসা

ইরাকে গাধা এবং উটের বিচরণ দেখা যায়। তবে সেটি সংখ্যায় খুবই কম। গাধা এবং উট বড়ই নিরীহ প্রাণী। উটের দুধ পুষ্টিকর। দুধে রয়েছে প্রোটিন, চিনি, চর্বি, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন। উটের দুধ মরুবাসীর জন্য উত্তম ভিটামিন C- এর উৎস, যা তারা ফলমূল থেকে পায় না। উটের দুধ মরুবাসীর জন্য একমাত্র দুধ কারণ সেখানে অন্যান্য দুগ্ধপোষ্য পশু পালন সম্ভব নয়। উট ৭ বছরে পূর্ণবয়স্ক হয়। তবে পুরুষ উট ৬ বছর বয়সে পূর্ণবয়স্ক। অর্থাৎ সাবালক হয়। উটের প্রজনন সময় এলে পুরুষ ও মাদী উট মিলিত হয়। উট দীর্ঘদিন পানি পান না করে বাঁচতে পারে এবং ২০০ কেজি পর্যন্ত নিজ ওজন কমাতে পারে। মরুভূমির জাহাজখ্যাত উট বিষাক্ত গাছ চিনতে পারে এবং তা খাওয়া থেকে বিরত থাকে। মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির জন্য উটের দুধ এক মহা নেয়ামত হিসেবে দিয়েছেন। জানা যায় ... এ দুধে যেমন রয়েছে পুষ্টিগুণ, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগ ব্যাধির শেফা। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে ... হযরত রাসূল (স) অসুস্থ রোগীদের উটের দুধ পান করতে বলতেন। আর এই দুধ পান করে তারা আরোগ্য লাভ করতেন। আগেকার দিনে মরুভূমির জাহাজখ্যাত উট ছিল প্রধান বাহন। উটের পিঠে করে মানুষ একস্থান থেকে দূরবর্তী আরেকস্থানে যেত। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ইরাকের অধিকাংশ ক্ষেত্রে গাধা এবং উটের পরিবর্তে যন্ত্রচালিত বাহনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তাই বলে পাহাড় পর্বত মরুভূমি ঘেরা আরব দেশ ইরাকে গাধা এবং উটের কদর বিন্দুমাত্র কমেনি। বন্ধুরা বলুন... জবা ফুল ছাড়া কি বাগান হয়? তাইতো ইরাকের কারবালায় সকালবেলা হোটেলের বাইরে এলে চোখে পড়ে যে ফুলটি তার নাম জবা। জবা ছাড়া বাগানগুলোতে লক্ষ করা যায় গোলাপ,

www.pathagar.com

সূর্যমুখী, গাঁদা, নয়নতারা, শিরিষ ফুল, সোনালু ফুলসহ আরও নানা প্রজাতির ফুলের মেলা। ইরাকে বসন্তকালে গাছজুড়ে ফুলের উৎসব থাকে অনেকদিন। আর বসন্তকালীন বাহারি সব ফুল দেখেই চোখ জুড়ায় সকলের। কারবালার গাছে গাছে ছেয়ে ছিল সোনালু ফুল। লম্বা লম্বা ঝুলন্ত মঞ্জুরিতে বিশুদ্ধ হলুদ রঙের থোকা-থোকা ফুল, যেন জড়োয়া অলংকারের সাজে সোনালু। এ ফুলের আরও অনেক নাম- সোঁদাল, সোনাইল। বন্ধুরা... কারবালার আকাশ বাতাস, অলংকারিক পবিত্র রওজা, নৈসর্গিক দৃশ্য সবকিছু এক কথায় হৃদয় ছোঁয়া। ইরাকের এই পবিত্র প্রদেশটি নানা রকম সৌন্দর্যে ভরপুর। যেন এক স্বপ্নপুরী। ইমাম হোসাইনের রওজা, তিল্লে জায়নাবিয়া, হযরত আব্বাসের রওজা, মাকামে ইমাম জামানা, নেহরে ফোরাত নদীর কিছু অংশ, আর এর চারপাশেই রয়েছে নিবিড় সবুজের আচ্ছাদন, দৃষ্টি নন্দন ভাস্কর্য, পার্ক, শপিংমল, রেস্তোরাঁ, মন মাতানো সৌরভের বাহারি সব ফুলের বাগান-সবকিছু মিলিয়ে সত্যিই দেখার মতো। ইসলামি ইতিহাসের গৌরবময় পবিত্র সব স্থাপনা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যই কারবালার মানুষের সকল মানসিক শক্তির উৎস, এমনটি মনে হলো। সমগ্র কারবালা জুড়ে শুধু পাখির মেলা। দল বেঁধে শোঁ-শোঁ শব্দে উড়ে আসছে আবার চলে যাচ্ছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাহারি সব পায়রার অবাধ বিচরণ দেখা যায় পবিত্র রওজার ভেতর ও বাইরে। সুপ্রভাত সকালে ফজরের আযানের সাথে সাথেই ঝাঁকবেঁধে পায়রার দল নেমে পড়ে পথে প্রান্তরে, তাদের খাবার ছড়িয়ে দেয় শিশু-কিশোররা। তাইতো পায়রা এবং মানুষের মিষ্টি মধুর ভালোবাসার বন্ধন লক্ষ করা যায় ইরাকের কারবালায়।

নৈসর্গিক সৌন্দর্যের প্রদেশ ইরাকের কারবালা

www.pathagar.com

ইরাকি খাবারের পসরায় এক ইরাকি তরুণ

পাঠকবন্ধুরা এবার চলুন কিছু ইরাকি ভাষার সাথে পরিচিত হয়ে নিই, আর হ্যাঁ ইরাকিরা আরবি ভাষায় কথা বলেন... পায়রা বা কবুতর (হামামা), গাধা (হামার), উট (জামাল/নাকা), ঘুঘু (হামাম), ফুল (ওয়ারাদ), ভেড়া (ভেড়/স্বাদ), দুম্বা (খারু), ছাগল (ছাগলা), গরু (হাইসা), লটকনের মতো ইরাকি ফল সে দেশে 'গাওজে' নামে পরিচিত, খেজুর (কামার), শসা (খায়ার), ইরাকিরা ছোট ছোট এক প্রকার লাল ফলকে 'শাতুত' বলে, ড্রাই ফ্রুটস সে দেশে 'মেওয়াজাদ' নামে পরিচিত, খেজুর গাছ (তামার), পাখি (তের), ছোট ১ প্রকার সাদা পাখিকে 'কেনারে' বলে, আপেলের মতো দেখতে এক প্রকার ইরাকি ফল সে দেশে 'আড়ু) নামে সকলের কাছে পরিচিত, হালওয়া (দাহিন), সালাদ কে সালাদ আবার 'মোকাববেলা' ও বলে, পানি (মাই), নরমাল পানি (মাই আদি), চাল (তিমমান), মুরগির-মাংস (দাজাজ), মাখন (দেহেন), দুধ (হালিফ), দুধের স্বর (চেজবিন), ইরাকিরা দুধ দিয়ে তৈরিকৃত খাদ্যকে 'গোমার' বলে, মধু (আসেল), ফলের জুস (আসের), গাজর চিনি এবং আরও কিছু জিনিসের সংমিশ্রণে তৈরিকৃত খাদ্যকে ইরাকে 'মোরব্বা' বলে, ইরাকের মাছের বাজারে লক্ষ করা যায় জাপানি প্রজাতির 'কারফু' মাছ আর 'সমেজ' নামের একটি মাছ। বাকি মাছের নামের সাথে পরিচিত হতে পারিনি। ইরাকিরা জাপানি কারফু না কেটে ভাজি করে খেতে অভ্যস্ত, দেশটির সব্জি বাজারে যেসব সব্জি দেখা যায়... আলু (বোতেতা/ বাতেতা), বেগুন (বেগুনজান/সিজার), ধনিয়াপাতা (খাদরা) টমেটো (টমেটা), খিরা (খিয়ার)সহ রকমারি সব্জির পসরা। আর হ্যাঁ সব্জিকে তারা 'মারেক' বলে। বন্ধুরা... ইরাকি সাধারণ জনগণ সকাল, দুপুর এবং রাতে বেলায় কি খেয়ে থাকেন, জানতে ইচ্ছে করছে নিশ্চয়ই? চলুন তাহলে জেনে

www.pathagar.com

নিই। বন্ধুরা আপনাকে 'হিমালা (স্বাগতম)। ইরাকি বন্ধুরা খামমা আর মোরব্বাকে Mix করে রুটি (খামস/খুবজ/খবুজ) দিয়ে সকালের নাস্তা করেন। দুপুর এবং রাতের বেলায় তাদের আহারের তালিকায় থাকে... মাংস (লাহাম), মুরগির মাংস, সোরওয়া (ফুসুলিয়া), বেগুন তরকারি, টাটকা শাকসব্জির সংমিশ্রণে তৈরি 'সালাদ' (মোকাববেলা), সালাদে তারা লেবুর টক ব্যবহার করে থাকে, শসা এবং ধনে পাতার সংমিশ্রণে তৈরিকৃত সালাদে দধির ব্যবহার করে, সাথে ম্যাকারনি জাতিয় নুডুলস খাদ্য তালিকায় থাকে। ইরাকিরা সাধারণত ভেড়ার মাংস খেয়ে থাকেন। আর আমাদের দেশে তৈরিকৃত রুটির মতো তাদের রুটি মোলায়েম নয়। তাঁরা বিশাল আকৃতির নান রুটি খেতে অভ্যস্ত। চাউলের ব্যবহার সেখানে নায়ের মতো এবং আলোচিত উপরিউক্ত খাদ্য তালিকার বাইরেও ইরাকিরা অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী তাদের খাদ্য তালিকায় সংযুক্ত করে থাকেন।

ইরাকিরা তাদের নিয়মিত খাদ্য তালিকায় তৈল, কাঁচা মরিচ, মরিচ গুঁড়া এবং মশলার ব্যবহার নায়ের মতো করে থাকেন। যার ফলে তাদের প্রস্তুতকৃত খাদ্যসামগ্রী আমাদের জন্য মুখরোচক নয় তবে তা যথেষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত। দেশটিতে অসংখ্য আইসক্রিম সপ আছে, তাই মজাদার সব আইসক্রিমের স্বাদ নেয়া যায়। আইসক্রিমের পাশাপাশি সপগুলোতে টাটকা ফলমুলের জুস ক্রয়-বিক্রয় হয়। ইরাকিরা সময়ে অসময়ে চকলেট, আইসক্রিম এবং টাটকা ফলের জুস খেতে পছন্দ করেন। কারবালার বাজার ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চোখে পড়ে নামাজের চাটাই-এর মতো বিশাল আকৃতির গোলগোল জিলাপি। এত বড় আকৃতির জিলাপি জীবনে প্রথম দেখা। মাঝারি ত্রিকোণ আকৃতির নান রুটি, রুটিটির মাঝের খালি অংশে, ভিন্ন ভিন্ন কাচের বল থেকে উঠিয়ে নিলাম ছোট গোল আকৃতির বড়া, টাটকা সব্জি মিশ্রিত সালাদ, তেঁতুলের টক এবং সোরওয়া, আর এগুলোর সংমিশ্রণে হয়ে গেল ইরাকি স্যান্ডউইচ। যা ইরাকে অবস্থানকালে আমরা প্রায়ই খেতাম। খাবারটি সত্যিই সুস্বাদু। পাশাপাশি চকলেট, দধি, আইসক্রিম, ফলের জুস আমাদের খাদ্য তালিকায় নিত্য দিনের সঙ্গি ছিলো। ইরাকিরা ছোট শিশু-কিশোরদের অনেক বেশি পছন্দ করে থাকেন, তাইতো আমাদের ভ্রমণ সঙ্গী বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদের চুম্বন দিয়ে নিজ দেশের উপহার দিতে ভুললেন না। ইরাকিদের মিষ্টি আচরণে তাদের সহজ-সরলতা প্রকাশ পায় বারবার। বাংলার যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলার আম্মা আমিনা বেগম মান্নত করেছিলেন তাঁর ছেলে সিরাজ নবাব হলেই প্রথমে ইসলামের জন্য শহীদ হওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রিয় পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কারবালার প্রান্তরে ছেলেসহ তিনি যাবেন। তাই সিরাজ নবাব হওয়ার পর প্রিয় আম্মার মান্নত পূরণে কারবালা যিয়ারতে আসেন। পাশাপাশি কারবালা প্রান্তরের মাটি দিয়ে মুর্শিদাবাদে মদিনা মসজিদ তৈরি করেন। যা আজও বর্তমান। আমাদের প্রিয় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর হৃদয়ের কাছের আপনজন ইরাকের কারবালায় শহীদ হয়েছেন। আর তাঁদের সমাধিস্থল ঘিরে কারবালায়

www.pathagar.com

গড়ে উঠেছে বেশকিছু দৃষ্টি নন্দন রওজা। এর মধ্যে ইমাম হোসাইন (র.) এবং হযরত আব্বাস (র.)-এর রওজার মিনার ও চারপাশ খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি। সন্ধ্যা রাত থেকে এই রওজা এবং তাঁর চারপাশের ফুলের বাগানগুলো বাহারি সব রঙিন আলোয় আলোকিত হয়ে উঠে। রওজা দু'টির ভেতরে নিখুঁত কাচের শৈল্পিক নিদর্শন লক্ষ করা যায়। রওজার বেশকিছু অংশ জুড়ে সোনা রুপার বাহারি সব আলংকারিক কাজের দর্শন মেলে। সোনা রুপার দক্ষ কারিগরি কাজে ছেয়েছিল ফুল ও লতাপাতার বাহার। এরই মাঝে চোখ ধাঁধানো সব ঝাড়বাতি, স্বর্ণ রৌপ্যের সূক্ষ্ম আলংকারিক কাজের উপস্থাপন। আর নিচে শ্বেত পাথর। জানা যায় ... ইরানি কারিগরদের এমন সু-নিপুণ কাজের ছাপ বিশ্বের আর কোথাও দেখা পাওয়া সত্যি কঠিন। কারবালার উক্ত চোখ জুড়ানো রওজাসমূহ ইরাক কর্তৃপক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ করলেও, ইরান ইন্ডিয়াসহ আরও কিছুসংখ্যক দেশের সরকারি এবং বে-সরকারি সংস্থা রওজাগুলোর উন্নয়ন মূলক কাজে প্রতিনিয়ত মুক্তহস্তে সাহায্য-সহযোগিতা করে চলছে। উক্ত রওজাসমূহ জিয়ারতের জন্য দেশি-বিদেশি লক্ষ লক্ষ মানুষের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে ইরাকের শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র 'কারবালা' শহর।

নাজাফ

বন্ধুরা অতীতের সেসব দিনগুলোয় কেমন ছিল নাজাফ, তা গল্প কথায় জেনে নি...

হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (র.) বাড়ি থেকে বের হয়ে অন্যান্য দিনের মতো জঙ্গলের দিকে চললেন। তিনি সবসময় বাগানে কাজ করার কারণে জঙ্গলের আঁকাবাঁকা পথগুলো সম্পর্কে খুব অবগত ছিলেন। তাঁর সাথে একটি বোঝাও ছিল। পথে এক লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করল : "হে আলী! আপনার সাথে কি?" জবাবে আলী (র.) বললেন : "ইনশাআল্লাহ! খুরমা গাছ।" লোকটি আশ্চর্য হয়ে বলল : "খুরমা গাছ"? তার কথার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল যে, সে হযরত আলীর কথার অর্থ বুঝতে পারেনি। (অর্থাৎ খুরমা গাছতো বেশ বড়। সে তো আর ১টা ছোটখাটো বোঝা হতে পারে না।)

সে লোকটির আশ্চর্য বোধ তখন একেবারে দূর হলো, যখন কিছুদিন পর সে ও তার বন্ধুরা দেখতে পেলো যে, সেদিন হযরত আলী খুরমার যে চারাগুলো সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন আর তিনি আশা পোষণ করেছিলেন যে, খুব শীঘ্রই এগুলো মজবুত বৃক্ষে পরিণত হবে, সত্যিই সেগুলো আজ এক সবুজ-শ্যামল খুরমার বাগানে রূপ ধারণ করেছে। হযরত আলী (র.) সেদিন যে খুরমার চারা লাগিয়ে ছিলেন সেগুলো আজ বেশ মোটা তাজা ও সুন্দর বৃক্ষের আকার ধারণ করেছে। বন্ধুরা এতো গেলো অতীতকালের নাজাফের গল্প কথা, আর আজকের নাজাফ কেমন? জানতে ইচ্ছে করছে নিশ্চয়ই! চলুন আমরা ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় জেনেনি....

www.pathagar.com

আল নাজাফ বিমানবন্দরে অবতরণের পর লেখকের ছবি

হযরত আদম (আ.), হযরত নূহ (আ.) ও হযরত আলী (আ.) এর পবিত্র রওজা মোবারক

দূর দূরান্ত থেকে আসা মানুষের ঢল নামে ইরাকের নাজাফ প্রদেশে। এটি একটি পবিত্র শহর। এখানে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন হযরত আদম (আ.), হযরত নূহ (আ.) এবং হযরত আলী (র.)। নাজাফে আছে ইওয়ান জাহবি যার অর্থ 'সোনার ঘর'। আর এই সোনার ঘর ঘিরেই গড়ে উঠেছে হযরত আদম

www.pathagar.com

আ.), হযরত নূহ (আ.) এবং হযরত আলী (র.)-এর মাজার। মাজারকেন্দ্রিব সানার ঘরটি তৈরি হয়েছে ৬০০০ সোনার ইটে আর শুধু মিনার তৈরিতে লগেছে চার হাজার সোনার ইট। উক্ত সোনার ঘরটি সর্বপ্রথম নাদের বাদশাহ তরি করেন। নাদের শাহ দুরানি নিজ শাসনামলে বেশ কয়েকবার শিকারের জন্য মজান্তে হযরত আলীর মাজারের কাছে এলে একটি হরিণের শাবক দেখেন াদশাহ তার শিকারি কুকুর ছেড়ে হরিণের শাবককে ভীত করতে চান। কিন্তু তিবারই তিনি শিকার করতে ব্যর্থ হন। তাঁর শিকারি কুকুরগুলো হযরত আলীর াজারের ১০ কদম দূরবর্তী অবস্থানে এসে নীরব হয়ে বসে পড়ে। আর এভাবে াদশা নাদের হরিণ শিকারে ব্যর্থ হন। পরে তিনি জানতে পারেন হরিণ যেখানে বস্থান করছে তাঁর খুব কাছেই হযরত আলীর রওজা (মাজার)। পরবর্তীতে ক্ত রওজা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি দ্রুতগতিতে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নেন। টি নাজাফে একটি দৃষ্টি নন্দন স্থাপনা।

যরত আলী (আ.) এর সময়কার মসজিদের সামনে লেখক ও শিশু আলীশান ও ফাতমী

হযরত কোমায়েল। যিনি হযরত আলীর বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন। এজাজ বনে ইউসুফ নামের জালিম ব্যক্তির হাতে হযরত কোমায়েল নিহত হন। তাঁর বরের অবস্থান ইরাকের নাজাফ প্রদেশে। তাঁর কবর বর্তমানে মাজারে পান্তরিত দেখা যায়।

ইরাকের নাজাফ এবং কুফা দু'টি ভিন্ন প্রদেশ। 'মসজিদে হানানা'।... এই বিত্র মসজিদ নাজাফ এবং কুফার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। হযরত আলী (র.)-ই শাসন আমলে মসজিদে হানানার নির্মাণ হয়। কুফা থেকে নাজাফ-এ ইমাম সান এবং ইমাম হোসাইন (র.) হযরত আলীর জানাজা নিয়ে আসনে এই সজিদ। ১১ মহররম-এ যখন কাফেলা-এ কারবালা কুফাতে পৌঁছে তখন সমগ্র

www.pathagar.com

রাত্রি বিবি জায়নব (র.) এবং তাঁর সাথে অন্যান্যরা এই মসজিদটিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। কথিত আছে ... 'মসজিদে হানানা' এতটাই পবিত্র স্থান, যেখানে ইমাম হোসাইন (র.)-এর দেহ ছাড়া পবিত্র মস্তক দাফন করা হয়। বিশাল এলাকা জুড়ে দৃষ্টি নন্দন এই মসজিদটির বৃহৎ অংশের অবস্থান ইরাকের নাজাফ প্রদেশে।

কুফা

বন্ধুরা চলুন গল্পকথায় সেসব দিনগুলোয় কুফা কেমন ছিল, তা জেনে নি... সে সময় কুফা নগরী ছিল ইসলামী শাসনের প্রাণকেন্দ্রে। সিরিয়া ছাড়াও ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্য সকল স্থানে সকল লোকের নজর তখন সে নগরীর দিকেই লেগে থাকত এজন্যে যে, সেখান থেকে কখন কোনো নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ হুকুম জারী করা হয়।

বন্ধুপ্রিয় ইরাকি তরুণ

এ শহর থেকে অনেক দূরে নাজাফে দু'ব্যক্তির দেখা হলো। একজন ছিলেন মুসলমান আর অপরজন আহ্‌লে কিতাব (আহ্‌লে কিতাব মানে ইহুদি বা খ্রিস্টান কিংবা যারদস্তী)। দু'জনেই একে অপরের গন্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জানা গেল যে, মুসলমান লোকটি কুফা শহরে যাবেন। আর আহ্‌লে কিতাব লোকটি কুফার নিকটেই অন্য একস্থানে যাবার ইচ্ছা রাখে। দু'জনে মিলে স্থির করলেন যে, তাঁরা এক সাথে সফর করবেন এজন্যে যে অনেক দূর পর্যন্ত দু'জনের রাস্তা একই। আর যাতে করে পরস্পরের কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে রাস্তা খুব সহজে পার হয়ে যায়।

www.pathagar.com

সারকথা হলো, দু'জনে আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আরাম ও শান্তিপূর্ণভাবে সফর করলেন। সমস্ত পথেই তাঁদের মধ্যে নানান বিষয়ে কথাবার্তা হলো, সবশেষে তাঁরা এমন একটি স্থানে এসে উপস্থিত হলেন যেখান থেকে দু'জনের রাস্তা দু'দিকে চলে গেছে। আহ্‌লে কিতাব লোকটি তার নিজের পথ ধরে চলতে লাগল কিছুদূর পথ চলার পর পেছনে ফিরে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। সে দেখতে পেল তার মুসলমান বন্ধুটি কুফার দিকে না গিয়ে তারই পিছে পিছে চলে আসছে। এ অবস্থা দেখে সে দাঁড়িয়ে গেল এবং তার মুসলমান বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল : "কি ভাই! তুমি না বলেছিলে যে, তুমি কুফা যাবে"?

জবাবে মুসলমান বন্ধুটি বললেন : "আমি তো এখনও বলছি যে, আমি কুফা যাবো।"

আহ্‌লে কিতাব লোকটি বলল : "তাহলে তুমি এদিকে আসছ কেন? এটা তো কুফার রাস্তা নয়। কুফা যাবার রস্তা তো একটাই যেটা তুমি পেছনে ফেলে এসেছ।"

মুসলমান বন্ধুটি বললেন : "আমি জানি। কিন্তু আমার মন চাইল যে, কিছুদূর পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গ দেব। কেননা আমাদের নবী বলেছেন : "যখন দু'ব্যক্তি এক সাথে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে পথ চলে তখন এক সাথীর জন্য অপর সাথির কিছুটা হক-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং আমি তোমার হক আদায় করার জন্য কিছু দূর পর্যন্ত তোমার সাথে সাথে চলে আসছি। এরপর তো আমি আমার পথের দিকে ফিরে যাব।"

আহ্‌লে কিতাব বলল : "অহ্! তোমাদের নবী লোকদের ওপর এতই প্রভাববিস্তার করেছিলেন? এখন বুঝতে পারলাম যে, এটা ছিল তাঁর পবিত্র চরিত্র, যার কারণে ইসলাম এত দ্রুত প্রসার করেছে।"

আহ্‌লে কিতাব লোকটি আরো অধিক অবাক হলো তখন, যখন সে জানতে পারল যে, তার সফর সাথি ও পথ চলার বন্ধুটি আর কেউ নন; বরং তিনি হলেন সেকালের মুসলিম মিল্লাতের খলিফা হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (র.)। এর অল্প কিছুদিন পরেই সে আহ্‌লে কিতাব ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেল এবং হযরত আলীর একজন বিশ্বস্ত ও অনুগত সাথি হিসেবে পরিগণিত হতে লাগল। বন্ধুরা চলুন অতীত ইরাকের প্রচলিত আরেকটি সত্য গল্পকথা জেনে নি.... হযরত আলী (র.) কুফার দিকে আসছিল। পথে 'আম্বার' নামক এক শহরে উপস্থিত হলেন। যেখানকার বেশিরভাগ অধিবাসী ছিল ইরানি।

ইরানি কৃষক ও শহরের অন্য সকল অধিবাসী যখন জানতে পারল যে, তাদের প্রিয় খলিফা তাদেরই বস্তি দিয়ে অতিক্রম করবেন তখন তাদের আর আনন্দের সীমা রইল না। সমস্ত লোক তাদের খলিফাকে স্বাগতম ও খোশ্ আমদেদ জানাবার জন্য দৌড়ে এল। হযরত আলী (র.)-এর বাহন যখন এগিয়ে চলল তখন লোকেরাও বাহনের আগে আগে দৌড়াতে লাগল। হযরত আলী (র.) নিজের বাহন থামিয়ে দিয়ে লোকদেরকে ডেকে পাঠালেন। লোকেরা যখন তাঁর কাছে এল তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : "তোমরা এভাবে দৌড়াদৌড়ি করছ কেন? এভাবে দৌড়াদৌড়ির পেছনে তোমাদের উদ্দেশ্য কি?"

www.pathagar.com

লোকেরা বলল : "আসলে এটা আমির-ওমারা, নেতা, শাসক ও সম্মানিত ্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটা রীতি। এটা আমাদের নিয়ম-নীতি যে, ামরা আমাদের প্রিয় নেতা ও সমাজের বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতি এরূপে সম্মান দর্শন করে থাকি। এটা কোনো নতুন বিধান নয়। বরং বহুকাল আগ থেকে চলিত আমাদের একটি প্রথা।" হযরত আলী (র.) তাদেরকে বললেন : তোমাদের এ কাজ তোমাদেরকে এ জগতেও কষ্ট দিচ্ছে আর পরকালেও তামাদেরকে এর কারণে অনেক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমন কাজ কখনো রবে না, যা দ্বারা তোমাদের অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ ঘটে। আর তোমরাই ন্তা-ভাবনা করে দেখ যে, তোমাদের এ কাজের দ্বারা তোমাদের নেতা ও ামিরের কি লাভ হচ্ছে, যার সম্মানে তোমরা এসব করে থাক।" এবার অন্য কটি গল্পকথা।

বন্ধুরা ইরাকে ঘটে যাওয়া একটি সত্য কাহিনী আপনাদের মাঝে উপস্থাপন রছি... হযরত আলী (র.) -এর খেলাফতকালে একবার কুফায় তাঁর একটি যরাহ্ (যুদ্ধে ব্যবহৃত লৌহ পোশাক) হারিয়ে গেল। এর কিছুদিন পরেই যরাহ্টি এক খ্রিস্টান ব্যক্তির নিকট দেখা গেল। হযরত আলী (র.) সে খ্রিস্টান াকটিকে সাথে নিয়ে কাজীর (বিচারপতির) দরবারে গেলেন এবং তার বিরুদ্ধে ামলা দায়ের করলেন। তিনি বললেন : "এ যেরাহ্টি আমার। এটা আমি কারো াছে বিক্রিও করিনি। আর কাউকে দান করেও দেইনি। বেশকিছুদিন পর এখন যেরাহ্টি এ ব্যক্তির নিকট পাওয়া গেল।" কাজী সাহেব খ্রিস্টান লোকটির দ্দেশ্যে বললেন ঃ "যেরাহ্টির ব্যাপারে খলিফা তাঁর দাবি পেশ করেছেন। খন এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?" সে বলল : "এটা আমার নিজের যেরাহ্।

www.pathagar.com

এর সাথে সাথে আমি খলিফাকেও মিথ্যবাদী বলছি না।" (হতে পারে তিনি এটা চিনতে ভুল করছেন)।

কাজী হযরত আলীকে লক্ষ করে বললেন : "আপনি দাবিদার আর এ ব্যক্তি আপনার দাবি অস্বীকার করছে। সুতরাং আপনার কর্তব্য হচ্ছে আপনি আপনার দাবির পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করুন।"

হযরত আলী (র.) মুচকি হেসে বললেন : "কাজী সাহেব! সত্যকথা বলছেন। এখন আমাকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা উচিত। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার কোনো সাক্ষী নেই।"

সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে না পারার কারণে কাজী সাহেব বিচারের রায় খ্রিস্টান লোকটির পক্ষে দিয়ে দিলেন। কাজীর রায় শুনেই সে খ্রিস্টান লোকটি যেরাহ্টি তুলে নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে চলল। কিন্তু সে খ্রিস্টান লোকটি খুব ভালোভাবে জানত যে, এ যেরাহ্টি প্রকৃতপক্ষে কার? সুতরাং কয়েক কদম পথ চলার পর তার মধ্যে আশ্চর্য অবস্থার সৃষ্টি হলো। সাথে সাথেই সে ফিরে এসে বলল : "আপনাদের এ শাসনব্যবস্থা এবং লোকদের সাথে আপনাদের এমন সুন্দর ব্যবহার ধরন পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, এটা কোনো সাধারণ মানুষের আচার-ব্যবহারের নয়। নিঃসন্দেহে এটা নবী-রাসূলদের আচার-আচরণের মতো।" এর সাথে সাথেই সে স্বীকার করলো যে, প্রকৃতপক্ষে এ যেরাহ্টি হযরত আলী (র.)-এরই।" এর অল্প কিছুদিন পরেই লোকেরা দেখতে পেলো যে খ্রিস্টান লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছে এবং সীমাহীন আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে হযরত আলী (র.)-এর পতাকাতলে থেকে যুদ্ধও করেছে। বন্ধুরা আমরা অতীত ইরাকের অনেক শিক্ষণীয় গল্প কথা জানলাম। এবার বর্তমানে ইরাকে আসা যাক ... ইরাকের 'কুফা' প্রদেশে নবী-রাসূলের সময়কার প্রাচীন সব নিদর্শন দেখা যায়। কুফায় দর্শনীয় স্থানসমূহ- মসজিদে কুফা, ব্যত-এ আলী, মাজার-এ মিসামে তামার, মসজিদে সাহলা, ইলমে ফিক্কা কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি অব কুফাসহ আরও বেশকিছু স্থাপনা।

কুফার মসজিদ সাহলা... এখানে হযরত আদম (র.), হযরত মুহাম্মদ (স), হযরত আলী (র.)সহ সকল নবী নামাজ পড়েছেন। কথিত আছে... উক্ত মসজিদে অদৃশ্য শেষ নবী হযরত মেহদী (র.) এর আগমন ঘটলে সেটি হবে নবীর ঘর। এবং মাসজিদে সাহলার দায়িত্বপ্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের কাছে জানা যায়... উক্ত মসজিদে বহুপূর্বে শেষ নবী হযরত মেহেদী (র.) তাঁর সাহাবাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনায় বসেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমি উক্ত মসজিদে সাহলাতে জুমার নামাজ পড়ার সুযোগ পেয়েছি।

মাজার-এ মিসামে তামার কুফাতে অবস্থিত। মিসামে তামার হযরত আলীকে প্রচণ্ড রকম ভালোবাসতেন। তাঁর আসল নাম সালাম। তিনি ইরানি ছিলেন। একদা মিসাম হযরত আলীকে নিজ মৃত্যু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে হযরত আলী বলেন, ... "কুফার নির্দিষ্ট এক বৃক্ষতে তোমাকে ঝুলিয়ে,

www.pathagar.com

অত্যাচারী এক শাসক ফাঁসি দিবে। আর তোমার জিহ্বাও কর্তন করবে। এতে মসাম বিন্দু মাত্র বিচলিত না হয়ে হযরত আলীকে বলেন... "আপনার গালোবাসায় আমার বারবার মৃত্যু কবুল।" তাই ছোট সেই বৃক্ষের শিকড়ে পানি দয়ে বৃক্ষকে বাড়তে সাহায্য করলেন। তাঁর ভবিষ্যৎ মৃত্যুর কারণ সেই বৃক্ষের শকড়ে পানি দিয়ে বৃক্ষকে বড় হতে সাহায্য করাতে সেই বৃক্ষের স্থানীয় াসিন্দারা তাঁকে পাগল বলে গল্প কথায় মেতে উঠে। এতে তিনি বিন্দুমাত্র বচলিত হননি।

ঐতিহ্যবাহী উক্ত বাসস্থানে হযরত আলী (আ.), বিবি ফাতেমা (রা.) ইমাম াসান (রা.) ও ইমাম হোসাইন (রা.) সহ একই পরিবারের অন্যান্য সম্মানিত াদস্যরা বাস করতেন

কুফাতে হযরত আলী (র.) যে বাসস্থানে থাকতেন ... তাঁকে স্থানিয়রা ্যাত-এ আলী বলে। এই বাসস্থানে ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন, হযরত াব্বাস, বিবি জায়নাব, বিবি কুলসুম, বিবি ফাতেমা এবং হযরত আলী (র.) াসবাস করতেন। বাসস্থানটির আসবাবপত্র, দেয়াল, দরজা, জানালা সব অক্ষত বস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করছে ইরাক কর্তৃপক্ষ। হযরত আলী (র.) এর প্রিয় ারিবার পরিজনের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের দেখা মেলে ব্যাত-এ আলীতে। উক্ত ্যাপনার ভিতরের অংশ অবিকল সেইসব দিনগুলোর মতো থাকায়, পরতে ারতে ইসলামী ঐতিহ্যের ছোঁয়া পাওয়া যায়। স্থাপনাটি সত্যিই দৃষ্টি নন্দন। সইসব দিনগুলোয় নবী-রাসূলদের পরিবার-পরিজনরা যে বাসস্থানে থাকতেন, যসব জিনিসপত্র ব্যবহার করতেন। সেগুলো স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া, সৌভাগ্যের ্যাপার ছাড়া আর কি হতে পারে।

www.pathagar.com

মসজিদে কুফা ইসলামের ঐতিহ্যবাহী একটি মসজিদ। মসজিদটির কারুকার্য ও নির্মাণ শৈলি ইরাকের অন্যান্য মসজিদ ও স্থাপনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সু-বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে মসজিদটির অবস্থান ইরাকের কুফা প্রদেশে। তাইতো মসজিদটির নাম ও রাখা হয়েছে প্রদেশের নামেই। বাহারি সব কারুকার্যের কারণে মসজিদটির ভিতর ও বাহির দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। উক্ত মসজিদে হযরত মুহাম্মদ (স), হযরত আদম (র.), হযরত ইব্রাহিম (র.), হযরত খিজার, হযরত ঈসা, নূহ (র.), জিবরাঈল (র.), ইমাম সাজ্জাদ, ইমাম জাফর সাদেকসহ আরও অনেকেই অবস্থান করে নামাজ আদায় করেন। এই মসজিদে হযরত আলীর জামাই ও ভাতিজা হযরত মুসলিম ইবনে আকিলের কবর আছে। যাকে ইবনে জিয়াদ হত্যা করে। হযরত হানি ইবনে উরওয়া যিনি মহানবী (স), হযরত আলী (র.), ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনের সাহাবি ছিলেন। দুষ্টচক্রের ইন্ধনে তাকে শহীদ করা হয়। মসজিদে কুফায় তাঁরও কবর আছে। মিসামে তামারের কবরও উক্ত মসজিদের ভেতর অংশে দেখতে পাওয়া যায়। মিসামে তামার যিনি হযরত আলী (র.) -এর বড় প্রেমিক ছিলেন। লোক মুখে শোনা যায় ... হযরত আলী নিজ বাসস্থান থেকে মসজিদে কুফাতে নামাজ পড়তে যাওয়ার সময়, তাঁকে তাঁর বাসস্থানের পশুপাখিরা চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে। নিস্পাপ পশুপাখিরা বুঝে গিয়েছিল মসজিদে কুফাতে হযরত আলী গেলে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। হযরত আলী (র.) তাঁদের বাধার কারণ বুঝতে পেরেও মসজিদে কুফায় নামাজ পড়তে যান। শত্রু পক্ষ নামাজরত হযরত আলীর ওপর আক্রমণ করলে নামাজরত অবস্থায় মসজিদে কুফায় তিনি শহীদ হন।

ফোরাত নদের শহরে

"সালাম সালাম, হাজার সালাম কারবালার শহীদদের স্মরণে। আমার হৃদয় শুধু কেঁদে যায় তাঁদের স্মৃতির স্মরণে।" বন্ধুরা... মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রিয় পরিবারের বেদনাদায়ক স্মৃতি ইরাকের কারবালা প্রদেশকে প্রতিনিয়ত কাঁদায়। চলুন জেনে নিই সেইসব দিনের কথা ... 'কারবালা' একটি স্থানের নাম, কিছু মাটির নাম। কিন্তু এর তাৎপর্যের গভীরতা এত বেশি মাটি আর স্থানের নাম ছাপিয়ে কারবালা ইতিহাসের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক বিয়োগান্তক ঘটনার মর্যাদা পেয়েছে। কারবালার মাটি থেকে উত্থিত আহাজারি ও আহ্বান শোনার জন্য প্রয়োজন হোসাইনী হৃদয় সত্যের সাক্ষ্যদাতার বলিষ্ঠ মন ও দৃঢ়চিত্ত। কারবালার মাটিতে সত্য মিথ্যার যে অসম লড়াই হয়েছিল, হিজরি ৬১ সাল থেকে প্রতিনিয়ত তা আমাদের হৃদয়কে দলিত মথিত করে শোকের মাতম উপচিয়ে শক্তির যোগান দেয়। তাইতো আজ কারবালা, মহররম, আশুরা সত্যের মাপকাঠিতে প্রতিষ্ঠিত। বস্তুগত ধারণায় কারবালা প্রান্তরে ইয়াজিদ এবং

www.pathagar.com

য়াজিদীর বিজয় হয়েছিল। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ তা মানেনি। কারবালায় খুন য়েছে হোসাইনের কিন্তু মৃত্যু হয়েছে ইয়াজিদের। কারবালা ইরাকের ৈতিহ্যমান একটি শহর। যেখানে ফোরাত নদীর কূলে শায়িত রয়েছেন মহানবী যেরত মুহাম্মদ (স) এর প্রিয় নাতি ইমাম হোসাইন (র.)। আমাদের প্রিয় নবী যেরত মুহাম্মদ (স) এর প্রিয় নাতি হযরত ইমাম হোসাইন (র.) ৩রা শাবান াসে ৪ঠা হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর ইমাম আলী (র.) মহানবী-ক বলেন "আপনার ওপর এই নবজাতকের নামকরণের দায়িত্ব বর্তালো।"

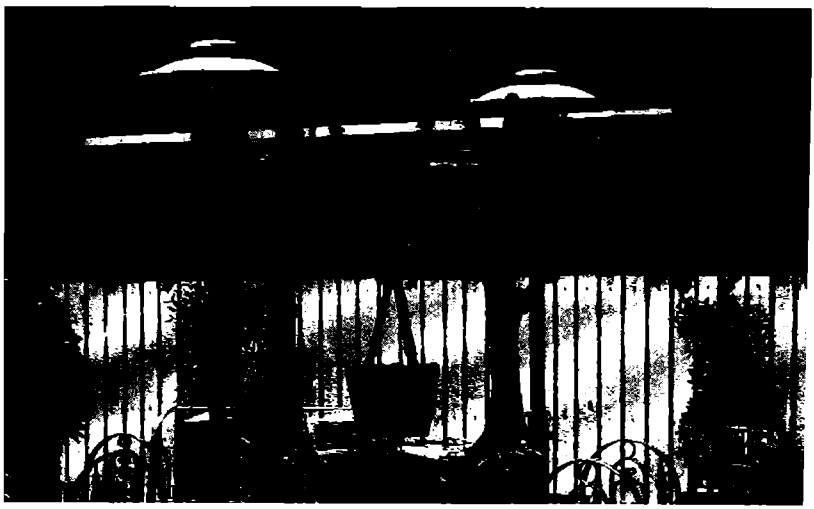

দৃশ্যনন্দন ভাস্কর্য্যটির দেখা মেলে ইরাকের কারবালায়

মহনবী তাঁর নাম হোসাইন রাখেন। ইমাম হোসাইন নিজ বাল্যকাল পিত াতার পাশাপাশি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)- এর স্নেহের পরশে অতিবাহিত রেন। মহানবী নিজ কন্যা বিবি ফাতেমা (রা.) এবং হযরত আলী (র.) ম্পতির কনিষ্ঠ পুত্র ইমাম হোসাইনকে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসায় ালোবাসতেন। তাঁকে ঘাড়ে, কোলে নিয়ে খেলাধুলা করতেন এবং একসাথে পরিবারে নামাজে যেতেন। মহানবী তাঁর প্রিয় নাতি ইমাম হোসাইন সম্পর্কে নেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ : ১) হাসান এব হাসাইন হলেন বেহেস্তের যুবকদের সর্দার ২) হোসাইন আমার হতে, আমি হাসাইন হতে ৩) হাসান এবং হোসাইন বসে থাকুক বা দাঁড়িয়ে থাকুক, সকল বস্থাতেই ইমাম।

ইমাম হোসাইন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) -এর ইন্তেকালের পর নিং পিতার ভালোবাসার বন্ধনে বড় হতে থাকেন। হযরত আলী (রা.) এর শাহাদা এর পর নিজ ভাই ইমাম হাসান - কে তাঁর কাজে সহযোগিতা করেন

www.pathagar.com

তৎকালীন খলিফার ষড়যন্ত্রে ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে শহীদ করা হয়। অতঃপর ইমাম হোসাইন (র.) ইমামতের গুরু দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। খেলাফতি যুগের পর ইসলামী হুকুমতকে স্বৈরাচারী নেতৃত্বে পদদলিত করেছিল উমাইয়াদের রাজতন্ত্র। ইয়াজিদ ইবনে আমির মাবিয়া ইসলামী শাসনকে যখন বিকৃতির চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন, ইসলাম যখন রাজতন্ত্রের বলিতে পরিণত হতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সংকটময় মুহূর্তে ইমাম হোসাইন (র.) নিজের রক্ত দিয়ে ইসলামকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি অকাতরে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন তবুও অন্যায় অসত্যের কাছে নতি স্বীকার করেননি। স্থান, কাল ও পরিস্থিতির আলোকে ইমাম হোসাইন (র.) ও তাঁর সাথীরা বিশ্বের দরবারে চরম আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। কবির ভাষায় ... "তাঁরা বক্ষের উপর বর্ম পরিধান করেননি; বরং বর্মের উপর প্রাণকে উৎসর্গ করেন, তারা জীবন বিসর্জন দিতে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হোন।" ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে আমরা যদি পার্থিব ঘটনা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখা যায় পৃথিবীতে স্মরণাতীতকাল ধরেই চলে আসছে শোষক আর শোষিতের, জালিম আর মজলুমের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। আদি মানব পরিবারের হাবিল ও কাবিলের মধ্যে স্বার্থের জন্যে কি রকম সংঘাত হয়েছিল তা আমরা জানি।

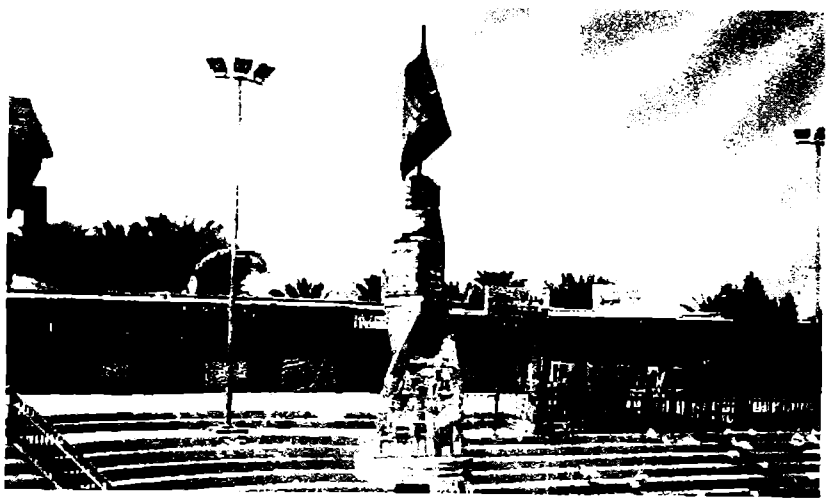

ইরাকের কারবালা প্রদেশে অবস্থিত বিখ্যাত ফোরত নদের অংশ

তারপর থেকে যুগ যুগ ধরে মানুষে মানুষে সংঘাত চলে আসছে। মুয়াবিয়া চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী প্রতারণার পথ বেছে নিয়ে হযরত আলী ও ইমাম হাসানকে পৃথক পৃথক সময়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শহীদ করে এবং তাঁরই পুত্র চরিত্রহীন মদ্যপায়ী ইয়াজিদকে স্থলাভিষিক্ত এবং মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা

www.pathagar.com

ঘোষণা দেবার প্রত্যাশার পক্ষে বায়াত গ্রহণ শুরু করে। অতঃপর ইমাম হোসাইন (র.)-এর নিকট বায়াতের প্রত্যাশায় প্রস্তাব পাঠায়। নিষ্পাপ ও পবিত্রতার প্রতীক ইমাম হোসাইন বলেন... "ভাই সব ! অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আপনারা দেখছেন যে সত্য উপেক্ষিত, মিথ্যা প্রতিষ্ঠিত। এমন একটা চরম মুহূর্তে আমরা পৌঁছেছি যখন খোদার পথে নিহত হওয়ার জন্যে মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষী হতে হবে। অন্তত আমার ব্যাপারে আমি বলতে পারি স্বৈরাচারের সাথে সহাবস্থান করাকে আমি অপরাধ মনে করি। তাই এক্ষণে শাহাদাত লাভকেই আমি অগ্রাধিকার দেব।" ইমাম যখন কুফার পথে রওয়ানা হন তখন কবি ফারাজদাক এসে ইরাকের বিপজ্জনক পরিস্থিতির কথা তাঁকে অবহিত করেন। তখন ইমাম হোসাইন নির্বিকার চিত্তে বলেছিলেন... "প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর যেকোনো পরিস্থিতিতে আমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ। আমাদের কাঙ্ক্ষিত পথে যদি ঘটনা প্রবাহ অগ্রসর হয় তাহলে আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ। আর অপ্রীতিকর কিছু ঘটে গেলেও আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব না। তখনো আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবো। কেননা, আমাদের উদ্দেশ্য সৎ এবং বিবেকপ্রসূত। সুতরাং যা কিছু ঘটুক না কেন সবই আমাদের ভালোর জন্যেই।" ঈমানের মূর্তপ্রতীক হযরত ইমাম হোসাইন (র.) তাঁর পূর্ণ সিদ্ধান্তে অনড় ও অটল থাকার সুস্পষ্ট ঘোষণা করলেন। বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। শুরু হলো যুদ্ধ। ইসলামী সৈন্য সংখ্যা ৭২-১১০ জনের মধ্যে কয়েকজন নওজোয়ান ছাড়া বৃদ্ধ, শিশু ও নারিগণ। তারা একে একে ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। আর বীরবিক্রমে লড়াই করে অসংখ্য শত্রুদেরকে জমালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। অবশেষে নিজেরাও শাহাদাতবরণ করলেন। অসম এই যুদ্ধে ইমাম বাহিনী ছিল তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রতর এবং পানি হতে বঞ্চিত তৃষ্ণা কাতর। ইয়াজিদ বাহিনী কারবালার ফোরাত নদীর পানি দখল করে নেয়, যাতে ক্ষুধা-পিপাসায় ইমাম হোসাইন ও তাঁর স্ত্রী, সন্তান ও সাথিরা কষ্ট পায়। এত কিছুর পরও ৩দিন ৩রাত অভুক্ত পিপাসায় কাতর, শোক, দুঃখ মর্মাহত ইমাম হোসাইন (র.) যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন।

যুদ্ধ চলাকালে খিমার দিক হতে শিশুর ক্রন্দনের শব্দ ইমামের কানে এলে তৎক্ষণাৎ খিমায় প্রত্যাবর্তন করে দেখতে পেলেন স্বীয় পুত্র ৬ মাসের দুগ্ধপোষ্য আলী আসগর কঠোর পিপাসায় ও ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে। তিনি শিশুপুত্রকে হাতে তুলে নিয়ে শত্রুদেরকে একটু পানি দিতে বললেন। এই সুযোগে ইয়াজিদের সেনাপতি ওমর বিন সাদের নির্দেশে হুরমুলা নামের পাষণ্ড ছুঁড়ল তীর, শিশু আসগরের গর্দান পিতা হোসাইনের বাহু ভেদ করে তীরটা বেরিয়ে গেল। বাচ্চাটা পিতার কোলেই শহীদ হয়ে গেলেন। ধৈর্যের প্রতীক ইমাম শহীদ শিশুকে শুইয়ে রেখে যুদ্ধ শুরু করলেন, ইয়াজিদ সৈন্যরা দিকদ্বিক হয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল আল আমান, আল আমান। ইমাম হোসাইন এই শব্দ শ্রবণ মাত্রই তাৎক্ষণিক দুশমনেরা তাঁকে চারদিক হতে ঘিরে ফেলল। বৃষ্টির মতো বর্ষিত হলো তীর, বল্লম, নেজা ইত্যাদি। অবশেষে অসংখ্য আঘাত ও জখমপ্রাপ্ত

www.pathagar.com

য়ে ইমাম হোসাইন অশ্ব পৃষ্ঠ হতে জমিনে অবতরণ করলেন। পাষণ্ড সীমা
সে ইমামের মস্তক মোবারক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। পবিত্র আহ
য়াতের খিমা লুণ্ঠিত হলো। দলিত, মথিত করা হলো শহীদের লাশ। আ
ভাবেই ৪ হাজার সৈন্যের ইয়াজীদ বাহিনী হযরত ইমাম হোসাইন এর ছেলে
ময়ে, পরিবার-পরিজন ও ক্ষুদ্রসংখ্যক ইসলামী বাহিনীকে ঘেরাও ক
র্মমভাবে হত্যা করে। হযরত হোসাইন আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়
াঁকে জবাই করা হয়। তাঁর কাছে যা ছিল সবই খুলে ফেলা হয়। এমনকি তাঁ
াশ থেকে কাপড়ও খুলে ফেলা হয়। পরে তাঁকে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করা হ
হিলাদের গায়ের চাদরও ছিনিয়ে নেওয়া হয়। হযরত হোসাইন ও অন্যা
হীদদের পবিত্র মস্তক বিচ্ছিন্ন করে কুফায়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রকাশ্
দর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ৬১ হিজরি ১০ই মহররম ইমাম হোসাইন ও তাঁ
াহিনীকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে দুষ্ট ইয়াজিদ বাহিনী। শহীদদের মা
হলেন ইমাম হোসাইন (র.) এর প্রাণপ্রিয় ভাই হযরত আব্বাস আলামদার
য়াজিদ বাহিনী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রিয় পরিবার-পরিজনের সা
দ্ধের সকল কালের নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করে মানবতার ইতিহাসে চরম অশালী
াচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সন্দেহ নেই ইমাম হোসাইনের জিহাদের আ
ল ছিল বিয়োগান্ত। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁরই বিজয় হয়েছে। প্রকৃত ইসলামে
ন্যে, সত্য ও ন্যায়ের জন্যে, তাঁর আত্মত্যাগ আজ সকলের কাছেই আদরণী
বং কাম্য।

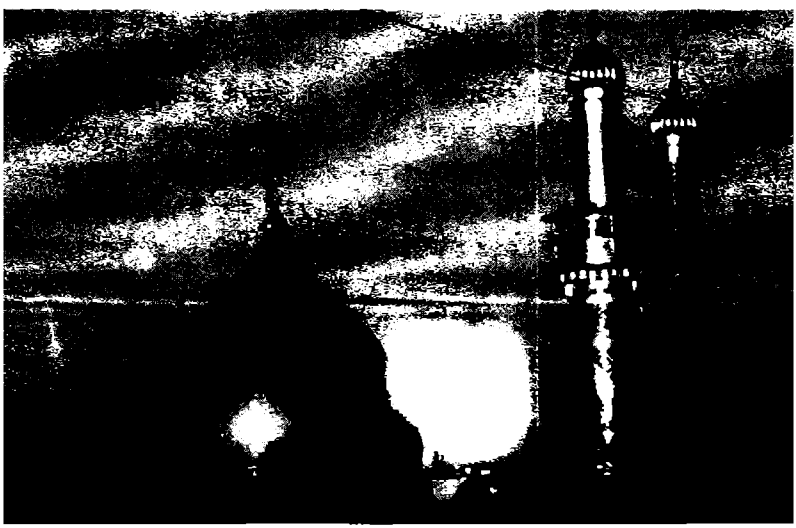

রওজায়ে হযরত আব্বাস (আ.)

www.pathagar.com

একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার জন্যে তাঁর আদর্শই যে অতুলনীয় তা আজ সবার কাছেই স্বীকৃত। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা জন্যে অসৎ ও অন্যায়ের প্রতি মাথা নত না করার শিক্ষা তিনিই মানবজাতিকে দিয়ে গেছেন।

ইমাম হোসাইন (র.) এর প্রাণপ্রিয় ভাইজান হযরত আব্বাস একজন মহাবীর। যাঁর বীরত্বের কথা আরবরা আজও ভুলেনি। তিনি নিজ ভাইজানের সাহায্যার্থে কারবালায় বীরত্বের নজিরবিহীন উদাহরণ রেখে যান। তিনি ইমাম হোসাইনের পরিবারের জন্য ফোরাত নদীতে নেমে, পানি আনার চেষ্টা করেন। যদিও তিনি নিজেই তৃষ্ণার্ত ছিলেন, তবুও ছোট ছোট শিশু ও মহিলাদের পূর্বে নিজ তৃষ্ণা মেটানোকে পছন্দ করেননি। তাই তিনি নদীর পানি পাত্রে করে তৃষ্ণার্তদের তৃষ্ণা মেটাতে যেই এগিয়ে এলেন, এমন সময় ইয়াজিদ বাহিনীর অতর্কিত হামলায় হযরত আব্বাস শাহাদৎ বরণ করেন। ইরাকের কারবালা প্রদেশে ইমাম হোসাইন (র.) -এর মাজারের পাশে রয়েছে গাঞ্জে শাহীদা, এখানে ইমাম বাহিনীর অন্যান্যদের দাফন করা হয়। আর এই পবিত্র স্থান থেকে ২০০ মি. এর দূরত্বে রয়েছে হযরত আব্বাস আলামদারের রওজা। হযরত আব্বাসের মাজার থেকে খুব কাছাকাছি রয়েছে নাহরে ফোরাত। যা কখনো স্বচ্ছ পানির নদী ছিল, সেখান থেকে তৃষ্ণার্তদের জন্য হযরত আব্বাস পানি আনতে গিয়ে ছিলেন। পরবর্তী সময় ইমাম হোসাইনের বেঁচে থাকা কিছুসংখ্যক বংশধর কারবালা জিয়ারতে যান, সেই জায়গাটি আজও ফোরাতকূলে বিদ্যমান রয়েছে। নাহরে ফোরাতের পাশেই রয়েছে মাকামে ইমাম জামান। ইমাম হুসাইনের রওজার সামনে রয়েছে, তিল্লে জায়নাবিয়া। যেখান থেকে বসে বিবি হযরত জায়নাব নিজের ভাইয়ের যুদ্ধ দেখেছিলেন এবং এক পর্যায়ে তিনি দেখতে পেলেন যে পাষাণ সীমার তাঁর প্রিয় ভাইজানের শিরশ্ছেদ করছে নিষ্ঠুরভাবে। কারবালার আলোচিত স্থাপনাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রতি যুগেই বিশ্বের সব ক্ষেত্র থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) পরিবার ভক্তরা ইরাক কর্তৃপক্ষকে পূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন। যার দরুন কারবালার পবিত্র স্থাপনাসমূহ এবং তাঁর চারপাশের পরিবেশ প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন দৃষ্টি নন্দন রূপে দেখা দেয়।

www.pathagar.com

আলিবর্দী খাঁর মাতৃভূমি ও জন্মভূমি ইরান
পারস্যের গল্পকথা

আজকের ইরান প্রাচীনকালে পারস্য নামে পরিচিত ছিল। গড়ে ওঠে এক উন্নত সভ্যতা। এ সভ্যতার লোকেরা সামরিক শক্তিতে খ্যাতিমান ছিল। সভ্যতার ইতিহাসে দুইটি ক্ষেত্রে পারসিয়দের অবদান ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি সুষ্ঠু ও দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং ২য়টি ধর্মীয় ক্ষেত্রে ১টি স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে আসা।

ভৌগোলিক অবস্থান : আরব মরুভূমির উত্তরে বিস্তীর্ণ উর্বর ভূমিতে গড়ে ওঠেছিল পারস্য সভ্যতা। উত্তর-পশ্চিমে দানিয়ুর নদীর অববাহিকা থেকে পূর্বদিকে এগিয়ে গেছে পারস্যের ১টি অংশ, আর অন্য অংশের বিস্তার ছিল কৃষ্ণ সাগরের উত্তর প্রান্ত থেকে শুরু করে রাশিয়ার দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত।

রাজ্য থেকে সাম্রাজ্য : পারস্যের উত্তর অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ১টি দল দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রসর হয়ে ভারতে এসে পৌছে। অন্য দলটি দানিয়ুব নদী অতিক্রম করে বল্কান উপদ্বীপে আসে। গ্রিক রোমানদেরই পূর্বপুরুষ ছিল এরা। ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীদের এ জাতি আর্য নামে পরিচিত। ইরানে প্রবেশ করা এ আর্যদের প্রধান ২টি গোত্র ছিল মেডেস ও পারিসয়। আসিরীয়দের পতন ঘটলে পারস্য উপসাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এরা পারস্য সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।

পারস্য প্রশাসন : বিশাল সাম্রাজ্যকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য তৎকালীন সময় সম্রাট দারিয়ুস ১টি দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। তিনি একাধারে সামরিক, বেসামরিক ও বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন। দেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দারিয়ুস পুরো সাম্রাজ্যকে ৪টি অঞ্চলে বিভক্ত করে ৪টি রাজধানী গড়ে তোলেন। এগুলো হচ্ছে ব্যাবিলন, সুসা, পার্সেপলিস ও একবাটানা। এছাড়াও পারস্য সাম্রাজ্যকে ২১টি প্রদেশে ভাগ করা হয়।

বিজ্ঞান : সম্রাট দারিয়ুস মিশরিয়দের ১২ মাসে বছর ও ৩০ দিনে মাস গণনার রীতি গ্রহণ করে পারসিয় দিনপুঞ্জি তৈরি করেন।

লিখন পদ্ধতি : পারস্যে দুইটি ভাষার প্রচলন ছিল। ১টি আরশিয়, অন্যটি প্রাচীন পারসিয়। প্রথমদিকে পারসিয়রা কিউনিফর্ম লিপিতেই লিখত, এরা ৩৯টি কিউনিফর্ম চিহ্ন ব্যবহার করত। এসব কিছুই এখন ইতিহাস। পারস্যে বিপ্লব হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে অনেক কিছু। তাইতো পারস্যবাসী তাদের জাতীয় নেতা করেছেন ইমাম খোমেনিকে। দেশটির অর্থ 'তুমান'সহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক স্থাপনায় জাতীয় নেতার ছবি তুলে ধরে, তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছেন আজকের পারস্যবাসী।

www.pathagar.com

প্রাচীন লোকগাঁথা : বন্ধুরা ... ভালোবাসাবাসীর যে চিরায়ত ঘটনা তা কিন্তু চলে আসছে সুপ্রাচীনকাল থেকেই। এমনকি মানব ইতিহাস ছেড়ে কল্পকাহিনী আর পৌরানিক জগতেও ভালোবাসার অবস্থান দীর্ঘদিন থেকেই। যুগে যুগে অমর প্রেম নিয়ে যত গল্পকথা রচিত হয়েছে তার মধ্যে ইরানি প্রেম গাঁথা শিরি-ফরহাদের ভালোবাসার কথা আজও মানুষের মুখে মুখে। তবে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে প্রাচীন এই ইরানি লোকগাঁথাটিকেও। এর মধ্যে সবচেয়ে সমর্থনযোগ্য যে সূত্রগুলো পাওয়া যায় তাতে শিরিনকে দেখানো হয়েছে রাজকন্যা হিসেবে। তবে নায়ক ফরহাদের পরিচয় দিতে যেয়ে কেউ তাকে উল্লেখ করেছেন ভাস্কর হিসেবে, আবার কেউবা তাকে আখ্যায়িত করেছেন বাঁধ নির্মাতা হিসেবে। এক্ষেত্রে যেসব ইতিহাসবিদ ফরহাদকে বাঁধ নির্মাতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাদের যুক্তি হলো ফর্হাদ শব্দটি হলো 'বৃত্ত' বা বাঁধের কাছাকাছি। এই ধারায় বিশ্বাসীদের বর্ণিত, কাহিনীতে দেখা যায় নায়িকা শিরি একসময় ফরহাদকে বলেছিল যে... "তুমি যদি ওই নদীতে বাঁধ তৈরি করতে পারো তাহলেই আমাকে পাবে।" ফরহাদ শিরিকে পাবার জন্য এই অসম্ভবকে সম্ভব করার আশায় কাজে নামে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাঁধ ভেঙে জলের তোড়ে মারা যায় ফরহাদ। আর তার দুঃখে শিরিও পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। অন্যদিকে আরেকটি নির্ভরযোগ্য কাহিনীতে ফরহাদকে দেখানো হয়েছে হতভাগা এক ভাস্কর হিসেবে। ফরহাদের বিশ্বাস এবং গর্ব ছিল যে, তার বানানো মূর্তির চেয়ে সুন্দর, দুনিয়ায় আর কিছুই নেই। কিন্তু হঠাৎ করে 'কোহে আরমান'-রাজ্যের রাজকন্যা শিরির হাতে আঁকা ১টি ছবি দেখে সেই অহংকার চূর্ণ হয়ে যায় ফরহাদের। শিরির রূপে পাগল প্রায় ফরহাদ তখন একের পর এক শিরির মূর্তি গড়তে শুরু করেন। একদিন উম্মাদ প্রায় ফরহাদের সাথে সামনা সামনি দেখাও হয়ে যায় শিরির। কিন্তু রাজ্য আর ক্ষমতার কথা চিন্তা করে ফরহাদকে ফিরিয়ে দেয় শিরি। তবে শিরির এই প্রত্যাখ্যান যেন ফরহাদের মনে নতুন করে জ্বালিয়ে দেয় প্রেমের আগুন। 'বেসাতুন' পর্বতকে শিরির স্মৃতি ভাস্কর হিসেবে গড়ে তুলতে কঠোর পরিশ্রম শুরু করে সে। ফরহাদের এই ঘটনা শুনে শিরিও স্থির থাকতে পারে না। সিংহাসন তুচ্ছ করে সে ছুটে যায় 'বেসাতুন'-পর্বতে ফরহাদের কাছে। পরবর্তীতে এক ভূমিকম্পে দু'জনই একসঙ্গে প্রাণ হারায়। আর এভাবেই তাঁদের হৃদয় ছোঁয়া ভালোবাসার সমাপ্তি ঘটে।

হৃদয়ে ছোঁয়া ভালোবাসা

কত সুন্দর এই পৃথিবী, পৃথিবী এত সুন্দর হবার পেছনে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি তার অন্যতম হচ্ছে পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার সুন্দর সৃষ্টি গাছপালা আর সুন্দর হৃদয়ের মানুষেরা। গাছপালা মানেই অন্তহীন সবুজের মায়াবী পটভূমি। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক অনেক নিবিড়। কারণ প্রকৃতির কোলে মানুষের বসবাস। নদী আমাদের প্রতিদিনের অনেক চাহিদা মেটায়, সাগর থেকেও অনেক কিছু পাই। তেমনি বন, পাহাড়, তৃণভূমিও আমাদের

www.pathagar.com

নানামুখী চাহিদা মেটায়। যে প্রকৃতি আমাদের জীবনকে আগলে রেখেছে, সে প্রকৃতির অন্যতম সুন্দর সঙ্গী হচ্ছে তার বিচিত্র জীবজন্তু। প্রকৃতির সবকিছুই নিজের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি চলতে পারে না। এমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অঞ্চল যাকে পারস্য বলা হয়। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য এ অঞ্চলকে ভিন্ন সুষমা দান করেছে। আর সেখানকার মানুষের মনকে করেছে স্বপ্নবিলাসী। ইরান... চারপাশে পাহাড় আর অরণ্য। মাঝে মাঝে সমতল, পাহাড়ি নদী, দু-একটি গ্রাম। থরে থরে সাজানো ফল-ফুলের বাগান। সবকিছুই যেন ছবির মতো সাজানো-গোছানো। অনেক দূরে একেকটি শহর, রাজধানী। কোনো এক যুগে সেখানে সম্রাটরা থাকতেন। তবে তারা সবসময় রাজ্যের পরিধি বাড়ানোর কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখতেন। বিরাট বিরাট সৈন্যদল নিয়ে আক্রমণ করতেন নিকটবর্তী দেশগুলো। সেই সৈন্যদলে ইরানি এক বীর যুবক ছিলেন, মাতৃভূমি সিরাজে তাঁর জন্ম (১৯-৯-১৬৭৪)। নাম তার মির্জা মোহাম্মদ বন্দে আলি। বয়স যখন ১৩, এই অল্প বয়সেই মনে প্রাণে তিনি যেন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময় থেকেই রপ্ত করেছেন যুদ্ধ কৌশল। শত্রু সম্পর্কেও একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মেছিল। যে বয়সে তাঁর দুরন্তপনায় মেতে উঠার কথা সে বয়সেই তিনি লেগে গেলেন দেশ রক্ষার কাজে। কিন্তু ভাগ্য সহায় হলো না। প্রায় সব যুদ্ধেই হেরে যেতে লাগলেন। এ ফাঁকে অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ততদিনে তিনি পরিপূর্ণ যুবক। পারিবারিক সম্মতিতে বিবাহ করেন ইরানি সুন্দরী শরফুন্নিসাকে। এরপর লক্ষ স্থির করেন ভারতবর্ষে। নতুন দেশে আগমন ঘটল, সেই সঙ্গে ভালোবেসে ফেলেন বৈচিত্র্যের এদেশটাকে। মাতৃভূমি ইরানের হাহাকার মেটানোর জন্যই এদেশটাকে করে নিলেন বড্ড আপন। আর সেই ভালোবাসাই ছড়িয়ে দিতে লাগলেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার প্রতিটি হৃদয়ে হৃদয়ে। মির্জা মোহাম্মদ বন্দে আলির পিতৃভূমি ইরাকের পবিত্র কারবালা প্রদেশে। তবে তাঁর জন্ম ১৬৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর, ইরানের সিরাজ শহরে। সেখানে নিবিড় অরণ্য ছিল, নদী ছিল, ছিল আদিগন্ত শস্যের মাঠ। বিচিত্র গাছপালা আর ছায়াঘেরা পথ-প্রান্তর শৈশবেই তাঁর চোখে সবুজ স্বপ্ন এঁকে দিয়েছিল। এই নিবিড় সবুজ তৈরির স্বপ্নই তাঁর সারাজীবনের সঙ্গী হয়েছিল। ১৭৪০ দু'বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদেই মনসুরাগঞ্জের অবস্থান। মনসুরাগঞ্জ ১৭৪০-১৭৫৬ সালে নবরূপে রূপসী হয়ে উঠে। সেইসব দিনগুলোয় দেখা মেলে সুসজ্জিত মনোরম উদ্যান, ১৭৪০ সালের পূর্বে যেখানে ছিল শূন্য ও সৌন্দর্যহীন মাঠ। ১৭৪০ সালে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবি লাভের পর মির্জা মোহাম্মদ বন্দে আলী বাংলার মসনদে বসলেন। তিনি মুঘল সম্রাট মোহাম্মদ শাহ কর্তৃক 'আলিবর্দী খান' এবং 'মহব্বতে জঙ্গ' উপাধিতে ভূষিত হন। আলিবর্দী খান সাহসী যোদ্ধা ও কূটনীতিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করায় মুঘল সম্রাট কর্তৃক সুবা বাংলার স্বাধীনতার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। নবাব আলিবর্দী খান নিজে শিক্ষিত ছিলেন এবং শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বিদ্বান ব্যক্তিদের তিনি সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আলিবর্দী খানের আমলে বাংলায় ফার্সি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। তাঁর আমলের ফারসি সাহিত্যের ভাবধারা এবং পারস্য সংস্কৃতি ও আদব-কায়দা এদেশে বিস্তার লাভ করে। সে

www.pathagar.com

ময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ফার্সি সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ হয়। ালিবর্দী খান ছিলেন নির্ভীক, ধর্মপরায়ণ ও নিরহংকার। নিজেকে একজন াল্লাহ্‌র সাধারণ বান্দা মনে করতেন। তাঁর শাসনব্যবস্থা ভালো থাকায় নিসপত্রের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে ছিল এবং প্রজাগণ মোটের ওপর বলা যায় খে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করত। আলিবর্দী খানের আম্মা, আব্বা ইশনা আশারি জহাবের অনুসারী ছিলেন। পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষায় আলিবর্দী খান তিন য়ের বিয়ে দেন বড় ভাইয়ের তিন ছেলের সঙ্গে। মনসুরাগঞ্জ প্রাসাদে নবাব ালিবর্দী খান স্ত্রী শরফুন্নিসা বেগমের সাথে বসবাস করতেন। এই প্রাসাদের ংলগ্ন ছিল চেহেল সুলতান। ১৭৪০ সালে নবাব হবার পর শত কর্ম ব্যস্ততার রও তাঁর শৈল্পিক মনটা দমে যায় না। তাইতো তিনি ইরানি স্থপতিকে ডেকে ারুকার্য খচিত সুরম্য প্রাসাদ তৈরির কথা বলেন। আর বলেন নয়নাভিরাম দ্যান তৈরির কথা। মন খুব খারাপ হলে ফার্সি ভাষায় লিখতে বসে যান রানের গল্পকথা।

াকৃতিক সৌন্দর্যের শহর ইরানের সিরাজ প্রদেশে নবাব আলিবর্দী খানের জন্ম, টি তার মাতৃভূমিও

কত সুন্দর এ মানুষটি, কত সুন্দর তাঁর মন। তিনিই ভারতের বীর নবাব ালিবর্দী খান। এক সময় নিজ মাতৃভূমি ইরান থেকে চলে এলেন ভারতবর্ষে। ালিবর্দী খান শুধু শাসকই ছিলেন না, সংস্কৃতিমনা হওয়ায় সর্বত্রই সৌন্দর্য খাঁজার চেষ্টা করেছেন। মূলত বাংলা বিহার উড়িষ্যায় গড়া উদ্যানগুলো ১৭৪০-১৭৫৬) সেসব সৌন্দর্যের একটা অংশ। শুধু তাই নয়, কঠিন-কোমলে াড়া আলিবর্দী মাঝে মাঝে আবেগে তাড়িত হয়ে পড়তেন। নিজের সন্তানদের াদর করতেন মনখুলে।

www.pathagar.com

আলিবর্দী খান মাতৃভূমি ইরান থেকে ভারতবর্ষে এনেছিলেন রকমারি ফল ফুলের চারা ও বীজ। আর বাংলার বুকে বাহারি বাগিচা করার মূল উৎস আদি জন্মস্থান পারস্য। আলিবর্দী খান তাঁর নবাবি আমলে দু'বাংলায় গড়ে তুলেছিলেন অসংখ্য প্রাসাদ বাগান ও বাগান বাড়ি। যেমন জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ ঘেরা বাগান, মোতিঝিল প্রাসাদের বাগান, হিরাঝিল প্রাসাদের দৃষ্টিনন্দন বাহারি ফুলের বাগান, মনসুরাগঞ্জ প্রাসাদ ও চাহেল সুলতান সংলগ্ন বাগান, মেহেরপুরের আমঝুপি কুঠির সংলগ্ন ফল ও ফুলের বাগান, খোশবাগ সংলগ্ন রকমারি ফুলের বাগান, নানকার জিঞ্জিরা প্যালেস ঘেরা নানা প্রজাতির গাছ আর লতা-পাতার বাহার ইত্যাদি। নবাব আলিবর্দী খান মূলত দু' বাংলায় মোগল উদ্যানের শুভ সূচনাকারী। তিনিই প্রথম লাল সবুজের বাংলায় বিচিত্র ধারার উদ্যান তৈরির কথা ভাবেন। তাঁর কথায় : "অমি যে সমস্ত উদ্যান ও প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছি তাহাতে সমতা রক্ষার কোনো ত্রুটি রাখি নাই। প্রত্যেক কোণে সুসামঞ্জস্য উদ্যান তরি করিয়াছি এবং তাহাতে নির্ভুল সৌষম্যে বাহারি দুর্লভ ইরানি গোলাপ ও রকমারি ফল ফুলের গাছ লাগাইয়াছি।" উল্লিখিত বাগানগুলোতে তিনি ইরানি ঐতিহ্যের ছোঁয়া লাগিয়েছেন- ঝরনার মর্মর, ছায়া ও বর্ণের প্রাচুর্য, প্রশস্ত জলাশয়ের ফোয়ারার পাশে কালো পাথরের মঞ্চ, পাথর বাঁধানো সরু জলাধারে ঝরে স্তরে লাফিয়ে পড়া জলের শব্দ, ফেনার শুভ্র উদ্ভাস, প্রাসাদ ঘেরা বাহারি গোলাপ ঝাড়, হাস্যোজ্জ্বল সূর্যমুখী ফুল, কার্পেটের মতো নরম ঘাসের চত্বর, মাঝখানে আমগাছ। এসবই দুরন্ত দুপুরে তাপ থাকে মুক্তির, বিবর্ণ শূন্যতা থেকে উজ্জ্বল আলোয় ফেরার প্রয়াস। সেইসব দিনগুলোয় এসব দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ ও বাগানে বসেই জমে উঠতো ইরানি বংশোদ্ভূত নবাব আলিবর্দী খান পরিবারের আলাপ-আলোচনা, সংগীত সন্ধ্যা ও ফার্সি কাব্যচর্চার রঙিন আসর।

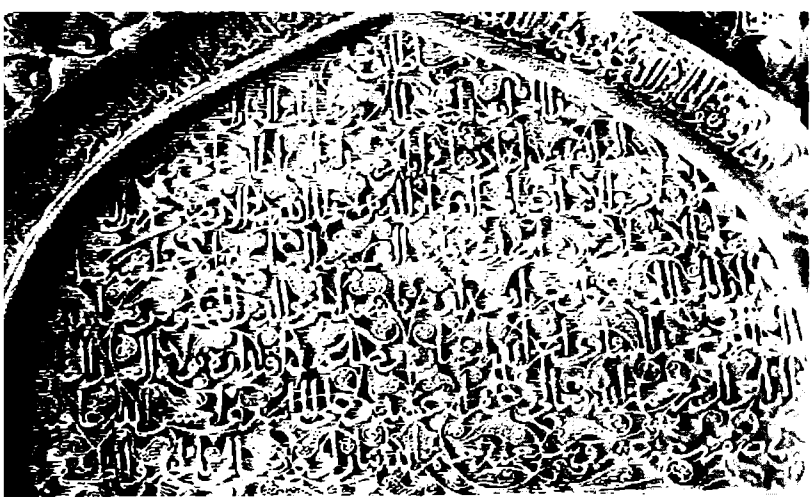

ইরানে এমন সব দুষ্টিনন্দন শিল্পকলার দেখা মেলে

www.pathagar.com

আলিবর্দী খান তাঁর নবাবি আমলে নির্মিত উদ্যান রচনায় পারস্য রীতিটাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তবুও তা অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয় হয়ে উঠেছিল। তিনি স্বভাবতই তাঁর প্রিয় ইরানি গাছপালা এদেশে রোপণ করেছেন। কিন্তু পারস্যের গোলাপ, নাসরিন, উয়াস, নার্গিস, পুর্তাগাল, কিভি, আঙ্গুর, মুজ, জায়তুন, তুঁত ফারহাংগি, কেসি, আনানাস, তালেবি, হোলু, নরাঞ্জী, পিচ ও আনারের সঙ্গে আগ্রহ ভরে গ্রহণ করেছেন এদেশীয় সুদৃশ্য শিউলি, বেলি, কদম, হাসনাহেনা চিরসবুজ আম এবং অন্যান্য রূপসী গাছপালা। শুধু নবাব আলিবর্দী নন, তাঁর অতি আদরের নাতি সিরাজউদ্দৌলাও কিশোর বয়সেই চির সবুজ উদ্যান সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

এ দৃশ্যনন্দন বাগিচার ছবিটি ইরানের হৃদয় থেকে পাওয়া

১৭৪৫ সালে নবাব আলিবর্দী খান কনিষ্ঠ কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলা এবং ইকরামউদ্দৌলার শাদীর বন্দোবস্ত করেন। বিবাহ উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ হয়। উৎসবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থান থেকে তো বটেই, রাজধানী দিল্লী-আগ্রাসহ সুদূর ইরান ইরাক থেকেও বহুসংখ্যক আত্মীয়-স্বজন, আমির-ওমরাহ ও আমত্যবর্গ যোগদান করেন। বিবাহ উৎসবের জৌলুস বাড়ানোর জন্য দিল্লী-আগ্রা-এলাহাবাদ থেকে আনা হলো বহুসংখ্যক নাচ গানের শিল্পী, ইরান থেকে এলেন নামি দামি শায়ের কবি, বিবাহ উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতে তারা বিনোদনের মাধ্যমে মাতিয়ে রাখলেন সকলকে। এই বিবাহ উৎসবে নবাব আলিবর্দী খান আত্মীয়-স্বজন, আমির-ওমরাহদের মধ্যে দুই হাজার কাশ্মীরি শাল এবং ৩ হাজার ইরানি সুগন্ধি উপহার হিসেবে বিতরণ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে নগদ অর্থ এবং পারস্যের রকমারি মূল্যবান উপঢৌকন দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

একবার সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে নবাব আলিবর্দী ভ্রমণে বের হলেন। গন্তব্য লাল সবুজের বাংলা। নানা নাতি মিলে দু'বাংলার গ্রাম-গঞ্জ বনাঞ্চল আর শহর ঘুরলেন। একটি জায়গায় সিরাজ এসে থেমে গেলেন, হয়ে গেলেন কিছুটা ভাবুক। নানা আলিবর্দী নাতিকে বললেন এতো চারিদিকে ধু-ধু তেপান্তরের মাঠ। এর মাঝে অযত্ন অবহেলায় শুধু কয়েকটি বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। সিরাজ মনস্থির করলেন এ বিশাল জমিতে তিনি দৃষ্টি নন্দন প্যালেস দাঁড় করাবেন। যেমন কথা তেমন কাজ। দ্রুত শুরু হয়ে গেল সিরাজের স্বপ্ন বাস্তবায়নের আয়োজন।

তাঁর সেই স্বপ্ন রঙে আঁকা প্রাসাদটির নাম রাখতে চেয়েছিলেন স্ত্রী লুৎফার নামে। লুৎফুন্নিসার বাধাতে সেটি সম্ভব হয়নি। লুৎফুন্নিসা বলেছিলেন- "আমি ঝিল হতে চাই না। আমি নির্জলা লুৎফা থাকতে চাই। আমি চাই না, তুমি আর আমি লুৎফা ঝিলের মাঝে বেঁচে থাকি। তার চেয়ে তুমি এমন একজন নবাব হও, যাতে তোমাকে কেউ কোনোদিন না ভুলে। তুমি যদি সেভাবে অমর হও, তাহলে আমিতো তোমার সঙ্গেই বেঁচে থাকবো প্রতি যুগে। আমি যে তোমার প্রাণের আধখানা।" তাই নির্মাণ শেষে প্রাসাদটির নাম রাখা হয়েছিল 'হিরাঝিল'। প্রাসাদের চারদিক সুরম্য প্রাচীর বেষ্টিত। চারটি বিশাল তোরণ, রঙিন মার্বেল পাথর, আলো ও জলের প্রাচুর্যই প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাগানের ভেতরের ক্ষেত্রসমূহেও চারটি ফটকে প্রান্তিক পথের সঙ্গে যুক্ত। প্রতিটি ক্ষেত্রে একই ধরনের ফুল কিংবা ফলের গাছ, কোথাও কোথাও মিশ্ররোপণ। উদ্যানের উল্লেখযোগ্য ফলের গাছ হচ্ছে- জায়তুন, আনার, বাদাম, আনজির, হলু, কেইসি, ফালসা, আলুচে, চেরি, নারকেল, খেজুর, আঙ্গুর, পেয়ারা, লেবু, আম, তরমুজ, আখরোট, আমলকি, তুঁত ফল, সফেদা, তেঁতুল, কামরাঙা, জামরুল, কিভি, মুজ, আনানাস ইত্যাদি। ফুলের গাছপালার মধ্যে পদ্ম, পলাশ, জবা, জুঁই, সেফরন, সূর্যমুখী, কদম, গাঁদা, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, বেলি, নাসরিন, নার্গিস, ইয়াস ও গোলাপ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণমুখী 'হিরাঝিল' প্রাসাদ উদ্যানে ছিল প্রশস্ত পথ, ত্রিপত্রিক পাথুরে ফলক, হলুদাভ পত্রসজ্জা এবং ফলের গাছ। বাগানের চারপাশ কোথাও কোথাও ঝরনা, জলের বিন্যাস ছিল মনোমুগ্ধকর। সেই সাথে ঝর্নার চারপাশে বিচিত্র রঙের বাহারি সব ফুলের গাছ। আর সবকিছুই ছিল প্রকৃতির সঙ্গে মেশানো। সর্বোপরি মানসিকভাবে ভালো থাকার মতো মনোরম পরিবেশ। হিরাঝিল প্রাসাদ ও বাগানটি বানানো হয় এখানে থাকার কথা চিন্তা করেই। নবাব আলিবর্দী খানের নির্দেশনায় হিরাঝিল প্রাসাদ ও বাগানটি নির্মাণের মূল ভূমিকায় ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা। তাঁকে সহযোগিতা করেছেন মীর মর্দান। তবে সবকিছুর পরামর্শদাতা ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা ও লুৎফুন্নিসা। অসংখ্য ইরানি কারিগরদের সু-নিপুণ বাহারি সোনা-রুপার কারুকার্য ও নিখুঁত কাচের কাজে সেজে ছিল, সিরাজের স্বপ্ন রঙে তৈরি হিরাঝিল প্রাসাদ। পারস্য ও দেশীয় লোকেরা দিন রাত এক করে দীর্ঘদিন ধরে এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন। প্রথমদিকে হিরাঝিল উদ্যানের পরিধি ছোট থাকলেও পরবর্তীকালে বড় করা হয়।

www.pathagar.com

কৃত্রিমভাবে তৈরি টিলার উপর লাগানো বছর জুড়ে ফোঁটা ফুলগুলো 'হিরাঝিল' বাগানকে বেশ মোহনীয় করে তুলেছিল। সারাবছর ফুলের সমারোহ ছিল বলেই অনেকে একে হিরাঝিল বসন্ত উদ্যান বলতেন, আলিবর্দী থেকে সিরাজউদ্দৌলার নবাবি আমলে হিরাঝিলে ছিল সারিবদ্ধ লতা গুল্মের বিন্যাস, জলধারা, ঝরনা, বিশাল তোরণ, খোলা বারান্দা, সুরম্য প্রাসাদ। এখানকার তরুচ্ছায়া সিরাজউদ্দৌলা, বেগম লুৎফুন্নিসা, কন্যা উম্মে জোহরা, জোহরার মামাতো বোন বদরুন্নিসা, চাচাতো ভাই মুরাদউদ্দৌলাসহ পরিবারের অন্যান্যদের পড়ন্ত বিকেলের আড্ডাকে বেশ জমিয়ে তুলতো। তাঁরা কান পেতে শুনতেন ঝরনার কোলাহল, বাতাসের কানাকানি, গাছের কথা, ফুলের মিষ্টি হাসি। আর মনভরে উপভোগ করতেন চারপাশের বিচিত্র পাখি আর ফুলদের বর্ণময় শোভা। হিরাঝিলে সিরাজউদ্দৌলা ও লুৎফুন্নিসা নিজ হাতে অনেক বৃক্ষ রোপণ করেন, ফুলের বাগান তৈরি করেন। ভোরে উঠেই নামাজ পড়া, কোরআন পাঠ করার নিয়মিত অভ্যাস ছিল সিরাজউদ্দৌলা ও লুৎফুন্নিসার। তাঁরা সৃষ্টিকর্তার সুন্দর সৃষ্টিকে ভালোবাসতেন, তাই নামাজ ও কোরআন পাঠ শেষে উন্মুক্ত পাখিদের খাবার দিতেন, ফুল ও ঔষধি গাছের পরিচর্যা করতেন নিজ হাতে, সেই সাথে প্রকৃতির সান্নিধ্য লাভে আনন্দ পেতেন। সেইসব দিনগুলোয় হিরাঝিলের পাশে সিরাজ ও লুৎফার প্রিয় মৃগয়া হরিণ, ময়ূর, টিয়াদের অবাধ বিচরণ ছিল আর নানা রকম বাহারি গাছের শোভা ছিল। ঝিলের স্বচ্ছ পানিতে ছোট্ট একখানা রঙিন বজরা ঢেউয়ের তালে তালে দুলতো। হিরাঝিলের মহলে তখন হাজারো বাতি শোভা পেত। কত বিচিত্র রঙের আলোয় ঝলমল করতো হিরাঝিল। একে একে জ্বলে উঠতো হিরাঝিলের আলো। ঝিলের জল সেই আলোয় চকচক করতো। সিরাজ এবং লুৎফার হৃদয়ের ভালোবাসায় গাঁথা অনেক কথা রয়ে গেছিলো এই হিরাঝিলে। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে ঐতিহ্যের ভালোবাসার যে সমন্বয় হিরাঝিলকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সিরাজ মুর্শিদাবাদে দৃষ্টিনন্দন কাঠের ইমামবাড়া ও ফুলের বাগান করেছিলেন। যা সিরাজের নির্মম মৃত্যুর পর ইংরেজ চক্রের হিংসার আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। সুদূর কারবালা ও মদিনা থেকে মাটি এনে সিরাজ নিজ সুন্দর পরিকল্পনায় তৈরি করেন মদিনা মসজিদ ও মসজিদের চারপাশ ঘিরে বাগিচা। নবাব সিরাজকে হত্যার পর মদিনা মসজিদের মূল্যবান রত্ন খচিত কারুকার্য ইংরেজ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। হিরাঝিলকে ঘিরে সিরাজ এবং লুৎফা গেঁথে ছিলেন সুন্দর কিছু স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন নিমেষেই চুরমার করে দিলো ইংরেজ এবং বাংলার বিশ্বাসঘাতকেরা। তাইতো হিরাঝিলের সুখ সিরাজ হত্যাকারীদের বেশিদিন সইলো না। হিরাঝিল আপন করে নিলো না বাংলার বেঈমান, বিশ্বাসঘাতকদের। আর বাকি সব স্থাপনা দীর্ঘকাল দু'বাংলার সরকারের উদাসীনতার কারণে, আজ সেসব ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত। (সাপ্তাহিক পলাশী- ১০.১০.২০১৩; দৈনিক সংগ্রাম- ২৪.২.২০১৫ইং, পৃষ্ঠা-২৫)

www.pathagar.com

অপরূপ ইরান

ইরান ভ্রমণে আমার সঙ্গী ছিলেন জনাব এস. জি. মোস্তফা, মুনমুন, ই
াসুম, সিগমা, ফাতমি, আলিশানসহ আরও অনেকে। আমাদের এ যাত্রায় ইমা
খোমেনি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রাজধানী তেহরানে প্রবেশের সময়
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার প্রথমেই বলেন 'সালাম'
ালাম জানিয়ে ফার্সি ভাষায় বলেন... "সুমা মেহমানে মাহাস্তিদ দার ইরান খো
মামদেদ" (আপনি আমাদের অতিথি, আপনাকে ইরানে সু-স্বাগতম)।

আমাদের ভ্রমণকালীন সময় ইরান সম্পর্কে জানতে পারি... সে দেশে
জনসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি ষাট লক্ষের কিছু বেশি। জনসংখ্যার ৮০% মুসলি
২০% অন্যান্য ধর্মাবলম্বি (অগ্নিপূজক জরেসট্রিয়ান, খ্রিস্টান, শান্তি প্রিয় ইহুদি।
৮০% মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভিতর ৫৫% জাফরী ফিকাহ্'র অনুসারী আর বাকি
২৫% সুন্নি মুসলমান।

ফুলের দেশ ইরান

ইরানে ইহুদিদের উপাসনালয়ে দেখতে পাওয়া যায় হযরত মূসা (আঃ) এব
তাঁর ভাই হারুন এর ছবি। ইরান সরকার সকলকে নিজ নিজ ধর্ম পালনে
ক্ষেত্রে কোনো বাধা প্রতিবন্ধকতা দেয় না এবং দেশের সকল জনগোষ্ঠীর ধর্মী
অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পালনের ক্ষেত্রে সরকার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন।

ইরানে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি অর্থাৎ ৫০%-এর অধিক মহিল
য়েছেন এবং ৫০% এর নিচে যা অর্ধেকের চেয়ে কিছু কম পুরুষ। এখানকা
নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি বিভিন্ন মিলকারখানা, অফিস, আদালত, রেস্তোরাঁ ও

www.pathagar.com

বিপনিবিতানগুলোতে কর্মরত রয়েছেন। ইসলামি রাষ্ট্র হওয়ার কারণে ইরানে নারীদের পর্দা করা বাধ্যতামূলক তবে এ পর্দার কারণে কোথাও তাদের কর্মক্ষেত্রে বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় না। ভিন্ন ধর্মী যারা ইরানে বসবাসরত রয়েছেন তাদেরকে শান্তিমূলক কোনো কাজেই বাধা সৃষ্টি করেন না ইরান কর্তৃপক্ষ। ইরানিদের মধ্যে অধিকাংশ হলেন আযারি, অতঃপর ফার্স, কুর্দি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য জাতি। বন্ধুরা ইরানে ধর্মীয় অনুভূতির কিছু উদাহরণ তুলে ধরতে চাই আপনাদের মাঝে... যেহেতু ইতিহাসের পাতায় মহানবী (স)-এর জন্মদিবসের তারিখ সম্পর্কে কয়েকটি মতো পাওয়া যায়। এমতগুলোকে নিয়ে ইসলামের বিভিন্ন মাজহাবের মাঝে যাতে ভেদাভেদ সৃষ্টি না হয়, তাই এ তারিখগুলোর সমন্বয়ে একটি সপ্তাহ গড়ে তোলেছে ইরান সরকার। যাকে বলা হয় ঐক্য সপ্তাহ যা ইসলামের রবিউল আওয়্যাল মাসের ১২ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত পালন করা হয় এবং এই সপ্তাহে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিল, সেমিনার, আলোচনা সভা এমনকি বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও এ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং এমন একটি সুযোগ গড়ে তোলা হয়েছে যাতে সকল নাগরিক আমাদের প্রিয় মহানবী সম্পর্কে বেশি বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারেন আর মহানবী (স)- এর সিরাহ্ থেকে নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারে।

বন্ধুরা... ওস্তান অর্থ প্রদেশ, ইরানের গিলান প্রদেশ আমাদের বাংলাদেশের মতো সবুজ ও পাহাড়ি বনাঞ্চল। গিলানে দর্শনীয় স্থানসমূহ : Talesh Hand Woven, Masouleh village ইত্যাদি। এগুলোর দেখা মিলবে Northern Iran -এ।

ইরানি জেলের হাতে সেদেশের একটি বিচিত্র মাছ

www.pathagar.com

ইরানের দারিয়ায়ে খাজার (ক্যাসফিয়ান সি) কে কেন্দ্র করে অনেক পর্যটক এখানে আসে। এটি আমাদের কক্সবাজারের মতো কিছুটা। এছাড়াও বেশকিছু সামুদ্রিক অঞ্চল রয়েছে। খালিজ ফার্স একটি উল্লেখযোগ্য সামুদ্রিক অঞ্চল, ইউনাইটেড আরব আমিরাতের সাথে এটি সংযুক্ত। সমুদ্র অঞ্চলগুলোতে বন্ধুপ্রিয় দলফিন' (ডলফিন)-এর দল নাচা নাচি করে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানায়।

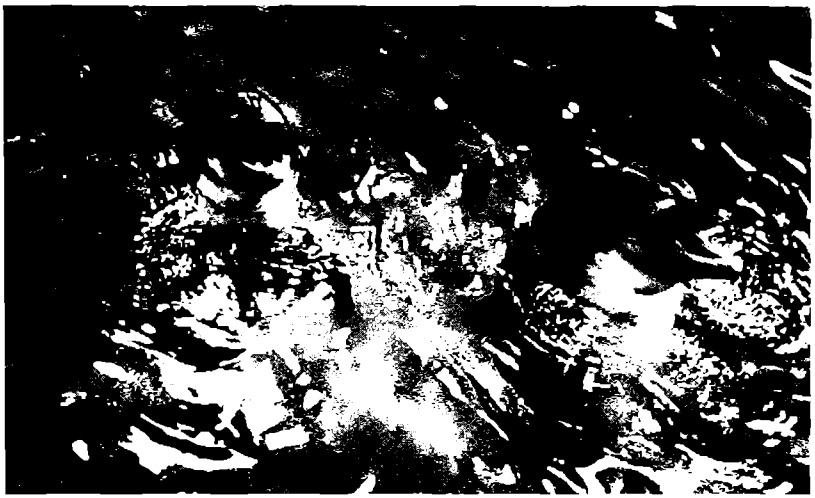

বন্ধুপ্রিয় ইরানি ডলফিন

ডলফিনগুলো তাদের বিশেষ মাথা আন্দোলন এবং পুচ্ছের সাহায্যে তরঙ্গায়িত সংকেত দিয়ে মাছের দলকে জেলেদের জাল বরাবর ধাওয়া করে। এখানে ডলফিন আর জেলে প্রাকৃতিক বৈরিতার জন্যই এ সখ্য গড়ে তুলেছে, কারণ তারা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। জানি না ডলফিনগুলোর চোখ কীভাবে জেলেদের চোখের ভাষা পড়ে নেয়। ইরানি জেলেদের মতে বন্ধুপ্রিয় ডলফিনের দল তাদের মাছ ধরায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করছে। তাই তারা ও তারা মাছের একটি অংশ ডলফিনগুলোর জন্য পানিতে রেখে যাচ্ছেন সানন্দে। ইরানি জেলেরা সাধারণত ডলফিন দলের সাথে মাছ ধরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তারা খুব ভালো করেই জানে ডলফিনগুলো প্রাকৃতিকভাবেই জেলেদের চেয়ে বেশি মাছের সন্ধান পায়। এবং অন্যান্য মাছ জেলেদের জালের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে। ডলফিনদের চোখে যেটি খুব সহজে ধরা পড়ে সেটি হলো দলবদ্ধ মাছ। তাই ইরানি জেলেরা এসব ডলফিনের সঙ্গে মাছ ধরে আসছেন দীর্ঘ অনেক বছর ধরে। তারা ডলফিন দলের নাম দিয়েছেন নিজেদের পছন্দ মতো। মা ডলফিন খুব ছোটবেলা থেকেই শিশু ডলফিনদের সামাজিকতা বিষয়ে শিক্ষা দেয়। মানুষের মতোই ডলফিনদের সমাজ রয়েছে বলেই তাদের আচার-

www.pathagar.com

আচরণে এ ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই জলচর প্রাণীটি নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত সাঁতারু। কোনো বোটের সঙ্গে খেলা করার সময় এরা সাঁতরায় আরও অনেক বেশি গতিতে।

কোনো কোনো সময় একেকটি দলে এক হাজার কিংবা তারও বেশি সংখ্যক ডলফিন থাকে। খোলা সাগরে বেশ কয়েক মাইল এলাকা নিয়ে ছড়িয়ে থাকে এই দল। প্রায়ই একসঙ্গে শিকারও করে তারা। একসঙ্গে শিকার করার কারণ এভাবে বড় একটা এলাকাজুড়ে মাছের ঝাঁক খুঁজে বের করতে আর শিকারের গতিবিধির দিকে লক্ষ রাখতে পারে তারা। মাঝেমধ্যে দলগতভাবে মাছের শিসের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে ডলফিনরা, পাশাপাশি একটি বড় দলের মধ্যে আলাদাভাবে প্রত্যেককে শনাক্ত করার জন্য নিজেদের পৃথক 'নাম'ও ব্যবহার করে এরা। গবেষকদের গবেষণায় লক্ষ করা যায়... এক ধরনের বিশেষ চড়া শব্দের ডাক আছে এদের, যা পরিচিত বৈশিষ্ট্যসূচক শিস নামে। তার প্রথম জন্মদিনের সময় নিজের এই বিশেষ শিস বা নাম পছন্দ করে ডলফিনরা এবং এটা বহাল থাকে অন্তত ১০ বছর।

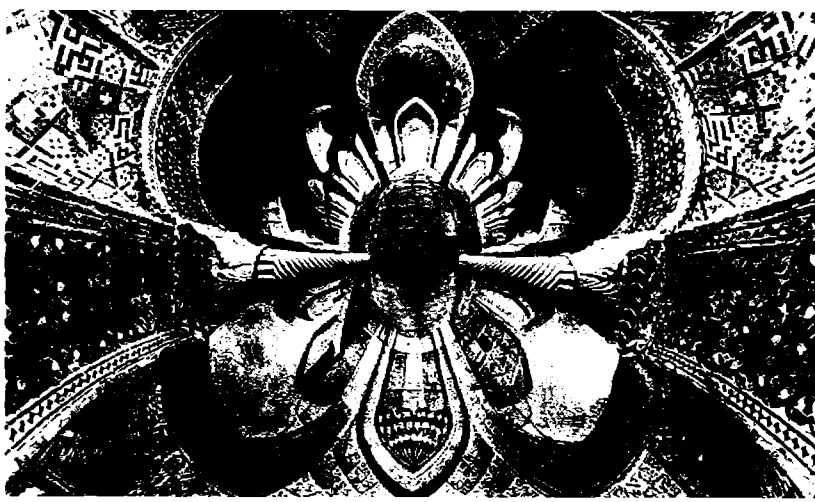

ইরানে সিরাজ প্রদেশের বিখ্যাত একটি মসজিদের নিদর্শন

নতুন একটি ডলফিন শিশুর জন্মের সময় ডলফিনদের পারস্পরিক সহায়তা খুব জরুরি। যখন কোনো মা ডলফিন শিশুর জন্ম দিতে প্রস্তুত হয়, তখন তাকে সাহায্য করার জন্য ধারে-কাছেই অবস্থান নেয় দ্বিতীয় একটি ডলফিন। বাচ্চাটি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমবারের মতো বাতাস নেওয়ার জন্য তাকে আস্তে আস্তে উপরের দিকে ঠেলে দেওয়ার কাজে মাকে সহায়তা করে এই 'খালা' ডলফিন। বন্ধুরা চলুন আরও নতুন নতুন গল্প কথায় ইরানকে আরও গভীরভাবে জেনে নিই...

www.pathagar.com

কবি বায়েজিদ বোস্তামি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেছিলেন, তাঁর মাজার ইরানের শাহরুদ শহরে অবস্থিত।

ইরানের খোমেইন একটি ছোট্ট শহর। যার নামকরণ করা হয়েছে তাঁদের জাতীয় নেতা ইমাম খোমেনির স্মরণে। তাঁর সম্পূর্ণ নাম সৈয়দ রুহুল্লায়ে মুস্তাফাভি। ইমাম খোমেনির পূর্বপুরুষরা ইন্ডিয়ান। তাইতো খোমেনির দাদা ইন্ডিয়ার কাশ্মির থেকে ইরানে আসেন। খোমেনি জন্মগ্রহণ করেন খোমেইন শহরে, তাঁর পিতাও একই শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

'সিরাজ' ইরানের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রদেশ। এই সেই সিরাজ প্রদেশ যেখানে বাংলা বিহার উড়িষ্যার বীর নবাব আলিবর্দী খান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 'সিরাজ' আলিবর্দী খানের মাতৃভূমি। পারস্যের এই প্রদেশ থেকে আলিবর্দী খানের ভারতবর্ষে আগমন ঘটে। ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে আনুমানিক ৭০০ কি. মি. দূরে অবস্থান করছে 'সিরাজ'। সিরাজ খুবই সুন্দর একটি প্রদেশ। সেখানকার গাছ-পালা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উদারমনে স্বাগতম জানাচ্ছে সকলকে। সিরাজের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আগত পর্যটকদের আকৃষ্ট করে এবং মনের গভীরে স্থান করে নেয়। আমাদের সাহিত্য পুস্তকে যে সকল কবিদের নাম শীর্ষে দেখতে পাই তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শেখ সাদি এবং মওলানা হাফিজ। তাঁদের স্মৃতিসৌধ ইরানের সিরাজ প্রদেশে রয়েছে। এছাড়াও সিরাজে বেশকিছু দর্শনীয় স্থান রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'পাসার গার্দ'।

ইরানের ইয়াজদ (YAZD) শহরে রয়েছে অগ্নিপূজকদের উপাসনালয়। যা বিশ্বের সর্বোচ্চ অগ্নিপূজকদের ধর্মস্থান। এখানে দীর্ঘ কয়েক হাজার বছর যাবৎ অগ্নিপূজকের মশাল জ্বলমান রয়েছে। সু-দীর্ঘ কয়েক হাজার বছর যাবৎ উক্ত মশাল ক্ষণিকের জন্য হলেও নিভতে দেয়া হয়নি। ইয়াজদ প্রদেশের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানসমূহ : Mirchakhmaq Gateway, Jamch Mosque.

ইরানের নাথানস (Natanz) -এ আছে Sheikh Abdol Samad Monastery. এ শহরে ইরানের পরমাণু চুল্লি স্থাপনার দেখা মেলে।

নাথানস এর কারকাস নামক পাহাড়ের পাশে কোল্লে-এ বাজ (বাজ চূড়া)। সেখানে শাহ বাদশা আব্বাসের একটি প্রিয় বাজপাখি ছিল, একদিন হঠাৎ করে সে পাখিটি বাদশার পানীয়কে বাদশার হাত থেকে ফেলে দেয়। এই কারণে বাদশা রাগান্বিত হয়ে সাথে সাথে পাখিটিকে মেরে ফেলেন। কিন্তু পরবর্তীতে বাদশা জানতে পারেন যে, সেই পানীয়তে সাপ তার বিষ ফেলেছিল। বাদশা তখন দুঃখী হন এবং সেই চূড়ায় প্রিয় বাজপাখিকে কবর দেন। ইরানে বসন্তকালীন সময়ে নাথানসের পর্বত চূড়াগুলোতে বরফের সাদা আবরণ দেখা যায়, তুষার পাতের কারণে। এ ছাড়া নাথানসে আরও দেখতে পাই ইমাম জায়নুল আবেদিনের নাতির মাজার, এ মাজার নাথানস-এর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে একটি বৃত্তাকারের মাঝে অবস্থিত।

www.pathagar.com

বন্ধুরা চলুন সংক্ষেপে জেনে নেই ইরানের অন্যান্য প্রদেশসমূহের দর্শণীয় স্থানসমূহ :- Kerman এ দেখা মেলবে hammame vakil এবং Bam Citadel (Arg) এগুলো South Iran -এ অবস্থিত। Tabriz-এ আছে EL Goli park এবং The Blue Mosque. Mazandaran-এ দেখতে পাবেন Kelardasht, sehezar valley এবং See ও Sangan Forest এসব কিছু North Iran -এ অবস্থিত। Fars -এ আছে Darius palace, persepolis, Maharloo lake, Arjan plain -এগুলো স্থান দেখতে পাবেন Sout Western Iran -এ, আর ইরানের Lorestarn -এ পর্যটকরা দেখতে পাবেন Bisheh water fall.

বন্ধুরা... ইরানি উপজাতিদের বলা হয় 'খানেবাদুস'। এরা বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করেন এবং অস্থায়ীভাবে বসবাস করেন। শীতকালে ইরানের যে অঞ্চলে শীত কম তারা নিজ ভেড়া ছাগল ও অস্থায়ী আসবাবপত্র নিয়ে সেখানে অবস্থান করেন, আবার যে মৌসুমে গরম বেশি সে সময় ওই সকল অঞ্চল ত্যাগ করে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সফর করে থাকেন।

আমাদের দেশের পালিত কিছু কিছু উৎসবের সাথে পারস্যের উৎসবের মিল রয়েছে। বিশেষ করে ইরানের সুন্নি মুসলমানদের পালিত উৎসবগুলোর মিল দেখা যায়। এই পালিত উৎসবগুলোতে ইরান কর্তৃপক্ষের কোনো প্রকার বাধা প্রতিবন্ধকতা নেই। ঠিক তেমনি ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বি মতাবাদের লোকেরা নিজ নিজ ধর্মকর্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করে, এক্ষেত্রে সেখানে স্বাধীনতা রয়েছে।

রাষ্ট্রীয়ভাবে ইরানকে পশ্চিমা অনেক দেশসমূহ অবরোধের মুখে ফেলে রেখেছে। তারা নিজ পণ্য, প্রযুক্তি ইত্যাদি ইরানের কাছে বিক্রয় করে না। যাতে ইরান উন্নতি না করতে পারে, কিন্তু আমি দেখছি যে ইরান সেইসব চিহ্নিত পশ্চিমা দেশসমূহের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে তারা নিজেরাই প্রতিনিয়ত উন্নতির পথে এগিয়ে চলছে। যেমন : তারা নিজ খনিজ সম্পদকে উত্তোলন করতে যে সকল বড় বড় যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তা তারা নিজেরাই নিজ জ্ঞান গরিমার মাধ্যমে উন্নত থেকে উন্নততর প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সক্ষম হচ্ছে। এমন নয় যে, পশ্চিমা ও প্রতিবেশী সকল রাষ্ট্রই ইরানকে অবরোধের মুখে ফেলেছে। ইরানের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে তাদের সুখে-দুঃখে পাশে রয়েছে ভেনিজুয়েলা, কিউবা, রাশিয়া, চীন, ইরাক, ইন্ডিয়া, জার্মানি, বাংলাদেশ, লেবানন, সিরিয়া, বাহরাইন, কোরিয়া, ইউক্রেন, আজারবাইজান, জাপানসহ আরও অনেক রাষ্ট্র।

www.pathagar.com

সৌন্দর্যের দেশে

পারস্যে পা রেখেই মন বলে উঠে... "শুকরানল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ।"

বন্ধুরা ... 'সালাম'। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের দেশ ইরান ভ্রমণের গল্পকথায় আপনাদের স্বাগতম। পারস্যের দেশ ইরান। চারপাশে উঁচু নিচু পাহাড়, আর এই পাহাড়ি এলাকা ঘিরেই কোথাও গড়ে উঠেছে আধুনিক শহরাঞ্চল, কোথাওবা গ্রামাঞ্চল, কোথাও শিল্পাঞ্চল। আর দেশটির বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়েই সবুজে ঘেরা বনাঞ্চল। শহর থেকে গ্রাম যে দিকেই তাকাই দেখা মেলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎব্যবস্থা, শক্তিশালী ল্যান্ড ফোন ও মোবাইল নেটওয়ার্ক, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর টহল। দিন রাত ২৪ ঘণ্টা সপ্তাহে ৭ দিন মাসে ৩০ দিন এই সংস্থাগুলো দিনের পর দিন জনগণকে উত্তম সেবা দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। বন্ধুরা ... সত্যি! এ এক অপূর্ব সৌন্দর্যের দেশ। কোথাও সবুজে ঘেরা, আবার কোথাও উঁচু নিচু পাহাড়, তার মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে পাহাড়ি নদী। মাঝে মাঝে ঝরনার চপলা পায়ে ছুটে চলা নূপুরের ছন্দ। যেদিকে তাকাই শুধু সবুজ আর সবুজ। মনটা ছুঁয়ে যায় ইরানের সবুজ প্রকৃতির সান্নিধ্যে। বুক ভরে নিশ্বাস নেওয়া যায়, বুক ভরা স্বপ্নরঙে আঁকা জীবনকে রংধনু ৭ রঙে সাজানো যায়, সুস্থ ও দীর্ঘজীবনের জন্য ১০০ ভাগ ভেজালমুক্ত টাটকা খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যায়, ৯৫ ভাগ দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজব্যবস্থায় সুখী জীবনযাপন করা যায়, সরকার জনগণের সুখে-দুঃখে সর্বদা পাশে থাকায়... এমন বন্ধু কে না চাবে, জনগণ সরকারকে সবরকম সহযোগিতা করতে পিছু পা হয় না। এমন বিশ্বস্ত বুন্ধত্বের বন্ধন পৃথিবীর আর কোনো দেশে আছে কিনা তা আমার জানা নেই। ইরান এমনি একটি দেশ, যেই দেশের নিশ্বাসে নেই ধুলাবালি, নেই সিসা, নেই কোনো কালো ধোঁয়ার বিষ, আর নেই খাদ্যে ভেজাল মিশ্রিত বিষ, নেই মানবমনে ভেজাল দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, মাস্তানি, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণের মতো ঘৃণিত পরিকল্পনার স্থান। দেশটির সরকার এবং জনগণ একে অন্যের বন্ধু। তাইতো ভেজালমুক্ত সুন্দর হৃদয়ের ইরানি বন্ধুদের মাঝে আর ইরানের নির্মল বাতাসে তাজা হয়ে ওঠে আমাদের দেহমন।

পারস্যের দেশ ইরান ভ্রমণে তেহরান, কোম, মাশহাদ, ইস্পাহান, কাশানসহ আরও কিছু শহর ও গ্রামাঞ্চল দেখার সৌভাগ্য হয়। পরিচিত হতে পেরেছি উক্ত দেশের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয়বস্তুর সঙ্গে। ইরানি কিশোর তরুণরা যুগ ও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পছন্দ করেন, তবে তারা উশৃঙ্খল নয়।

তারা সময়মতো নামাজ পড়া আর ইসলাম ধর্মীয় উৎসবাদি যেমনটি পালন করে তেমনটি তারা পোশাক পরিচ্ছেদ হেয়ার স্টাইলের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ফ্যাশন সচেতন। ইরানি তরুণরা দেখতে সুন্দর, শারীরিক গঠনে বেশ লম্বা এবং

www.pathagar.com

আকর্ষণীয় স্বাস্থ্য ও চেহারার অধিকারী। তারা নিজেদের আরও আকর্ষণীয় রাখতে সান গ্লাস, মুন গ্লাস, শার্ট, প্যান্ট, হেডক্যাপ, সুজ ও হেয়ার স্টাইল সিলেকশনে আধুনিক জীবনযাপনের সাথে তাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের তাল মিলিয়ে সুন্দর রুচির পরিচয় দেয়। পশ্চিমা ডিজুইস কালচারের বাতাস ইরানি তরুণদের গায়েও লেগেছে তাইতো তারা হাতে ব্যান্ড এবং গলায় কারুকার্য খচিত ফ্যাশনেবল রকমারি চেইন ও লকেট পরতে অভ্যস্ত, তবে তাদের ফ্যাশনের সবকিছুতেই কোথাও না কোথাও পারস্যের ছোঁয়া পাওয়া যায়। ইরানি তরুণরা বন্ধুপ্রিয়, জমিয়ে আড্ডা দিতে পছন্দ করে, তবে সেটি যেখানে সেখানে নয়।

ইরানি মেষ পালক

সম্পূর্ণ ইরান জুড়ে আছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সবুজ ছায়ার বিভিন্ন পার্ক। সেখানে শুয়ে বসে সবুজ প্রকৃতি আর লতাপাতা ঘেরা ফুলেল পরিবেশে পাখিদের কলকাকলিতে বন্ধুত্বের আনন্দে মেতে ওঠে পারস্যের কিশোর-তরুণ সমাজ। পারস্যের তারুণ্যে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে, দেশাত্মবোধ। দেশপ্রেম থেকেই তারা সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে উন্নত থেকে উন্নততর সেবা দিয়ে আসছে। ইরানে এমন কিছু জননিরাপত্তার সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আছে, যে প্রতিষ্ঠানে সে দেশের যেকোনো ব্যক্তি বিনা পারিশ্রমিকে দেশ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। দেখে মনে হলো মানবসেবাই সে দেশের ৯৫ ভাগ জনসংখ্যার ধর্ম।

বন্ধুরা ... ইরানে বসন্ত শুরু হয় মার্চ মাসের ২১ তারিখ থেকে, আর বসন্তের সমাপ্তি ঘটে জুনের তৃতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে। তারপর পরবর্তী ৩ মাস গরম

www.pathagar.com

কাল। সেপ্টম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের শেষের কয়েক দিন থেকে ধীরে ধীরে শীতে আগমন ঘটে সমগ্র ইরান জুড়ে। প্রচণ্ড শীতের দিনগুলোয় সেদেশের অধিকাং এলাকায় প্রচুর তুষারপাত হয়। যারদ্বরুণ ইরান সেজে যায় সাদা বরফের দেশে আমরা ভ্রমণ সঙ্গীরা ইরানে প্রবেশ করি বসন্তে, তাই তখন বাহারি ফুলে ফুলে সেজে ছিল সমগ্র ইরান। রাস্তার যেদিকে তাকাই শুধু ফুল আর ফুল, সবুজে ছেয়ে ছিল দেশটি। এরই মাঝে পথে পথে দেখা মেলে পশু-পাখি ও ফুলে বাহারি কারুকার্যের ভাস্কর্য, কৃত্রিম পাহাড়ি ঝর্ণা, পানির ফোয়ারা। সবচেয়ে অবাক করা একটি জিনিস চোখে পড়ে বিশাল পাহাড়ের কিছু কিছু অং সুপরিকল্পিতভাবে কেটে স্টেপ বাই স্টেপ ৭/৮ তলা পর্যন্ত, প্রতি তলায় তিন/চা ঢালাবিশিষ্ট পাকা দালান করা হয়। আবার এসব সু উচ্চ পাহাড়ের কিছু অং সুপরিকল্পিতভাবে কেটে সেখানে গড়ে উঠেছে... আমাদের দেশের নন্দন ফ্যান্টাসি কিংডমের মতো বিনোদন পার্ক।

বন্ধুত্বের বন্ধনে ইরানি তারুণ্য

ইরান ভ্রমণে লক্ষ করি পথে পথে বাহারি সব ফুল ফোঁটা ফুলের গাছ ফলের গাছে পাকা পাকা ফল ঝুলছে। বিশেষ করে ইরানের বিভিন্ন প্রদেশে তুঁ ফলের গাছ দেখা মেলে, গাছটির সবুজ পাতার কোণে কোণে টক মিষ্টি সুস্বা ছোট ছোট তুঁত ফল পাকা অবস্থায় থাকলেও সেই ফলটির স্বাদ নিতে শুধু বিচি ব পাখিদের আগমন দেখা যায়। সে দেশের মানুষ কারণে অকারণে কখনো রকারি বা অন্যের গাছে হাত দিয়ে ফুল বা ফল ভাঙে না। পশুপাখিকে বিরক্ত রে না। রাস্তা-ঘাট ও পার্কসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে ইরানিরা যথেষ্ট সচেতন, তা ত্রতত্র ময়লা আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফেলা

www.pathagar.com

অভ্যাস গড়ে তুলেছে। তাইতো তাদের শহর থেকে গ্রাম যেদিকেই তাকাই দেশটিকে শিল্পীর আঁকা চিত্রের মতো অতিসুন্দর মনে হলো। ইরানে সড়ক দুর্ঘটনা কম হয়। সরকার দুর্ঘটনাকারী ব্যক্তিকে আইনের আওতায় এনে বিভিন্ন শাস্তিসহ আমাদের দেশিও টাকায় ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করে থাকেন।এই ভয়ে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে ইরানিরা বেশ যত্নশীল। দেশটিতে লক্ষ করা যায় দ্রুতগামী মেট্রো ট্রেনসহ, দূরবর্তী প্রদেশসমূহে যাতায়াতের জন্য অতি উন্নতমানের এসি ট্রেন ব্যবস্থা। রেলস্টেশনগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সবুজে ঘেরা। গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে ৩/৪ তলাবিশিষ্ট ফ্লাইওভার। শহর, গ্রাম ও দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে মাইলকে মাইল স্ট্রিট লাইট, বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে-পুলিশের টহল। অভ্যন্তরীণ নিরবচ্ছিন্ন মোবাইল নেটওয়ার্ক। সকাল দিন রাতে যেকোনো সময় যেকোনো দিনে যেকোনো অবস্থান থেকে ভাড়ায় চলা ট্যাক্সি কর্তৃপক্ষকে ফোন দিলে আপনার দ্বারে এসে আপনার চাহিদা মোতাবেক গন্তব্যে নিয়ে যেতে বাধ্য থাকে তারা। ভাড়া করা ট্যাক্সি বা মাইক্রোর বিদেশি যাত্রী হিসেবে কোনো অতিরিক্ত অর্থ ছাড়াই সে দেশের সরকার কর্তৃক বিমাকৃত ছিলাম আমরা বাংলাদেশি ভ্রমণ সঙ্গীরা।

বন্ধুরা দেখুন দেখুন... হুর-হুর-হুর র-র! এমনটি কিন্তু আমি করছি না! ইরানের ছোট শহর ও গ্রামাঞ্চলগুলোতে এমনটি করতে দেখা মেলে মেষপালকদের। মেষপালক বালকের হাতে থাকে ১টি ছড়ি, মাথায় থাকে টুপি, গায়ে পরনে থাকে আলখেল্লা পোশাক ও পাজামা। হাতের ছড়ি নাড়িয়ে মেষপালক যুবক শ'খানিক দুম্বা, ভেড়া, রামছাগলকে নিজ গন্তব্য স্থলে নিয়ে যায়। নদীর কাছের কোনো পাহাড়ি জঙ্গলে মনের আনন্দে পশুগুলো নিজ খাদ্য খেতে ব্যস্ত থাকে আর মেষপালক যুবক ছিপ দিয়ে নদীর তাজা মাছ ধরার আনন্দে মাতোয়ারা। গন্তব্য থেকে ফিরতি পথে দেখা যায় মেষপালক যুবক তাঁর পালিত ভেড়া ও ছাগল নিয়ে তাদের ঐতিহ্যবাহী মাটির ঘরগুলোতে অবস্থান করছে। ইরানিরা মাটির ঘর তৈরি ক্ষেত্রে লাল মাটির ব্যবহার করে থাকে সর্বাধিক, দেখতে খুবই সুন্দর। ইরানের মাটির বাড়িগুলো পর্যটকদের জন্য দর্শনীয় একটি স্থান।

পারস্যের তরুণরা ফটোগ্রাফি, গ্রাফিক্স, মাল্টিমিডিয়ার কাজে বেশ দক্ষ, তাদের তোলা ফটো এবং গ্রাফিক্সের কাজ দেখলে যে কেউ বলবে... তারা পাশ্চাত্যের তরুণদের তুলনায় রুচিবোধ ও সুনিপুণ কর্ম দক্ষতায় কোনো অংশে কম নয়। ইরানি চলচ্চিত্র বিশ্বজুড়ে সম্মান বয়ে আনছে, তাদের চলচ্চিত্র দেখে মনে হলো... অভিনয় শিল্পী, পরিচালকসহ একটি ফিল্মের সকল কলা কুশলীবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রে রঙধনুর ৭ রঙের ছোঁয়া লেগেছে, তাইতো দেশটির ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে চলছে তাঁদের উন্নত প্রযুক্তির চলচ্চিত্র। সে দেশের তরুণরা নিজ আচার সংস্কৃতিতে তৈরি চলচ্চিত্র এবং

www.pathagar.com

ন্যান্য অনুষ্ঠান দেখার পাশাপাশি আজকের তারুণ্যের ছোঁয়ায় গড়া ইন্ডিয়ান ইন্দি ফিল্ম দেখতে পছন্দ করে, তাই সে দেশের সরকার তাদের টিভি ্যানেলগুলোতে ফার্সি ভাষায় ডাব করে নতুন দিনের হিন্দি ফিল্মগুলো প্রচার করে াকেন। মাশাহাদে হোটেলে অবস্থানকালে তাদের সরকারি একটি চ্যানেলে চারিত হচ্ছিল শাহেদ কাপুর ও বিদ্যাবালান অভিনীত 'কিশমাত কানেকশান' ফল্মটি, আর তেহরানে এয়ারপোর্টে অবস্থানকালে দেখতে পেলাম, তাদের একটি টিভি চ্যানেলে অন এয়ার প্রচারিত হচ্ছে অভিষেক বচ্চনের 'গেম' ফল্মটি। বোঝা গেল সাংস্কৃতিক অঙ্গনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার সাথে ইরানের াস্কৃত্বের বন্ধন অটুট।

কোমে অবস্থিত ইরানি বাসস্থানে আলিয়া এবং সুক্যাইনা

সমগ্র ইরান পবিত্র রওজার দেশ, মসজিদের দেশ। এই পবিত্র স্থানসমূহে দেশ বিদেশের বহু ধর্মপ্রাণ মানুষের সমাগম ঘটে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা নিজ মানাত পূরণের আশায় রওজাসমূহে সমবেত হন, নামাজ পড়েন, বিশ্রাম নেন। রওজা (বাংলায় যাকে মাজার বলে)সমূহ অত্যন্ত দৃষ্টি নন্দন। রওজার ভেতর ও বাইরে বাহারি ফুলের গাছ, পানির ফোয়ারা, সন্ধ্যা থেকে রাতে পর্যন্ত রওজাসমূহ রঙিন আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। ফোয়ারার পানি রংবেরঙের খেলায় ঝিকিমিকি আলো ছড়াতে থাকে। এরই মাঝে যে যার মতো প্রার্থনা শেষে পরিবার-পরিজন বন্ধুদের সাথে উপভোগ করে ফুলের সৌরভ, ফোয়ারার পানি আর আলো আঁধারের রঙিন খেলা।

www.pathagar.com

পৃথিবীর স্বর্গ ইস্পাহান

ইরানের চারপাশ অসাধারণ আর অতুলনীয়। আর ইস্পাহান! তার তুল সে নিজেই। তাইতো দেশ-বিদেশের বিদ্বান ব্যক্তির গবেষণায় এবং বিভি আন্তর্জাতিক টিভি চ্যানেলের গবেষণাধর্মী অনুষ্ঠানগুলোতে বলা হয়ে থাকে. সমগ্র পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি সৌন্দর্য ইরানের ইস্পাহানে আছে। বিশ্বব্যাপ্ত ভ্রমণের সৌভাগ্য সবার ক্ষেত্রে হয়ে উঠে না, যেমনটি আমার ক্ষেত্রেও হ উঠেনি। ডিসকভারি চ্যানেল বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ইরানের ইস্পাহান ও তা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে যেসব অনুষ্ঠান মালা তাদের চ্যানেলে প্রচার করেছে, ত দেখেই ইরানের ইস্পাহান ঘুরে দেখার শখ বহু আগ থেকে আমার মনে জ নেয়। তাই বহুদিনের মনের জন্মানো ইচ্ছাপূরণে ইস্পাহান ভ্রমণে এলাম ইস্পাহানে প্রবেশ করেই মনে হলো সত্যি। এ তো ইরানের এক স্বর্গ রাজ্য চারপাশ সবুজ আর সবুজ। গাছে গাছে রকমারি বাহারি ফুলের মেলা এ রাজ্যে দেখা মেলে। 'বুয়ে মাদারান' নামক দৃষ্টি নন্দন ছোট হলুদ ফুল সে অঞ্চলে পাহাড়ি এলাকাগুলো দেখা যায়। বিশেষ করে মোরচাখোত পাহাড়ি এলাকায় ফুল দেখা যায় বেশি। পূর্বের দিনগুলোতে রাজা বাদশার আমলে ইস্পাহানে দখল করতে আসা বাহিনীরা প্রথমে মোরচাখোতকে নিজের দখলে নিত, কার এখানে ছিল সেনানিবাস।

ইস্পাহানের একটি দৃষ্টিনন্দন পার্কে বন্ধুর অপেক্ষায় ইরানি তরুণ

www.pathagar.com

ইরানিরা ঘোরাফেরা করতে বেশ পছন্দ করেন। তাই দেশটির সরকারের
ক্ষ থেকে ইস্পাহানসহ অন্যান্য শহরে দৃষ্টি নন্দন অনেক পার্কের ব্যবস্থ
য়েছে, যেখানে বিভিন্ন সময়ে পর্যটক এবং ইরানি পরিবার-পরিজন
খালাবাতাসে সবুজের সান্নিধ্যে বেড়াতে আসেন।

পারস্য একটি মরুভূমির দেশ তাই এখানে গাছ গাছালি খুব সহজে জন্মায়
া। এজন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে কৃত্রিম বনাঞ্চল সৃষ্টি করেছে, যাতে
াবহাওয়ায় আর্দ্রতা সৃষ্টি হয় এবং মানুষ এই বনাঞ্চলে গিয়ে নিজের অবসর
াময় গল্প আড্ডায় বা শুয়ে বসে আপনজন বা প্রিয়জনদের সাথে অতিবাহিত
রতে পারে। বন্ধুরা... সমগ্র ইস্পাহান দেখে মনে হলো সবুজে ঘেরা প্রাকৃতিব
সৌন্দর্যের শহর। এই সবুজ শহরে বাহারি সব 'গোল' (ফুল) এর দেখা মেলে
াসরিন, নার্গিস, গোলাপ, ইয়াস, 'গোল'গুলো তাদের বাহারি রূপ দেখার জন্য
াগতম জানাচ্ছিল অতিথিদের।

ইস্পাহানের দৃষ্টিনন্দন এ ময়ূরটি তার বাসস্থানে সাথীর অপেক্ষায়

ইস্পাহানের সবুজ ছায়ার ডালে ডালে লুকিয়ে গুঞ্জন করছিল 'ফারান্দে' পাখি)-র দল। এই গুঞ্জনের আসর মাতিয়ে রেখেছিল থুথি (টিয়া), গোনজেসক চড়ুই), কাফতার (কবুতর), পারাস্তু, কালাগ (কাক)সহ অন্যান্য ফারান্দেরা। রানি কাক দেখতে বেশ আকর্ষণীয় এবং আমাদের দেশের কাকের মতো কারণে কা-কা-কা করে না। পাখিদের আড্ডায় 'সাঞ্জাক্' (কাঠবিড়ালি) এর ল গাছের পাকা সু-স্বাদু ফল খেতে ব্যস্ত ছিল। ইস্পাহান শহরের প্রবেশদ্বার ড়ক চারভাগ আব্বাসির চারি পাশ সবুজ গাছপালায় ছেঁয়েছিল। চোখে পড়া ল্লেখযোগ্য বৃক্ষসমূহ : তুঁত, ভ্যান, সানোভার, নারভ্যান, বাগ-এ আঙুর,

www.pathagar.com

ফান্দুক (ফল), কাজ (অনেকটা ঝাউগাছের মতো), আনজির গাছ (ডুমুর, তে ইরানে ডুমুর ফল পাকলে হলুদ লালচের সমন্বয়ে মিশ্র রং ধারণ করে এব তখনই খাওয়া যায়। খেতে সু-স্বাদু এবং মিষ্টি) ইত্যাদি। ইস্পাহানের নাজবা গ্রাম সবুজে ঘেরা, ছোট ছোট দৃষ্টি নন্দন বাড়িঘর, পাশেই জায়েন রুদ নদী স্রোত, নদীর স্রোতের পানির উপর ছোট বড় পাথরের স্তূপ, বড় পাথরের ওপ বসে নদীর স্রোতের পানিতে পা ভাসিয়ে মনটা সতেজ হয়ে উঠল। নদীর পাশে ঘন জঙ্গল, জঙ্গলের পাশেই বিশাল আকারের উঁচু নিচু পাহাড়-পর্বত। নাজবা গ্রামে আরও দেখা মেলে আল বালুর (চেরি) ক্ষেত, সিভজামিনির (আলু) ক্ষেত এই গ্রামেই অবস্থান করছে ইস্পাহান বার্ডস গার্ডেন, বার্ডস গার্ডেনের ভিতর ন গেলে জীবনটা বুঝি বৃথাই হয়ে যেত। এত সব দৃষ্টি নন্দন পাখি এবং পাখি আবাসভূমি ইতোপূর্বে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। পাখিগুলোর অধিকাংশই (৮০% উন্মুক্ত অবস্থায় দর্শনার্থীর পায়ের কাছ দিয়ে হেঁটে গেয়ে আপন মনে ঘুে বেড়াচ্ছে। দর্শনার্থীদের কেউ তাদের বিরক্ত করা বা ধরার চেষ্টা না করায় উন্মুং পাখিগুলো অতিথি মানুষজনদের আপন করে নেয়। তাই দর্শনার্থী হিসেবে আমা পায়ের কাছে এসে দু'প্রজাতির ময়ূর পেখম খুলে তার নৃত্য পরিবেশন করলো নানা প্রজাতির রাজহাঁস, পাতিহাঁস, কবুতর, মোরগ, মুরগি, উটপাখি, বক ধনেশ, Victoria crowned pigeon, Grey crowned crane, Lapwing Little Egret, Black headed Gull, Gallus Domesticus, Golde pheasantসহ আরও নাম না জানা রঙবেরঙের পাখিরা নিজ নিজ আঙিনা আমন্ত্রিত দর্শনার্থী অতিথিদের সামনে হাসি খেলার বিনোদনে মাতিয়ে রেখেছিল

ইস্পাহানের জায়েনরুদ নদীর পাশ ঘেঁষে সৌন্দর্য উপভোগ করছেন লেখক

www.pathagar.com

"সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসা পেতে হলে, তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসতে হবে"- এই কথায় ইরানিরা পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন। তাইতো তারা পশু, পাখিকে বিরক্ত করা বা সবুজ গাছ পালার ডাল ও পাতা ভাঙা বা ফুল ফোঁটা ফুল গাছের ক্ষতিসাধন করে অকারণে ফুল ভাঙতে অভ্যস্ত নয় এবং সমগ্র ইরানের রওজা এবং তার আশপাশের এলাকা, বিমানবন্দরসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে শীতল ফিলটার পানি সকলের জন্য উন্মুক্ত। যা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও পানি পানের জন্য একবার ব্যবহারযোগ্য নতুন গ্লাসও বিনামূল্যে দিয়ে থাকেন ইরান কর্তৃপক্ষ। দেখে মনে হলো আল্লাহর সৃষ্টির সেবা ও সম্মান করাই তাদের ধর্ম।

এমন সব দৃষ্টিনন্দন গোলাপের বাহার শুধুমাত্র ইস্পাহানেই দেখা মেলে

বন্ধুরা চলুন... কিছু ইরানি ভাষার সাথে পরিচিত হই : তুমান (টাকা), সিব আপেল), নরাঞ্জি (কমলা), পুর্তাগাল (মালটা), মুজ (কলা), তুত ফারহাংগি ট্রবারি, আলু চে (কাঁচা ও সবুজ আলু বোখারা, টক ফল), হলু (অনেকটা আপেলের মতো দেখতে তবে আপেল নয়। খেতে সুস্বাদু টক মিষ্টি), কেইসি হলুদ রঙের এই ফল পাকলে খাওয়া যায়, স্বাদে মিষ্টি), তুঁত, আনানাস (আমরা যাকে আনারস বলি), তালেবি, জায়তুন (জলপাই), কিভি। ফলকে ইরানিরা মিভে' বলে। এবার পশুপাখিকে তারা কি নামে ডাকে তা জেনে নি... হেইওয়ান পশু), গাভ (গরু), গুস ফান্দ (ভেড়া), শোথর (উট), খার (গাধা), লাক লাক বগ), থাউস (ময়ূর)। ইরানিরা বন্ধু বা প্রিয়জনকে বলে 'জান' এবং 'জানাম'। কোনো কাজ ok হয়ে গেলে তারা বলে থাকে 'বালে বালে'। ইরানিরা রুটি খেতে অভ্যস্ত তাই সেদেশের ক্ষেতখামারগুলোতে গমের ক্ষেতের দেখা মেলে।

www.pathagar.com

'মাজরায়ে গানদুম'-এই নামে গমের ক্ষেত তাদের কাছে অতি পরিচিত। ইরানিরা নিজ নিজ বৃক্ষের ফল একা একা খেতে অভ্যস্ত নয়, বৃক্ষের ৭০% ফলমূল পশু-পাখিদের খাবার জন্য ছেড়ে দেন। তবে বেশিরভাগ ইরানি নিজ আঙিনায় লাগানো বৃক্ষের সম্পূর্ণ ফল (অর্থাৎ ১০০%) টাই পশুপাখিদের খাওয়ার জন্য উন্মুক্ত করে রাখেন। তারা মনে করেন গাছের এই তাজা ফলমূলে পশুপাখিদের অধিকারটাই আগে। তাই তারা শখের গাছ গাছলার ফল না ভেঙে, বাজার থেকে ফলমূল কিনে খান এবং এভাবেই আল্লাহ তাআলার প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শন করে থাকেন।

ইস্পাহানের দর্শনীয় স্থান 'পুল-এ-খাজু'- খুবই সুন্দর একটি স্থান, উক্ত স্থানে চোখে পড়ে অচেনা কিছু বৃক্ষ, আলাপ চারিতায় তাদের কাছে জানতে পারি বৃক্ষগুলোর নাম : 'বিদ এ মাজনুন বৃক্ষ', ফুলের গাছে হলদে ছোট ছোট 'সুমবুল' ফুল ফুটে ছিল। পাশ দিয়েই প্রবাহিত মান জায়েন রুদ নদীর স্রোত।

নদীর স্রোতে পা ভাসিয়ে গল্প আড্ডায় মেতে ছিল ইস্পাহানের কিশোর তরুণরা, পা ভাসিয়ে দেখলাম নদীর পানি অনেক স্বচ্ছ এবং শীতল। ইস্পাহানের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানসমূহ : গুলহা গার্ডেন, Vank church, সিওসে পুল (এখানে কিশোর তরুণরা আনন্দ উল্লাসে বটিং করছিল), 33 পুল, khwaju Bridge, ন্যাচরাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম (তাঁদের ইতিহাস ঐতিহ্যের অনেক বিষয়বস্তু উক্ত মিউজিয়ামে দেখা মেলে), Chehel sutun প্যালেসও মিউজিয়াম, বাগ-এ চাহেল সোতুন (দৃষ্টি নন্দন সব বাহারি ফুল, সবুজ বৃক্ষ আর নরম ঘাসের স্পর্শ, এর মাঝেই টাইলস বসানো শান্ত পুকুরের জলে পা ভাসিয়ে জল ছিটিয়ে মজা করার স্মৃতি মনে পড়ে), আলি কাপু প্যালেস, মসজিদে ইমাম খোমিনি ও শেখ লুৎফুল্লা (মসজিদটির বিশাল এলাকা জুড়ে বাগান আর মসজিদের বাইরের অংশে ইরানের ঐতিহ্যবাহী ঘোড়াগাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ব্যক্তিবিশেষ, যাত্রীবেশে অনেকেই ঘোড়া গাড়িতে ওঠার মজা লুফেছিলেন), মিনার জুমবান (দুইটা মিনার একটা গম্বুজ, উক্ত মসজিদের উপরে উঠে মিনারের চারপাশের ফ্রেম আকৃতির কাঠ ধরে ঝাঁকা দিলে উক্ত মসজিদটি বেশ ভালো রকম নাড়াচাড়া করে। পূর্বের দিনগুলোয় উক্ত মসজিদটির ঝাঁকুনিতে পার্শ্ববর্তী মসজিদও নাড়াচাড়া করত।), আতিশকু পাহাড় (এককালে এখানে অগ্নিপূজা করা হতো। বর্তমানে এই সু উচ্চ মাটির পাহাড়ে শিশু কিশোররা সাইকেলে চড়ে খেলাধুলায় মত্ত থাকে।), ফাদাক গার্ডেন, ইস্পাহান টেকনোলজি পার্ক। ইস্পাহানের একটি পার্কে কৃত্রিম পাহাড়ি ঝর্ণার দেখা মেলে। ঝর্ণার পাশ ঘেঁষেই বিশাল আকৃতির ঝিল। ঝিলের পানির শাপলা-শালুক পদ্মরা হাস্যোজ্জ্বল হয়ে স্বাগতম জানাচ্ছিল অতিথিদের। পৃথিবীর ৭০% সৌন্দর্য ইরানের ইস্পাহানে, ইস্পাহান না দেখলে মানুষ মুখে প্রচলিত উক্ত কথাটি বিশ্বাসই হতো না। বন্ধুরা সত্যি! ইরানের ইস্পাহান পৃথিবীর বুকে অনন্য এক স্বর্গ রাজ্য। এই স্বর্গ রাজ্য ভ্রমণে ইরান সকলকে জানাচ্ছে খোশ আমদেদ (স্বাগতম)।

www.pathagar.com

কাশান

ইরানের কাশান প্রদেশের গ্রামাঞ্চলগুলোতে বিশ্বের সেরামানের গোলাপ চাষ হয়। কাশানের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানসমূহ : বাগ-এ-ফিন্দ, রওজা ইমামজাদা শাহ ইব্রাহিম, সিআলাক, The tabatabai Residence, Abianeh (central Iran)।

কাশানের একটি ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা

কাশান প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি শহরেও ফুলের ব্যাপক চাষাবাদ হয়ে থাকে। গোলাপ ফুলের জন্য এ অঞ্চলের খ্যাতি সর্বত্রই। বিশ্বে একমাত্র ইরানেই নানা প্রজাতির গোলাপের পাশাপাশি কালো গোলাপ জন্মে থাকে। এখানকার (কাশানের) খাঁটি গোলাপ জল দিয়ে পবিত্র কাবা ঘরসহ সিরিয়া, ইরান, ইরাকের পবিত্র রওজাসমূহ ধোয়া হয়। কাশানের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিভিন্ন কালে রাজা বাদশাগণ উক্ত প্রদেশে বসবাস করতে পছন্দ করতেন। কাশানসহ সমগ্র ইরান জুড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ইতিহাসের সাক্ষী রয়ে গেছে। বিভিন্ন প্রাসাদ, অট্টালিকাসহ অন্যান্য স্থাপনা ও বাগ-বাগিচাসমূহ আজও মাথা উঁচু করে ইরানের ঐতিহ্যের প্রমাণ দিচ্ছে। ইরানে আমার ভ্রমণকৃত রাজ্যসমূহের মধ্যে একমাত্র কাশানে সুন্দর সুন্দর আকৃতির মাটির বাসগৃহের দেখা মেলে এবং এইসব ঐতিহ্যবাহী পুরাতন সব স্থাপনাসমূহের অধিকাংশই লাল মাটির তৈরি। গ্রাম, পাহাড়, নতুন পুরাতন মাটির স্থাপনা, ফুলের বাগবাগিচা, চারপাশ ঘিরে শান্ত পরিবেশ, বাহ!

www.pathagar.com

দৃষ্টিনন্দন বাহারী সব ফুলের জন্য খ্যাত ইরানের কাশান

ইরানের এক অপূর্ব প্রদেশ কাশান। ইরানে মার্চ মাসের- ২১/২২ তারিখে নববর্ষ পালিত হয়। ইরানে নতুন বছরকে বলা হয় নওরোজ। জাশনে নওরোজ নববর্ষ) -এর শুভেচ্ছা জানাতে একে অন্যের বাসায় পারস্যের নতুন নতুন ঐতিহ্যবাহী পোশাক আশাক পরে যাওয়ার প্রথা আছে। এছাড়া জাশনে নওরোজ-এ ফলমূল, ড্রাই ফ্রুট, চকলেট দিয়ে নববর্ষের অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়। অতিথিরা উক্ত উৎসবমুখর দিনে প্রিয়জনদের ফুল ও চকলেট বক্স উপহার দিয়ে একে অন্যের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ করেন। ইরানে নওরোজ উপলক্ষে মিনা বাজার বসে। মিনা বাজারে শিশু ও মহিলাদের রকমারি দ্রব্যসামগ্রীর পশরা নিয়ে বসেন ইরানি মহিলারা। ঐতিহ্যবাহী এই মিনা বাজারে বছরে ১ বার ক্রেতা-বিক্রেতা মহিলাদের মিলন মেলা ঘটে। যা হয়ে উঠে ঐতিহ্যের প্রাণের মেলা।

তেহরান

রাশিয়া, চীন, জাপান, জার্মানিসহ আরও অন্যান্য কিছু দেশসমূহ যেভাবে নিজ ইতিহাস-ঐতিহ্য-প্রযুক্তি ও মাতৃভাষার দাপট দেখিয়ে বিশ্ব দরবারে নিজের অবস্থান করে নিয়েছে, ঠিক একইভাবে ইরানও উক্ত দেশগুলোর সাথে নিজেকে একই অবস্থানে পায়। পৃথিবীর যেকোনো দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতিসহ অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে হলে, সে দেশের রাজধানীতে অবশ্যই যেতে হবে। তাহলেই বোঝা যাবে সেই দেশের জাতি কতটা সভ্য বা বিপরীত কিছু। পারস্যের স্বর্গ ইরান আর দেশটির রাজধানী তেহরান। পাহাড় পর্বত সবুজ গাছ

www.pathagar.com

গাছালি, আর এরই মাঝে শহর ও গ্রামাঞ্চল। দু অঞ্চলেই নাগরিক সুযোগ-সুবিধ পর্যাপ্ত। দেশটির প্রাণকেন্দ্রের দর্শনীয় স্থানসমূহ : ইমাম খোমিনি আন্তর্জাতিব বিমানবন্দর, বিবি শাহের বানু রওজা, শাহ আব্দুল আজিমের রওজা, ইমাম খোমেনি ও তার পরিবারের মাজার, Golesstan palace, Dama vand Mountain, পথে পথে দৃষ্টি নন্দন বাগবাগিচা ও ভাস্কর্যসহ আরও অনেক অনেব কিছু। তেহরানের সব কিছুতে অত্যাধুনিকতার ছাপ যেমনটি পাওয়া যায়, তেমনি দেখা মেলে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু। ইমাম খোমেনির মাজারের বিশাল এলাকা জুড়ে গাছ-গাছালিতে ঘেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পার্ক। এ পার্কে অস্থায়ী তাবু গেড়ে দরিদ্র মুসাফির এবং খানেবাদুসরা অবস্থান করছে। তারা তাদের, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র গাধার পিঠে চড়িয়ে উক্ত স্থানে এসেছেন। মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছু উক্ত জায়গায় অবস্থান করে নিয়মমাফিক সম্পন্ন করাতে, দর্শনীয় এই স্থানের পবিত্রতা এবং ফুল ফলের গাছসহ লতাপাতায় ঘেরা পার্কের অপূর্ব সৌন্দর্য বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় না। দূর থেকে তাবু ও তাদের অবস্থান দেখে বেশকিছু শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া গেল। তারা নিজ দেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করে যাচ্ছে। আর এটিই হলো সকলের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়।

তেহরানের দৃষ্টিনন্দন একটি পার্কের ছবি

ইরানে 'নুমাইসগা' (মেলা)-এর দিনগুলোয় মেলার বিভিন্ন স্টলে উৎসবগুলোর আমেজের ওপর নির্ভর করে পণ্য রাখা হয়/ পরিবেশন করা হয়। তেহরানসহ পর্যটন নগরীতে এই মেলাগুলোর আয়োজন হয়। এলাকার আঞ্চলিক ভিত্তিক পরিবেশ অনুযায়ী মেলায় রকমারি খাদ্যের পরিবেশন দেখ

www.pathagar.com

যায়। মেলায় রকমারি চকলেট, হালুয়া সোন, আইসক্রিম, ফাশমাক (সোন পাপড়ি), বিভিন্ন ফলের জুস, পেস্তা বাদাম আখরোটসহ বিভিন্ন মজাদার ইরানি খাদ্যসামগ্রীর বেচা-কেনা দেখা যায়।

দুই টিয়া পাখির বন্ধুত্বের ভাস্কর্য তেহরানের ব্যস্ত সড়কে দেখা মেলে

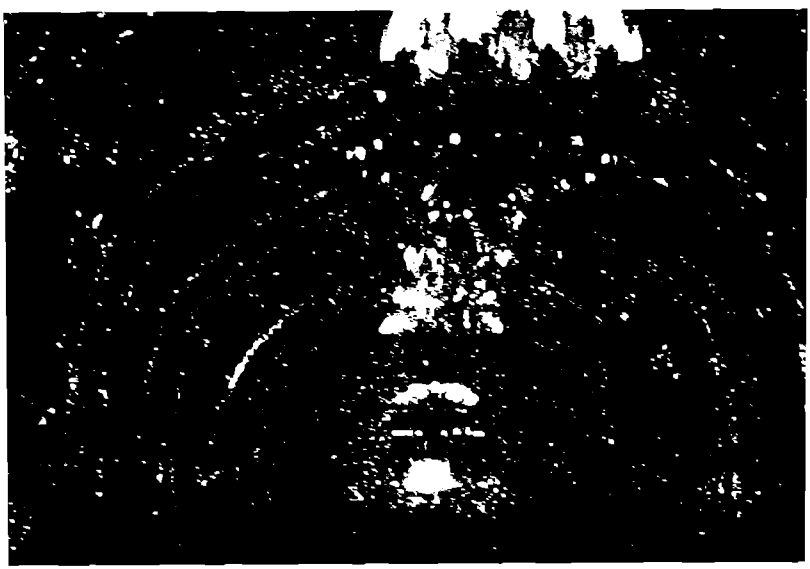

এমন সব দৃষ্টিনন্দন কাঁচের কাজ ইরানে দেখা মেলে

www.pathagar.com

ঈদ উৎসবে ইরানিরা... ঈদের নামাজ শেষে একে অপরকে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এবং যার যার বাসাবাড়িতে পরিবার-পরিজন নিয়ে ঈদ উৎসবে ব্যস্ত সময় কাটান। ঈদের দিনে গরিব দুঃখীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও অর্থ দিয়ে সকলে মিলে প্রাণের উৎসব ঈদে এক হয়ে যান। সমস্যাগ্রস্ত মানুষদের মুখে হাসি ফোটানোই ইরানিদের ঈদ আনন্দ।

ইরানে প্রকৃতি বাড়ছে প্রকৃতির মতো। প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা জানানো পুরো ইরানবাসীর জীবনের সুন্দর অংশ। দেশটিতে পাহাড়ের বুকে টেরাকোটা কেটে একেক স্তরে নির্মাণ করা হয়েছে সুদৃশ্য পাকাপোক্ত ঘরবাড়ি। যা দূর থেকে দেখতে খুবই সুন্দর দেখায়। তেহরানসহ ইরানের অধিকাংশ মাটি চাষাবাদের উপযোগী নয়। কারণ ঐখানে মাটিতে অনেক বেশি পাথর পাওয়া যায়, তার পাশাপাশি এখানকার মাটিটা হলো দোআঁশ। তবে এতে বালির পরিমাণ বেশি। ইরানে বাংলাদেশের মতো প্রচুর বৃষ্টি হয় না। এখানে সমতল ভূমি প্রয়োজনের তুলনায় পরিমাণে কম, কিন্তু এত কিছুর পরও ইরান সরকারের সহযোগিতায় চাষিরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজ নিজ জমি চাষাবাদযোগ্য করে তুলছেন এবং এই উন্নয়ন প্রতিনিয়ত সাধিত হচ্ছে। আমরা ভ্রমণ সঙ্গীরা তেহরানের সবুজ ঘেরা পালংশাকের ক্ষেতে কিছুক্ষণ অবস্থান করি। তুঁত গাছের ছায়ায় বসে দেশটির বাজার থেকে ক্রয়কৃত রসালো ফলমূলের স্বাদ নেই। পালংশাকের ক্ষেত থেকে কিছুটা সামনে এগোতেই দেখি শুধু তুঁত ফল আর তুঁত ফল গাছ। পারস্যে এতো তুঁত গাছ। দারুণ ব্যাপার। বাংলাদেশে এ ফলের কোনো কদর না থাকলেও সারা পৃথিবীতে তুঁত ফল Mulberry নামে বিখ্যাত। ইরানসহ উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেই এর চাষ হয়। বুনো এবং পালিত মিলিয়ে তুঁতের অসংখ্য রকমফের চোখে পড়লেও স্বীকৃত জাত রয়েছে মাত্র ১৬টির মতো। আর রঙের মধ্যে লাল, কালো এবং সাদার প্রাধান্যই বেশি। ইরানিরা সু-স্বাদু জাতের আবাদিত তুঁত ফল তাদের দেশীয় বাজারসহ বিদেশে বাজারজাত করে থাকে। গাছ পত্রমোচি গুল্ম বা ছোট আকৃতির, সাধারণত ৫ থেকে ১০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। পাতা ডিম্বাকৃতির, খসখসে, কিনারা দাঁতানো এবং শিরা সুস্পষ্ট। এখানকার তুঁত গাছে ফুল আসে ফেব্রুয়ারি-মার্চে, ফল পাকে মে-জুনের দিকে। তবে আবহাওয়াজনিত কারণে ইরানের কিছু কিছু প্রদেশসমূহে ভিন্ন ভিন্ন মাসে গাছটিতে ফুল ফোটে বা ফল পাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলো ফল মিলে ১টি সম্পূর্ণ ফল তৈরি হয়। কাঁচা ফলের রং সবুজ, তারপর পর্যায়ক্রমে লাল ও কালো রং ধারণ করে। গাছে একই সঙ্গে কাঁচা এবং পাকা ফল বেশ নান্দনিক।

কালো রঙের পরিপক্ব ফল রসালো, নরম ও টক-মিষ্টি স্বাদের। মুখের রুচি বাড়ায় এবং সুস্বাদুও বটে। মুখের তৃপ্তি মেটানোর পাশাপাশি তুঁত ফলের আরও বহুবিধ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পাকা ফলের রসপিত্ত, কফ ও জ্বরনাশক। বাকল ও শিকড়ের নির্যাস কৃমিনাশক। এছাড়া তুঁত ফল থেকে ইরানিরা জ্যাম, জেলি, স্কোয়াশ ও নানা রকম পানীয় তৈরি করে থাকে। M. alba প্রজাতির তুঁত ফল

www.pathagar.com

গালাপি-সাদা। মানের দিক থেকে এফল উৎকৃষ্ট এবং খেতেও সু-স্বাদু তহরানের তরুণদের কাছে গাছটির বংশ বৃদ্ধি সম্পর্কে জানতে চাইলে তার লে... গাছটির বংশ বৃদ্ধি হয় বীজ বা শাখা কলমে।

বন্ধুরা চলুন ইরানি বিবাহ উৎসব সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নি... াংলাদেশের ছোট শহর ও গ্রামগঞ্জে যেমন সহজ-সরল উপায়ে বিবাহ হয় রানে কিন্তু এত সহজে বিবাহসম্পন্ন হয় না। এখানে বিয়ের জন্য উভয় পক্ষকে নেক ব্যয় করতে হয়। তবে কিছু কিছু সংস্থার মাধ্যমে এখানে ব্যতিক্রমধর্মী বাহ লক্ষ করি এবং এই বিবাহগুলোতে দেখা যায় যে ২৫০/৫০০/ কয়েক ০০০ বিবাহ একই মঞ্চে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাদের বর ও কনে বিবাহের সময় াশ্চাত্য দেশসমূহের মতো পোশাক পরিধান করে থাকেন, অর্থাৎ বর কোর্ট, ্যান্ট এবং কনে সাদা বড় ধরনের ম্যাক্সি আর মাথায় পরেন সাদা সুন্দর রঙের গার্ফ এবং তার উপরে সাদা নকশি হেড ক্যাপ পরে থাকেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে াদের নিয়মিত খাবার আইটেম মেনুর, বাছাইকৃত অংশের প্রাধান্য বেশি দেখা ায়। বোঝা গেল বিবাহ অনুষ্ঠানেও তারা অন্যান্য দিনের মতই খাবার রিবেশন করে থাকেন। তাই যে সকল খাদ্যসামগ্রী তারা প্রতিনিয়ত খেতে াভ্যস্ত সেইসব খাদ্যসামগ্রীর পরিবেশন বিবাহ উৎসবের আয়োজনেও দেখা মলে।

পারস্যের সৌরভে ইরানি তরুণদের প্রথম পছন্দ

তেহরানের সুউচ্চ পাহাড়ের কোলে সাজানো সব সারি সারি দোকান থেকে, রানি ঐতিহ্যবাহী পণ্য কেনার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। ইরানের বাজার ামাদের দেশের বাজারের মতই মনে হলো। তবে কিছু কিছু বাজার আমাদের

www.pathagar.com

দেশের বাজারের বিকল্প কারণ এ বাজারের মধ্যে কিছু প্রাচীন যুগের বাজারের কাঠামো দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ দুই ধারে দোকানপাট এবং মাঝ খান দিয়ে বাজারের পথ। এই বাজার পথের উপরে ছাদ রয়েছে। যা বাজারের দুই সারির দোকানগুলোর উপর থেকে সম্মিলিত।

ইরানের কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান, পণ্য ও খাদ্যসামগ্রী হলো :- ব্যাংক মিল্লাত, আনসার ব্যাংক, তেজারাত ব্যাংক, ব্যাংক মিল্লি ইরান, সিটি ব্যাংক ইরান, সাবা কার, ইরান সেল, মিল্লিসু (যা আমাদের দেশের এপেক্স/ বাটার মত), ঐতিহ্যবাহী টুপি, সালার আইসক্রিম, মিহান আইসক্রিম, ডমিনো আইসক্রিম, Maz Maz nuts, sunflower seed kernels, Aidin Kutlu বিস্কুট, Firooz wheat Germ soap, Siv natural soap, Sogol fruit Bar, Carnival candy, Eleman candy, Soldoz candy, Noosheen cup cake, Sehat cedr shampoo, Rafooneh লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশ, Takdaneh natural juice, Baran জুস, Khansar মধু, Neshat মধু, Iran fresh dates, Pegah মিল্ক ক্রিম, Sohane Dorost kar, প্রিমা আইসক্রিম, Shud zistsohan, Khodkar Sohan, গোলে শোরখ ফ্রুট টফি, টুইসট টফিস, আলিস্ ফ্রুটিবার।

কোম

বন্ধুরা... আমরা ইরান ঘোরাফেরা করে দেখলাম এরা সভ্যজাতি। এই সভ্যতা প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে, তাইতো এরা নিজ সভ্যতা বুক জুড়ে আগলে রেখেছে। তার নিদর্শন হিসেবে আমরা যা কিছু দেখেছি তা হলো... পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নিয়মের পালন, বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট গুছিয়ে রাখা। ইরানের অধিকাংশ গৃহে নানা প্রজাতির পোষ্যপাখির দেখা মেলে। একইভাবে ইরানের দোকানগুলোর অনেকটিতেই দোকানিরা বন্দি খাঁচায় পাখি পুষতে পছন্দ করেন। তারা পাখিকে নিয়মমাফিক তাদের পছন্দের খাদ্যসামগ্রী ও পানি সরবরাহ করে... পাখিগুলোকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছেন। আমরা দেখেছি যে অনেকে নিজের বাসস্থানের সামনের রাস্তাঘাট নিজ হাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নাগরিক দায়িত্ব পালন করছে। রাস্তার দু'ধারে সারি সারি ফুলের বাগান করে রেখেছে ইরানি কর্তৃপক্ষ, যা সেদেশের নাগরিকরা যত্নসহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করছে। একটি জিনিস আমার খুব ভালো লাগলো, যা হলো এখানকার মানুষ খুবই সৎ। দোকানগুলোতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে দেখা মেলে খুবই কম লাভে দোকানিরা পণ্য বিক্রয় করে থাকেন। কারণে অকারণে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে ক্রেতাকে নাজেহাল করতে অভ্যস্ত নয় তারা। খাদ্যে ভেজাল মেশানো বা মাপে কম দেওয়ার মতো কূটকৌশলী চিন্তা-চেতনা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পছন্দ করে ইরানি ব্যবসায়িক সমাজ। ধর্মীয় পবিত্রতা রক্ষায় ইরানি নাগরিকরা অনেক সচেতন। আমরা হয়তো বিভিন্ন প্রবন্ধে

www.pathagar.com

্লিন মুসলমানদের রসনা বিলাস সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি, আমরা জেনেছি াদের খাবার দাবার সম্পর্কে, জেনেছি এরকম... "প্রতিদিন তারা রকমারি বশেষ আয়োজন করে থাকেন।" কিন্তু ইরানে এসে আমার ধারণাটা অনেকটা াল্টে গিয়েছে। যদিও বা ইরানে সীমাহীন রকমারি খাবার রয়েছে তারপরও াদেরকে দেখেছি নিত্য আহারের তালিকায় শুধু এক সময়ে এক ধরনের রকারি খেয়ে থাকেন। খাদ্যসামগ্রীতে তারা তেল এবং মশলা নায়ের মতো ্যবহার করেন, আর কাঁচা বা শুকনো মরিচ বা মরিচগুঁড়োর ব্যবহার ইরানিরা াকবারেই করেন না। আমি এমনও দেখেছি তারা শসা কিংবা টমাটো দিয়ে রুটি খয়ে সময় অতিবাহিত করতে পারে। শসাকে তারা ভিনেগার ও হালকা লবণ মশ্রণ দিয়ে চুলোর হাল্কা জ্বালে পাতিলসহ বসিয়ে দেয়, ভিনেগার আগুনে শুকিয়ে াসার সাথে মিশ্রিত হয়ে গেলে, সেটিকে তারা আচার হিসেবে খেয়ে থাকেন। মাটোকে তারা ফ্রাই প্যান-এ হাল্কা লবণ মিশ্রিত জলে ছেড়ে দিয়ে সেটিকে াল্কা পুড়িয়ে খেতে পছন্দ করেন। আর রুটি কিংবা ভাত যেটিই খেয়ে থাকেন ার সাথে বিভিন্ন শাকসব্জি মিশ্রিত টাটকা সালাত তাদের চাই-ই-চাই।

বন্ধুরা তাদের খাদ্যাভ্যাস জেনে, আপনাদের মনে হতে পারে ইরানিরা নতান্তই দরিদ্র জাতি। কিন্তু এমনটি মোটেও নয়। এমন নয় যে, তারা ভালো াদ্যসামগ্রী কিনতে সক্ষম নন। হয়তো এজন্যই ইরানিদের সঞ্চয়ের পরিমাণ নেক বেশি এবং তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সচ্ছল, পরনির্ভরশীল জাতি নয়। প্রায়ই াকল ইরানিদের গাড়ি-বাড়ি রয়েছে, যদিও বা তাদের আয় ইউরোপ আমেরিকার দশগুলোর মতো নয়।

দৃষ্টিনন্দন কোমের রেল স্টেশন, ছবিতে লেখক ও আলীশান

www.pathagar.com

ইরানের 'কোম' একটি ধর্মীয় প্রদেশ। ে
দ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অ
ভিন্ন ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা করা হ
ড় আলেম ওলামাগণ ও মাশায়েখ। আমর
হান নেতা ইমাম খোমেনি যিনি সালমান
খক। বাংলায় যাকে বলে শয়তানি কালা
লাম নামে আখ্যায়িত করেছে! নাউযুবিল্লা
রানের এই জাতীয় নেতা ইমাম খোমেনি
রে পরবর্তী-দিনগুলোয় সেখানে শিক্ষাদান
পনা তার মধ্যে উল্লখযোগ্য স্থাপনাসমূহ
াদের মাজার, হাদিস রিসার্চ সেন্টার, দৃষ্টি
শ্ববিদ্যালয় (উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি
লনার মিউনিসিপাল ট্যাঙ্করোডে অবস্থিত),
ম প্রজন্মের রক্তধারা হযরত ফাতেমা মা
কে আসেন বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। ে
াদামের ক্ষেত, জায়তুনের বাগান, মাজরা

ইরানি তারুণ্য আলী, মোহাম্মদ

www.pathagar.com

তুরস্ক, আজারবাইজান, ইউক্রেনসহ বিশ্বের আরও অন্যান্য দেশসমূহের শিক্ষার্থীরা। ইরান সরকার শিক্ষায় দেশি বিদেশি মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকেন... বিশ্বব্যাপী দক্ষ ও উন্নত জাতি গঠনের লক্ষ্যে।

ইরান ভ্রমণে শুধু কোমে, বাংলাদেশিদের আদর আপ্যায়ন, দেশীয় মজাদার সব খাবারের স্বাদ পেয়েছি। কোমে অবস্থানরত বাংলাদেশি পরিবারের সৈয়দ এহসান হোসাইন হোসাইনী, সৈয়দ সাজ্জাদ, আলী, মোহাম্মদসহ তাদের পরিবারের অন্যান্যদের সহযোগিতায় ইরান ভ্রমণ সহজ হয়েছে। তাঁদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কোম একটি ছোট প্রদেশ, এই প্রদেশে জনসংখ্যাও অনেক কম। চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোমে এহসান ভাই এর ছেলে আলী, আমাকে দেখল তাদের প্রতিবেশীরা কে কোন দেশের। তাদের বাসার নিচেই অবস্থান করছে বাংলাদেশি, পাশের বাসায় তুর্কি পরিবার, সামনে আফগান পরিবারের বসবাস, তিন/চার বাসা পরে আবার ইন্ডিয়ানদের বসবাস। আলীর ছোট ছোট সব ইন্ডিয়ান বন্ধুদের সাথে পরিচিত হয়ে চকলেট দিলাম। আর তুর্কি বাচ্চাদের চকলেট দেখিয়ে ডাকলে... নিজ ভাষায় বলে তুমি ভিনদেশি অপরিচিত, তোমার দেওয়া কোনো জিনিস আমি নিতে পারবো না। ইরানের কোম প্রদেশ সন্ধ্যার পর বাহারি সব ঝিকিমিকি আলোর খেলায় মেতে উঠে, যা দেখতে খুব সুন্দর মনে হয়।

এমনই সব বাহারি মাছের দেখা মেলে কোমের বাজারে

তেহরানের ইমাম খোমিনি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রথম যাত্রায় আমরা কোমে পৌঁছি। ইরানের কোমে এহসান ভাইয়ের বাসায় আমার প্রথম সকাল। রাত্রি করে ঘুমালেও খুব ভোরে মোরগের ডাক কুকরু-কু-কুকরু-কু শব্দে

www.pathagar.com

ঘুম ভেঙেছে। উঠে দেখি কোনো শোরগোল ছাড়াই নিরবে মোহাম্মদ ও আলী স্কুলে যেতে ব্যস্ত, একইভাবে এহসান ভাইও সবকিছু গুছিয়ে নিজ ইংলিশ মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলে গেলেন। উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি তিনি ইন্ডিয়ানদের সাথে নিয়ে পরিচালকদের দায়িত্বে আছেন। বাসার ড্রইং রুমের খোলা বড় জানালার সামনে এসে দাঁড়াই। পাখিদের কিচিরমিচির আর সতেজ বাতাস। ভোরের নিস্তব্ধতাকে আরও মধুময় করে তুলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই উপলব্ধি করি, ভোরের এই মিষ্টি বাতাসে খুব চেনা কিছু ফুলের সুবাস পাচ্ছি। সামনে তাকাতেই খানিকটা দূরে দেখি লতাপাতায় ঘেরা বাহারি সব ফুল ফোঁটা ফুলের বাগান। কোমে নির্দিষ্ট কিছু কাঁচা বাজার থাকলেও প্রধান সড়কগুলোয় বেশকিছু দূরত্ব বজায় পিকআপ গাড়িগুলোর দেখা মেলে, গাড়িগুলোতে বাহারি ফল ও টাটকা শাকসব্জির স্তূপ। আর পিকআপ গাড়ির এক কোণে বড় আকৃতির একটি ছাতা বসিয়ে দোকানি তার দোকানের ফলমূল বিক্রি করছে। তবে রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে তারা যথেষ্ট সচেতন। ইরানের কোম প্রদেশের মাছের বাজার দেখে কিছুটা অবাক হলাম! বন্ধুরা... এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, না দেখলে বিশ্বাসই করবেন না। মাছের বাজারে চেনা অচেনা বেশকিছু মাছের দেখা মেলে, তাদের ভেতর সবুর (ইলিশ), কাপুর (আমাদের দেশের কাতল মাছের মত), মিগু (চিংড়ি), কিলিকো (চ্যালা মাছের মত), হামুর (সামুদ্রিক মাছ), গেজেল আলা, নায়লটিকা, তেলাপিয়া, সিলভার কার্প উল্লেখযোগ্য মাছ।

মাশহাদ

দুস্ত (ইরানিরা বন্ধুকে দুস্ত/রাফিক বলে), সুমা আজ হিন্দ আমাদিদ? (বন্ধু আপনি কি হিন্দুস্থান থেকে এসেছেন?)। ইরান চেতরবুদ? মারদুমে ইরানরা চেগুনে দিদিদ (কেমন লাগলো আমাদের দেশ ইরান? এবং আমাদের দেশের মানুষ)। পারস্য ভ্রমণ করতে গিয়ে বন্ধুপ্রিয় ইরানি তরুণদের উক্ত প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন হতে হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। আমার পোশাক আশাকের স্টাইল দেখে সে দেশের তরুণদের অনেকেই ইন্ডিয়ান ভেবেছে আমাকে। আলাপচারিতায় বোঝা গেল তারা নতুন দিনের ইন্ডিয়ান ফিল্ম ও ফিল্মের তরুণ হিরোদের খুব বেশি পছন্দ করে। তাদের অনেককেই আমি বাংলাদেশি বলে পরিচয় দিলে, জিজ্ঞেস করে দেশটি কোন অঞ্চলে অবস্থিত? তাদের যখন বুঝিয়ে বল্লাম তোমাদের দেশ এবং ইরাক যেমন পাশাপাশি অবস্থান করছে ঠিক তেমনি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার অবস্থান একই রকম। এরপর তরুণদের অনেকেই (ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়) বলে উঠল ইয়েস! মনে পড়ছে... সাভার ট্রাজেডি, ডেসটিনি কেলেংকারী, বিডিআর বিদ্রোহ, শেয়ার মার্কেট কেলেংকারি, পলিটিক্যাল অশান্তি, এইসবইতো তোমাদের দেশে প্রতিনিয়ত হয়ে থাকে।! আর তোমাদের প্রধানমন্ত্রীতো হাসিনা ওয়াজেদ, তাই না? তাদের কথায় কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন হলেও,

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বাস্তবচিত্র এর চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর তা হয়তো বা তারা জানে না। তবে তাদের একটি কথা শুনে মন শান্ত হলো... "যত যাই হোক তোমরা বাংলাদেশি সাধারণ নাগরিকরা অনেক বেশি ধৈর্যশীল এবং বন্ধুপ্রিয়" (ভাষ্যটি ইরানি তরুণদের)। আলী, মাজিদ, হাবিব, ফারজাতসহ আরও অনেকেই আমার Facebook id নিয়েছে ছবি তুলেছে এবং বলেছে "আমাদের পরিচিত অনেক বন্ধুরাই বাংলাদেশ ভ্রমণে গিয়ে, তোমাদের আচার-ব্যবহার ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ।" যদি বাংলাদেশ ভ্রমণে আসি তোমাদের সাথে যোগাযোগ করবো (এই ছিল ইরানি তরুণদের কথপোকথনের কিছু অংশ)।

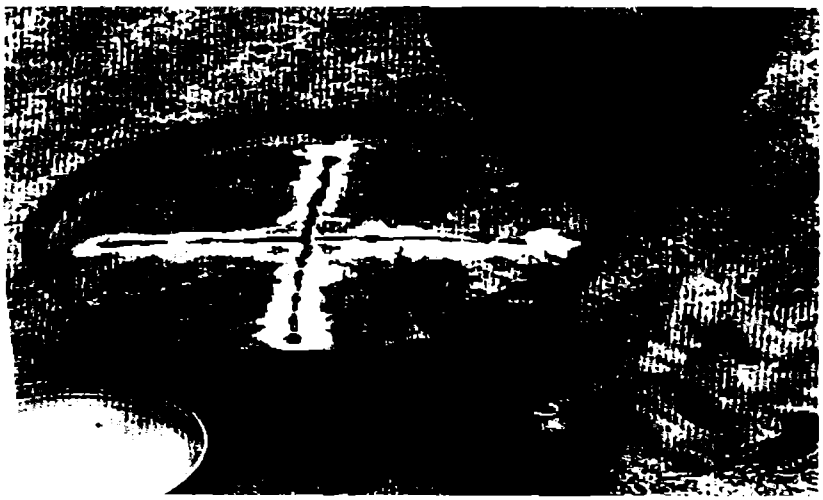

ইরানিদের খাবারের একটি চিত্র

ইরানের 'মাশহাদ' প্রদেশ একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আধুনিক বড় নগরী। একটি বড় নগরীর যাবতীয় চাকচিক্যতা মাশহাদবাসীর জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে। বাহারি সব শপিং সেন্টার, পার্ক, রেস্তোরাঁ, বিনোদন কেন্দ্র, ইমাম রেজা (র.) এর রওজা পবিত্র দর্শনীয় একটি স্থান, সু-বিশাল আয়তন জুড়ে এই রওজার চারপাশ ঘিরে রয়েছে বাহারি সব ফুলের বাগান ও পার্ক। রওজাটি স্বর্ণ-রৌপ্য কাচ এবং মূল্যবান শ্বেত পাথর ও কারুকার্যের সমন্বয়ে তৈরি। রওজার ভেতর দেখে মনে হলো রাজা বাদশাহদের মহলের মতো রওজার ভেতরেও প্রচুর খোলামেলা জায়গা, ঝর্ণা, ফুলের বাগান। মাঝখানে পানির ফোয়ারা উপরে খোলা আকাশ, নিচে শ্বেত পাথর। আর এই খোলা আকাশের মৃদু মৃদু মিষ্টি বাতাসের মাঝে যে যার মতো বা দলীয়ভাবে সম্মিলিতভাবে ইবাদত বন্দেগিতে ব্যস্ত। আর ইবাদত বন্দেগি শেষে ফুলেল পরিবেশে মৃদু হাওয়ার তালে তালে পানির ফোয়ারার রঙিন ছন্দে মেতে উঠেছেন দর্শনার্থীদের অনেকেই।

www.pathagar.com

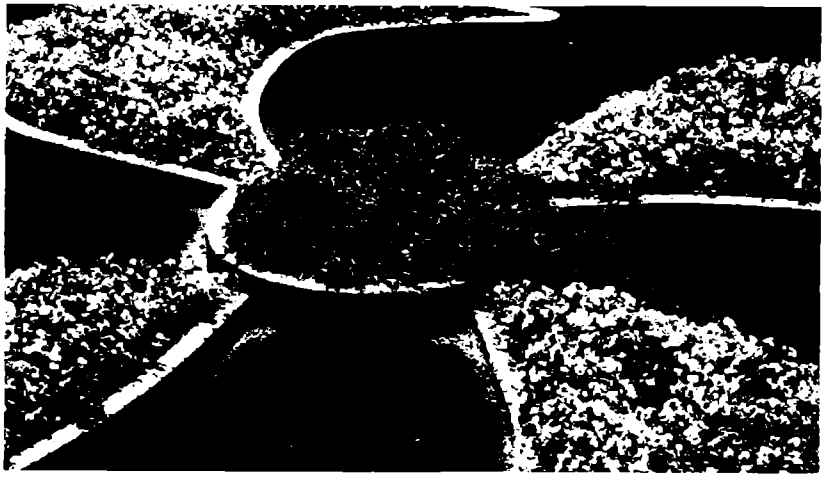

এ দৃশ্যনন্দন বাগিচার ভাস্কর্য ইরানের মাশহাদে দেখতে পাওয়া যায়

বন্ধুরা চলুন মাশহাদের কিছু ইসলামি স্থাপনাসমূহের নাম জেনে নিই... আবাসালত এর মাজার। মাশহাদে বিভিন্ন দৃষ্টি নন্দন ইসলামি স্থাপনার পাশাপাশি রয়েছে কিছু ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থাপনা হলো : মহাকবি ফেরদৌসির স্মৃতিসৌধকে ঘিরে বিরাট আয়তন জুড়ে পর্যটন কেন্দ্র। আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবির স্মৃতিসৌধ মাশহাদে দেখতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ওমর খৈয়াম এবং আত্তার নিশাপুরির নাম উল্লেখযোগ্য। মাশহাদে অবস্থিত ইমাম রেজা (র.)-এর রওজা খুবই সুন্দর দৃষ্টি নন্দন পারস্য স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য নিদর্শন। আমি সেখানে গিয়ে দেখতে পাই ইসলামের গৌরবময় স্থাপনা যা ইসলামি কারিগরি তার ঐতিহ্য বহন করছে। আমরা অনেকে হয়তো শুনেছি যে, এককালে ভারতের মোগল সম্রাট ও নবাবদের নির্মিত শিশ মহল (ফার্সিতে শিশে কারি, আর বাংলায় কাচের ঘর) যা ছিল নজর কাড়া সুন্দর। ইরান ভ্রমণে বুঝতে পেরেছি যে, এটা তাদের জন্য তেমন বড় কিছু নয়। এখানকার দক্ষ কারিগরেরা বিভিন্ন মসজিদ এবং ইসলামি স্থাপনাসমূহে এ ধরনের নিখুঁত কারিগরির ব্যবহার করে থাকেন। এই শিল্পটি আমার মনে হয় একান্ত ইরানের। কারণ ভারতের মোগল সম্রাট ও নবাবরা ইরান থেকেই ভারতে এসেছিলেন। পরবর্তীতে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সময় নবাব আলিবর্দীসহ অন্যান্য নবাব ও সম্রাটরা নিজ মাতৃভূমি/পিতৃভূমি ইরানের কারিগরদের সহযোগিতায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে দৃষ্টি নন্দন মহল ও বাগবাগিচা দাঁড় করান। যেমনটি বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং তাঁর প্রিয় নানাজান নবাব আলিবর্দী খান বাংলার হৃদয়ে দাঁড় করিয়েছিলেন কিছু দৃষ্টি নন্দন স্থাপনা, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থাপনাসমূহ : নবাব সিরাজের স্বপ্ন রঙের বাস্তব রূপ হিরাঝিল, মদিনা মসজিদ, কাঠের তৈরি ইমাম বাড়া, মনসুরাগঞ্জ প্যালেসসহ

www.pathagar.com

ারও বেশকিছু বাগ-বাগিচা ও স্থাপনা। আমি মাশহাদে গিয়ে দেখতে পেয়েছি... রানের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মের প্রতি অশেষ টান রয়েছে। সেখানে প্রতিদিন ক্ষ লক্ষ মানুষ ইরানের আনাচে কানাচে থেকে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে সে ইমাম রেজার (মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)- এর বংশধরের অন্যতম কজন) পবিত্র রওজা জিয়ারত করছেন। উক্ত স্থানে আগতরা নামাজ, দোয়া, র্থনার মাধ্যমে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন।

উক্ত ছবিটি মাশহাদের এক তরুণের

অত্যাধুনিক নগরী মাশহাদের হোটেল নাগিন-এ আমরা বাংলাদেশি মণকারীরা বেশ কয়েকদিন অবস্থান করে শহরটির আনাচে কানাচে ঘুরে দখেছি, পরিচিত হয়েছি তাদের আচার ব্যবহার ও সংস্কৃতির সঙ্গে। মাশহাদে মাদের অবস্থানের শেষ রাত্রি হোটেলে ঘুমিয়ে, সকালে ফজরের আযানের পূর্বে মাম রেজার রওজায় নামায পড়তে যাই। হাল্কা মৃদু বাতাস, চারপাশে বাহারি ব ফুলের সৌরভ, পাখিদের কোলাহলে ভোরের শান্ত শহর মাশহাদকে এক ন্যরকমই মনে হলো। পবিত্র এই রওজার চারপাশ গোছানো, সুন্দর থেকে ন্দর পরিবেশ, আর স্নিগ্ধ মিষ্টি সুপ্রভাতে নামায পড়তে এসে মন আরও শীতল । সজীব হয়ে উঠল। পবিত্র এই স্থান থেকে বেরিয়ে হোটেল পথে যাওয়ার সময় াখে পড়ল যায়নামাজের মতো বড় বড় সব রকমারি তন্দুর রুটি, ক্রেতার নাকান থেকে কিনে নিজ গন্তব্য স্থলের পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন। সকাল, দুপুর বং রাতে মাশহাদের হোটেল নাগিনের পরিবেশিত খাদ্যসামগ্রীর সব কিছুতেই ল ইরানি ঐতিহ্যের স্বাদ। তাদের খাদ্যসামগ্রীর স্বাদ নিতে গিয়েই পরিচিত তে পেরেছি তাদের খাদ্যাভাস সম্পর্কে। খাদ্যে ঝাল, মশলা, লবণ এগুলোর ্যবহার তারা নায়ের মতো করে থাকে। তাদের খাদ্যসামগ্রী আমাদের দেশের

www.pathagar.com

াদ্য খাদ্যসামগ্রীর মতো মুখরোচক না হলেও, পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত। দীর্ঘ ায়ু ও সুস্বাস্থ্যের জন্য তারা কাঁচা টাটকা শাকসব্জি ও ফলমূল খেয়ে থাকেন। রানিদের সকালে নাস্তার আয়োজনে থাকে, 'নোন', (রুটি, তবে আমাদের শের মতো নরম কোমল রুটি নয়)', 'অশ' (নুডুলস এর ভেতর সব্জি ও ডাল য়ে স্যুপ জাতীয় খাবার); 'আসাল' (মধু); 'কারে' (মাখন), 'খামে' (দুধের র), পনির, মুরাব্বা (গাজর, আঙুর এবং বিভিন্ন ফলের মিশ্রণে অথবা একক লের রসালো মুরাব্বা); 'ছায়' (চা)। নিজেকে সতেজ ও চাঙ্গা রাখার জন্য কাল, দুপুর, বিকাল ও রাতে যেকোনো সময় তারা তাজা ফলের জুস এবং রং া খেয়ে থাকেন। চিনির কিউব গালের ভিতর রেখে চা খেতে পছন্দ করেন ারস্যবাসী। সময়ে অসময়ে 'শোকোলাথ' (চকলেট) এবং 'খোরমা' (খেজুর) খতে ভালোবাসেন ইরানিরা।

মাশহাদের একটি ব্যস্ত শপিং মলে ইরানি তরুণ ডাক্তার ফায়জাদ এর সাথে লেখক

জোহরের নামায শেষে ঘণ্টাখানিকের মধ্যে দুপুরের খাবার খেতে অভ্যস্ত রানিরা, দুপুরে তারা খেয়ে থাকেন : রুটি, 'রেরেঞ্জ/চেলু' (ভাত), 'মাহি' মাছ), 'মোরগ' (মুরগি), 'খোরেস্ত' (তরি তরকারি, অর্থে ব্যবহৃত হয়), যে মস্ত তরিতরকারি খেয়ে থাকেন তাদের মধ্যে 'ফিসিনজান', 'গোরমে সাবযি', কেমে বাদামজুন' উল্লেখযোগ্য। ইরানিরা রাতের খাবার আয়োজন করে থাকেন যবের স্যুপ, 'চেলু মোরগ' (ভাত, মোরগ, জাফরান এর সমন্বয়), চেলুকাবাব', 'মাহি কাবাব' (মাছের কাবাব), 'চেলু খোরেস্ত' (তরকারি ভাত) ত্যাদি খাদ্যসামগ্রী দিয়ে। ইরানিরা সবসময় ভাতের পাশাপাশি রুটির ব্যবহারে ভ্যস্ত। আর এগুলো খাদ্যসামগ্রীর সাথে টাটকা শাকসব্জি মিশ্রিত সালাদ, শসার ক আচার এবং ঘোল ও মাঠা খেয়ে থাকেন তারা।

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনে 'আবাবিল' পাখির কথা উল্লেখ থাকায় ইরানি মুসলিম সম্প্রদায় পাখিটির স্বাধীন চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করেন না। ইরানের পবিত্র রওজাগুলোতে আবাবিল পাখিদের আনাগোনা দেখা যায়। আবাবিল দলবদ্ধভাবে বসবাসকারী পতঙ্গভুক্ত পাখি। এদের খাটো ও চওড়া ঠোঁট লোমে আবৃত। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা আবাবিলকে মনে করেন সুসংবাদ, আরাম ও আনন্দের বার্তাবহ। দেহের তুলনায় ডানা লম্বা থাকায় এরা দীর্ঘক্ষণ উড়তে পারে। ডানার আগর খোঁজের দরুন আবাবিল উড়ার সময় নামতে গড়াতে এবং সেতুর নিচে বা কোনো গর্তে, বাসায় পৌঁছতে নিখুঁতভাবে দোল খেতে পারে। ইরানের পবিত্র রওজার সু-উচ্চ উপর ভাগে এদের ওড়া ওড়ি ও অবাধ বিচরণ, তবে পবিত্র স্থানসমূহে অবস্থানকালে সেই স্থানগুলোর পবিত্রতা রক্ষা করে চলে আবাবিল পাখি। ডানার কাঠামোর জন্য এরা দ্রুত উঁচুতে উঠতে পারে। সাটিনসহ প্রায় ৯০ প্রজাতির আবাবিল (Paridac) ও (Hirundiridae) গোত্রভুক্ত। এদের ডানা লম্বা ও সরু, লেজ দ্বিধাবিভক্ত এবং পা দুর্বল। আবাবিলদের উড়ার ভঙ্গি খুবই আকর্ষণীয়, এরা নানাভাবে পাক খেয়ে চলে। পালক চকচকে নীল বা কালো, সাধারণত নিচের চেয়ে উপরের দিক গাঢ় রঙের। ইরানের রওজাগুলোতে বিভিন্ন প্রজাতির 'আবাবিল' পাখি দেখতে পাওয়া যায়।

শাহনামা খ্যাত কবি ফেরদৌসির সমাধিতে

ইরানের 'মাশহাদ' প্রদেশের মাটিতে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন কবি ফেরদৌসি। ফেরদৌসি শব্দের অর্থ বেহেশতি বা স্বর্গীয়। ফেরদৌসি কিন্তু তাঁর আসল নাম ছিল না। তাঁর আসল নাম হাকিম আবুল কাসিম মনসুর তুসী। তাঁর কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে গজনীর বাদশাহ সুলতান মাহমুদ তাঁকে ফেরদৌসি উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ফেরদৌসি ৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ইরানের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ইসহাক ইবনে শরফ। ছোটবেলা থেকেই ফেরদৌসি কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। তাঁর কবিতা শুনে তাঁর এলাকার লোকজন মুগ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু তিনি ছিলেন খুবই গরিব।

তাই কবি খ্যাতি ও গৌরব লাভের আশায় সুলতান মাহমুদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রথম দিনেই ফেরদৌসির কবিতা শুনে সুলতান খুব খুশি হয়ে বলেন... হে কবি, আপনি সত্যি আমার সভাকে স্বর্গের মতো পরিণত করেছেন। আর এ থেকেই সুলতান কবিকে সাদরে বরণ করে নিলেন। জানা যায়, সুলতান প্রাচীন পারস্যের (বর্তমান ইরান) ইতিহাস লেখার জন্য ফেরদৌসিকে অনুরোধ করেন। তখন ফেরদৌসি সুলতানকে একটা শর্ত জুড়ে দেন। শর্তটা ছিল কবিকে কবিতার প্রতিটি পংক্তির জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে একটা করে স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিতে হবে। বাদশাহ কবির এ শর্ত মেনে নিলেন। শুরু হয় ফেরদৌসির অক্লান্ত সাধনা। এভাবে দেখতে দেখতে ৩০ বছর সাধনার পর ৬০ হাজার পংক্তিতে সুলতানের ফরমায়েশ মতো তিনি 'শাহনামা' মহাকাব্যটি লিখে শেষ করেন।

www.pathagar.com

শাহনামার কেন্দ্রীয় শক্তি মহাকাল। কালে
শাহনামার বিষয়বস্তু। ইরানের বীর ও বাদশ
মুখ্য বিষয়। শাহনামা মহাকাব্যটি ১৮টি অং
সুন্দর বর্ণনা ও ঘটনা রয়েছে, যা মননশীল
তোলে। এসব ঘটনার মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির
কাহিনী, প্রজ্ঞাশীল বাণী, উপদেশ, রূপক
বর্ণনা। আর প্রত্যেকটি গল্পের শেষে রয়েছে
তাছাড়া শাহনামায় ফেরদৌসি গেঁথে ছিলে
ইতিহাস যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল চারলদের
করেও কবির জীবনে সুখ ফিরে এলো
সুলতানের কাছে গিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুত প
মাহমুদ কিছু দুষ্ট লোকের মন্ত্রণা শুনে তাঁ
বিপরীতে একই পরিমাণ রৌপ্য মুদ্রা দিতে স
ফেরদৌসি মনে খুব কষ্ট পেলেন এবং তিনি
অল্পসংখ্যক মুদ্রা নিয়ে প্রথমেই নিজের
বিক্রেতাকে কিছুসংখ্যক মুদ্রা দিলেন। আর

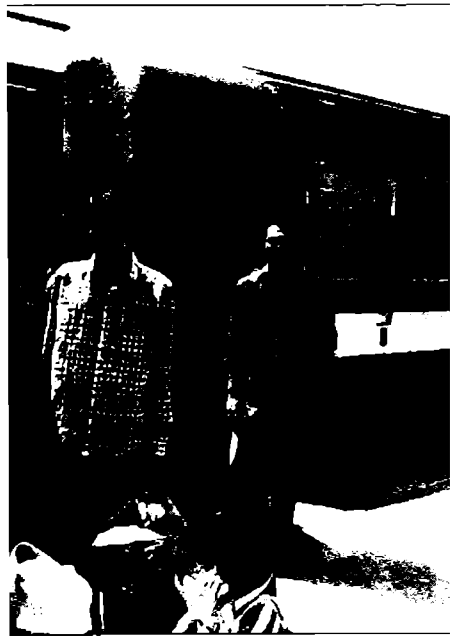

ফেরদৌসির সমাধিতে যাওয়ার প্রস্তুতি,
ছবিতে মাসুম ও লেখক

www.pathagar.com

লোকমারফত ইরানে পাঠিয়ে দিলেন, তখন কবি মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েছেন। সুলতানের অনুচরগণ গৃহের নিকট এসে দেখল, মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে সমাধিক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে তাঁর ভক্তগণ। পরবর্তীতে বাদশাহের লোকেরা কবির একমাত্র মেয়েকে সেই স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিতে চাইলে, কবির কন্যাও তা প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দেন। এভাবেই শেষ হলো 'শাহনামা' মহাকাব্যের অন্তরালে ফেরদৌসির জীবনের এক ব্যথাতুর ইতিহাস। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ফেরদৌসি ১০২০ সালে ৮৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। পরবর্তী দিনগুলোয় এই আবুল কাশেমই ইতিহাসে 'ফেরদৌসি' হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। তার রচিত 'শাহনামা' তাকে বিশ্বসাহিত্যে অমর করে রেখেছে। ইরানের 'মাশহাদে' রয়েছে কবি ফেরদৌসির মাজার। মাজারের চারপাশ দেখে মনে হলো, এটি কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। সবুজ প্রকৃতির মাঝে মিষ্টি সুবাসিত ফুলের বাগান। শ্বেত পাথরের তৈরি পুকুর। কবির আবক্ষমূর্তি। এলাকাটির কিছু স্থানজুড়ে ছোট ছোট দোকানের দেখা মেলে। সেই দোকানগুলোতে পাওয়া যায় পারস্যের সব ঐতিহ্যবাহী জিনিসপত্র। ইরানি শিল্পীদের কারুকার্যে... পাথর ও কাঠের উপর ফুটে উঠেছে- কবি ফেরদৌসির মুখমণ্ডলের খোদাইকৃত ও অঙ্কিত চিত্রসমূহ। কবির মাজারের প্রবেশদ্বারে ঘন সবুজ গাছপালার সাথে সাথে মৃদু হাওয়ায় ঐতিহ্যের সব গর্ব নিয়ে মাথা তুলে দুলছিল ইরানের জাতীয় পতাকা। সেই সাথে মনে হলো দেশটির ঐতিহ্য সংস্কৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশ্ববাসীকে সু-স্বাগতম জানাতে সদা প্রস্তুত। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে যারা ইরান ভ্রমণে ইচ্ছুক, সেইসব বন্ধুদের জন্য সু-সংবাদ, খুব কম মূল্যে এয়ার এরাবিয়া ইরান ভ্রমণের সুযোগ দিচ্ছে বাংলাদেশি বন্ধুদের। দেশটিতে উক্ত বিমান দিয়ে মাত্র ৪৫ হাজার টাকায় যাওয়া এবং আসা যায় (হিসাবটি আমাদের ভ্রমণ সময়কালীন)।

শাহনামা খ্যাত কবি ফেরদৌসির সমাধিতে লেখক

www.pathagar.com

সাত রঙের দেশে

বন্ধুরা জানেন কি? ভালোবাসার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উহার গোলাপ ফুল পৃথিবীর হৃদয়ে সর্বপ্রথম কোথায় ফুটেছিল। সেই সুদূর পারস্যের ফুল বনে। সম্ভবত ১৬০০ শতাব্দীতে। গোলাপ ফুল পরম করুণাময় আল্লাহ্ তালার এক অপরূপ সৃষ্টি, মানবজাতির জন্য। গোলাপ ফুলকে দেশে দেশে ফুলের রাজা বলা হয়। পারস্যবাসী ফুলকে 'গোল' / 'গুল' বলে আর গোলাপ তাদের কাছে 'গোলাব' নামে পরিচিত আর ফুল বাগানকে তারা 'গোলিস্তান' / 'গুলিস্তান' বলেন। দেশটির শুধু 'কাশান' প্রদেশেই ব্যাপক হারে গোলাপের চাষাবাদ হয়। কত সব বাহারি রঙের গোলাপ ফুলের বাহারই-না আছে পারস্যের ফুল বনে। লাল, হলুদ, গোলাপি, কমলা, বেগুনি, সাদা, কালো, পিচ এবং আরও সব নানা রঙের বাহার। পারস্যের এই অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় সৃষ্টির প্রতিটি রঙেই দেখেছি ভালোবাসার কথা। গোলাপ ফুলের প্রতিটি রঙের আলাদা অর্থ থাকলেও পারস্যবাসীর হৃদয়ের সুর-'ভালোবাসি'; আমরা ফুল ভালোবাসি। এযেন ভালোবাসার সাত রং। এজন্যই দেশে দেশে ভালোবাসার উপহার হিসেবে একগুচ্ছ গোলাপ ফুলের গ্রহণযোগ্যতা সবকিছুর উর্ধ্বে। এ তো নিছক ফুলই নয়, এযে প্রেরক এবং প্রাপকের মধ্যে যোগাযোগের মেলবন্ধন, হৃদয়ের গভীরের উষ্ণ বার্তা বহনকারী মাধ্যম! প্রথম ভালোবাসা জানাতে, হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার গৌরব ফিরিয়ে আনতে, গভীর ভালোবাসাকে আরও গভীরে পৌঁছে দিতে, কাউকে ভালোবাসা মিশ্রিত শ্রদ্ধা জানাতে, শত্রুর মন জয় করতে, প্রিয়জনের আনন্দের অংশীদার হতে, শোকার্তকে সহানুভূতিপূর্ণ ভালোবাসা জানাতে একগুচ্ছ গোলাপই যথেষ্ট। তা আবার পারস্যের সৌরভ যদি হয়, তাহলে তো কথাই নেই। দেশে দেশে আজ লাল গোলাপ অনেক জিনিসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রধান অর্থ হচ্ছে 'প্রেমময় ভালোবাসা'। লাল গোলাপ উচ্চারণের ভেতর জড়িয়ে থাকে আবেগ আর উষ্ণতা মাখানো রোমান্স। হয়তো এ কারণেই লাল গোলাপের আরেক নাম 'প্রেমিকের গোলাপ'।

♥ সাদা গোলাপ... সাদা গোলাপ ফুল বিশুদ্ধতা এবং পবিত্রতার প্রতীক। একগুচ্ছ সাদা গোলাপ উপহার দেওয়ার ভেতর নিহিত থাকে অন্তরের শুভ ইচ্ছার কথা, ভালোবাসার পবিত্রতার কথা, একের প্রতি অপরের একনিষ্ঠতা, অঙ্গীকার এবং নির্ভরতার কথা।

♥ হলুদ গোলাপ... হলুদ গোলাপ ফুল অপরকে স্বাগত জানাতে, বন্ধুত্বের প্রতীক, পরম নির্ভরতা, আনন্দ-উচ্ছ্বাস আর ভালোবাসার প্রতীক। অপরকে স্বাগত জানাতে, নতুনকে আহ্বান করতে, নতুন মা, নতুন গ্র্যাজুয়েট অথবা বাগদান বা বিয়ের আশীর্বাদ হয়ে যাওয়া পাত্রপাত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে হলুদ গোলাপের জুড়ি মেলা ভার ! হলুদ গোলাপ নতুন জীবন শুরুর আনন্দ ও ভালোবাসার প্রতীক।

www.pathagar.com

♥ গোলাপি গোলাপ... গোলাপ থেকেই গোলাপি। গোলাপি গোলাপ ফুলের হণযোগ্যতা সর্বকালের, সর্বযুগের ! আভিজাত্য এবং হালকা গোলাপি রঙের ালাপ সুখ, রোমান্স, আনন্দ প্রকাশের প্রতীক এবং গাঢ় গোলাপি গোলাপ াপকের প্রতি প্রেরকের ভালোবাসার স্বীকৃতি, হৃদয়ের স্নিগ্ধ ভালোবাসার কাশ।

♥ ল্যাভেন্ডার গোলাপ... 'প্রথম দর্শনেই প্রেম' প্রকাশের অন্যতম উপহার চ্ছে একগুচ্ছ ল্যাভেন্ডার গোলাপ। ল্যাভেন্ডার বা হালকা বেগুনি রং একজনের তি আরেকজনের গভীর ভালোবাসার বর্ণনা করে। প্রিয়জনকে ভালোবাসার ভীরতা বোঝাতে ল্যাভেন্ডার গোলাপের জুড়ি নেই।

♥ কমলা গোলাপ... আভিজাত্য এবং অন্তরের স্নিগ্ধতা মিশ্রিত ভালোবাসা কাশ পেয়ে থাকে কমলা রঙের গোলাপ ফুলের মধ্যে দিয়ে। তাই প্রিয়জনের াঝে আদান-প্রদান হয়ে থাকে কমলা রঙের গোলাপ ফুল।

♥ কালো গোলাপ... কালো গোলাপ মানে হচ্ছে পুনর্জন্ম অথবা নতুন করে রু। এই ফুলটি সাধারণত কালচে লাল বা কালচে মেরুন রঙের হয়ে থাকে। ালোবাসার মৃত্যু নেই, পারস্পরিক সম্পর্ক ভেঙে গেলেও সম্পর্ক জোড়া দিতে াই রঙের গোলাপের জুড়ি নেই। আরেক পক্ষ মনে করেন কালো গোলাপ শুধু াক্র পক্ষের জন্য নির্ধারিত। যে যাই বলুক ফুল হলো সুন্দরের প্রতীক। াবিত্রতার প্রতীক। তাইতো ভালোবাসায় পরাজয় বলে কিছু নেই, হেরে যাওয়া ীবনে কালো গোলাপ 'এসোনা আবার শুরু করি' বার্তা বহন করে।

সাত রঙের দেশ ইরানকে আরও রঙিন করেছে বাহারী সব পাখির দল

www.pathagar.com

♥ লাল গোলাপ... সব রঙের গোলাপেই ভালোবাসার কোনো না কোনো কথালেখা আছে, তবে লাল রঙের গোলাপ ফুল ভালোবাসার নিরবচ্ছিন্ন প্রতীক। লাল মানে উষ্ণতা, লাল মানেই রোমান্স, লাল মানে সাহস!

প্রিয় মানুষটিকে যদি একগুচ্ছ লাল গোলাপ ফুল অথবা বাগান থেকে তুলে নিয়ে আসা একটি তরতাজা ফুটন্ত গোলাপ দেওয়া যায়, যার অর্থ 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ', এতে স্বর্গীয় ভালোবাসা পৃথিবীতেই মূর্ত হয়ে ওঠে! আর তাইতো লাল গোলাপ মানেই ভালোবাসা ভালোবাসা ভালোবাসা, লাল গোলাপ মানেই প্রেম, লাল গোলাপের শুভেচ্ছা মানেই পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। 'আজিতা ঘাহরে মান' (১৯৬২) আধুনিক ইরানি কবিতার জগতে এক উজ্জ্বল নাম। এই কবির জন্ম ইরানের মাশহাদ প্রদেশে। শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের কিছুকাল তিনি পারস্যের সৌরভে কাটিয়েছেন। তিনি বিদেশি অনেক ভাষার কবিতা ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। ফার্সি ও ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি কবিতা লেখেন। 'হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন' মুক্ত ছন্দে লেখা তাঁর দীর্ঘ কবিতাটি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইরানের একজন কবি সেইন্ট ভ্যালেন্টাইনকে নিয়ে কবিতা লিখবেন। তা অনেকের কাছে অকল্পনীয়। ইরানের সমাজের ১টি শক্তিশালী অংশে সেইন্ট ভ্যালেন্টাই (ভ্যালেন্টিনাস) ও তাকে কারাদণ্ড প্রদানকারী রোমান সম্রাট আস্তেরিয়াসের কন্যার প্রেম-প্রণয় কখনো অনুমোদনপ্রাপ্ত বিষয় নয়। তাঁর কবিতার পরাবাস্তবতার সঙ্গে সমকালীন অনেক অনুষঙ্গ রয়েছে...

সাত রঙের দেশ ইরানের দৃষ্টিনন্দন এই বাগিচার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করছেন ইরানী এক তরুণী

www.pathagar.com

"মধুর সব দৃশ্যকে আমি কুৎসিত করে দেবো, পাখির পরিবর্তে আমি আঁকবো বৃক্ষচূড়ায় ঘোড়ার ছবি। রাশিয়ার পুতুল খেলার স্থূলাঙ্গী মানুষের কথা মনে আছে? তোমার টেবিল জুড়ে এঁকে রাখবো ঐসব মানুষের ছবি। তোমাকে বানিয়ে দেবো সিংহ আর বৃক্ষের মিলনে শংকর কাঠ বেড়াল! প্রতিটি তীর তোমার দিকে তাক করা। এই পরিচিত পথ তোমার দিকেই ফিরে গেছে। প্রেম লাল গোলাপ যেন, যা আমি তোমার জানালা তাক করে ছুঁড়ে মারি" (আজিতা ঘাহরেমানের কবিতার সংক্ষিপ্ত অংশ)।

বন্ধুরা জানো কি... * পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস কি?... সততা, বিশ্বস্ততা। * আর পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী জিনিস কি?... আত্মবিশ্বাস আর ভালোবাস, ভালোবাসা, ভালোবাসা। * বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে শক্তিশালী জাদু কোনটি?... ফুলের সৌরভ আর হৃদয়ের বন্ধনের যাদু। বন্ধুরা সত্যি! ইরানের রঙের উৎসবে আপনিও রঙিন হয়ে উঠবেন। এই রঙ সততার রঙ, এই রঙ দেশপ্রেমের রঙ, এই রঙ বন্ধুত্বের রঙ, এই রঙ প্রকৃতির রঙ, এই রঙ বাহারি সব ফুলের রঙ, এই রঙ ভালোবাসার রঙ। আর পারস্যের রঙের ছোঁয়ায় নিজেকে রাঙাতে প্রিয়জনসহ বেরিয়ে পড়ুন ইরান ভ্রমণে।

পারস্যের ফুলবনে

পারস্যের রাজধানী তেহরান। এ দেশের জনগণ ফার্সি ভাষায় কথা বলে। টাকাকে তারা তুমান বলে। তাদের জাতীয় নেতা ইমাম খোমেনি। দেশটির ইস্পাহান, কোম, কাশান, তেহরানসহ আরও কিছু প্রদেশ ভ্রমণের সময় লক্ষ করি চাকচিক্যময় আধুনিকতা আজকের পারস্যকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারেনি। তাইতো এখানকার পাহাড়, পর্বত, সবুজ উপত্যকা, ঘন জঙ্গল ও প্রবহমান নদীর ধারা মনকে মুগ্ধ করে দেয় আর রং-বেরঙের ফুলের নয়ন মাতানো সৌন্দর্য ও ঝর্ণাধারায় হৃদয় আকুল হয়ে উঠে ভালোলাগার আবেশে। ইরানের রাস্তা পুরোটাই পাহাড়ি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চারিদিক আমরা ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের উঁচুতে উঠেছিলাম। রাস্তা ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে। পাহাড়ের পাশ ঘেঁষেই রং-রেবঙের ফুলের নয়ন লোভন শোভা ও মৃদু গন্ধ। পাহাড়ের অপর পাশে বয়ে যাওয়া নদী। আমরা অনেকটা উপরে উঠে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে নেমে দাঁড়ালাম। চারদিকে কী অপূর্ব শোভা। দূরের পাহাড়ের চূড়াগুলো আবছা মেঘে ঢাকা। গাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াতে স্নিগ্ধ বাতাসের আদরে প্রাণ-মন জুড়িয়ে গেল। চোখের দেখার সঙ্গে হৃদয়ের অনুভূতির সংমিশ্রণ না ঘটলে সে দেখার আনন্দ অপূর্ণ থেকে যায়। দেখায় শুধু অবলোকন করা হয় কিছু অনুভব করা যায় না। তাইতো ইরান ভ্রমণে চোখের দেখার সঙ্গে মনের ভালোলাগার আবিরের সঙ্গে রাঙিয়ে প্রতিটি ক্ষণকে উপভোগ করেছি। তুঁত, আখরোট, আলু বোখারা, অন্যান্য ফলের গাছ আর নানান রঙের ফুলের বর্ণাঢ্য সমাহার মন

www.pathagar.com

কড়ে নেয় ইরান ভ্রমণে। ইরানে ৩টি ঋতুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে খানকার আবহাওয়া খুব দ্রুত বদলে যায়। তাই ইরান ভ্রমণের উপযুক্ত সময় াদের বসন্তকালীন সময়। ইরানে বেশ ফুলের প্রাচুর্য চোখে পড়ে। রং বেরঙের ুলের সৌন্দর্যের সাথে ইরানের কর্মবহুল ঘর-বাড়ি, প্রতিষ্ঠান পার্ক আরো সুন্দর দখায়। বসন্তকালে ইরানে সন্ধ্যাবেলায় হিমেল হাওয়া বইতে থাকে। কখনো খনো দিন পরিষ্কার থাকলে বরফ আচ্ছন্ন পর্বত চূড়ার দর্শনও মিলে। ইরানের গাটা পথটিই আশ্চর্য রকমের সুন্দর ও শ্বাসরুদ্ধকর। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ বয়ে উঁচুতে উঠতে উঠতে ক্রমেই আপনার মনে হবে এই বুঝি হারিয়ে যাচ্ছি মেঘেদের রাজ্যে।

ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণের পাল পারস্যের ফুলবনে দেখা মেলে

এমন আশ্চর্য নির্জন মনো শান্তির দেশ পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিন সন্দেহ। বাজার অর্থনীতির ডামাডোলে শান্তিটা এখনো হারিয়ে যায়নি এই আশ্চর্য রকমের নিরিবিলির দেশে। এখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা রেখে নিশ্চিন্তে প্রয়োজনীয় কাজের তাগিদে এদিক ওদিক যাওয়া যায়, কথায় কথায় আইন অমান্য করার অভ্যাস নেই পারস্যবাসীর। এখানে একে অপরকে ঠকানোর কথ কল্পনাই করতে পারে না কেউ। দেশটিতে নিষিদ্ধ রয়েছে যত্রতত্র ময়লা আবর্জন ফেলা আর গাড়ি পার্কিং করা। আর নিষেধ আছে- পরিবেশের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনা যেকোনো ধরনের কর্মকাণ্ড। আর এসব নিয়ম-কানুন ইরানিরা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলে। ইরানের ইস্পাহান প্রদেশ আশ্চর্য রকমের শান্ত আর নির্জন চারপাশ সবুজে ঢাকা, বাহারি সব ফুলের বাহার, ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে চলে ঝিরঝির করে। একেবারে কোলাহলহীন ইস্পাহানের কিছু দর্শনীয় স্থানসমূহ

www.pathagar.com

পাতা ঝরার শব্দটাও বড় কানে বাজে। ইরানের ইস্পাহানে এলে কোনো স্থাপনার চেয়ে... নির্জনতা আর প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে যাওয়া মানুষের বহমান জীবনই দেখার বিষয়। আর পর্যটন নগরী ইস্পাহান এমনই আশ্চর্য সুন্দর যে, কিছু না, কেবল পার্কে কাঠের বেঞ্চে চুপচাপ সারা দিন বসে ফুলে সৌরভে সুবাসিত হলেও মন প্রাণ ছুঁয়ে যাবে আপনার। বন্ধুরা ইস্পাহানে গেলে কয়েক দিন অবশ্যই কাটাবেন, প্রকৃতির অসামান্য সৌন্দর্য এমন প্রাণভরে উপভোগ করার সুযোগ সহজে মেলে না। সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক ভালো লাগার আবেশে মন জুড়িয়ে যায়। কেউ যদি কয়েকটি দিন নিরিবিলি ও শান্তিতে কাটাতে চান তবে দ্বিধা না করে ইরান চলে যেতে পারেন। এখানকার উদার আকাশ, নির্মল বাতাস, মন মাতানো রকমারি ফুলের প্রাচুর্য, নদীর কুল কুল রব, পাখিদের অবাধ বিচরণ মনপ্রাণকে ভরে দেয়। ইরানের পর্যটন নগরীগুলোয় পর্যটকদের জন্য বেশ ভালো ব্যবস্থা আছে থাকা খাওয়ার। আকাশ পথে স্বল্প খরচে ইরান যাওয়া যায় এয়ার এরাবিয়ায়। এছাড়া বিলাসবহুল আরো বিমান প্রতিষ্ঠানের বিমানেও যাওয়া যায় ইরান। দেশটিতে ইরানি মুদ্রা তুমান ছাড়াও আমেরিকান ডলারের ব্যাপক প্রচলন আছে। সুদীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ খুব উপভোগ করলাম উন্মুক্ত প্রকৃতির বুক ইরানে। প্রাণ ভরে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করলাম, ভেজালমুক্ত টাটকা খাদ্যসামগ্রী খেলাম।

পারস্যের ফুলবনে এমনই সব দৃষ্টিনন্দন প্রজাপতিরা দুষ্টুমীতে মগ্ন

পাহাড়-পর্বত-নদী- ঝর্ণার সাথে একাত্ম হয়ে বাহারি সব ফুলের মাতাল করা সৌরভে মাতোয়ারা হলাম। কোলাহল মুখর নগরীর বিষাক্ত কালো ধোঁয়ামাখা ভারি আবেষ্টনী হতে মুক্ত হয়ে ইরানে কাটানো বেশ কয়েক সপ্তাহ

www.pathagar.com

যেন মনে প্রাণে সত্যিকারের মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করলাম। মুক্তির আনন্দে এমন বিভোর ছিলাম যে, ঐতিহ্যের পারস্যের সৌরভে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলাম। নিজেকে সমর্পণ করেছিলাম ঐ মৌন পাহাড়, জায়েন রুদ নদী আর ঝর্ণাধারার কলগীতের কাছে। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে আত্মহারা হয়ে বারবার শুধু নতজানু হয়েছি সেই মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে- যিনি এই পারস্যকে কত সব রঙের ছোঁয়ায় বিস্ময়কর রূপে সৃষ্টি করেছেন। ইরান তার সমস্ত সৌন্দর্য, ফুলের সৌরভ, আকাবাঁকা পাহাড় পর্বত, সবুজের মাঝে নির্জনতা, আর বন্ধুত্বের বন্ধন নিয়ে যেন অপেক্ষা করে আছে আমার আপনার জন্য।

পারস্যের দৃষ্টিনন্দন ফুলবনে লেখক

পৃথিবীর মানচিত্রে আজারবাইজান, দুটি রয়েছে। একটি আজারবাইজান ইস্ট, আরেকটি আজারবাইজান ওয়েস্ট। এদের একটি কখনও সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার অংশ ছিল। বর্তমানে পৃথক রাষ্ট্র। আর অন্যটি পারস্যের একটি প্রদেশ। আর বর্তমান ইরানের ক্ষুদ্র অংশ জুড়ে পর্যটন নগরী আজারবাইজানের অবস্থান। বর্তমান সারাবছরই পর্যটকদের পদভারে মুখরিত থাকে ইরানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রদেশ আজারবাইজান। আজারবাইজানে একটি মুসলিম গ্রামে মোহাম্মদ রহিমের বাগানে এক ধরনের ফুল রয়েছে, যা আজানের ধ্বনিতে ফোটে। এই ফুল প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত আজানের ধ্বনিতে ফোটে। আজানের পর আবার বন্ধ হয়ে যায়। আজানের প্রতিটি বাণীর ছন্দে ফুলগুলো প্রস্ফুটিত হয়। ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব এবং এশা প্রত্যেক ওয়াক্তে আজানের বাণী যেন ফুলগুলোকে জাগ্রত করে ইবাদতের জন্য। আর তাই ফুলটির নাম দেয়া হয়েছে আজান ফুল। সৃষ্টি জগতে কত যে অদ্ভুত ফুল-

www.pathagar.com

ফল রয়েছে তার ইয়াত্তা নেই। প্রকৃতির অনেক অদ্ভুত আচরণ আছে। যার বৈজ্ঞানিক তেমন কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আর প্রকৃতির আচরণ যদি ধর্মীয় কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকে তবে বলতেই হয়, সৃষ্টিকর্তার কি অপার মহিমা! তেমনি এই ফুল যা আজানের ধ্বনিতে ফোটে। ইরান ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত সময় হচ্ছে তাদের বসন্তকালীন সময় অর্থাৎ মার্চ মাসের ২১ তারিখ থেকে পরবর্তী তিন মাস বসন্তকালীন ইরান প্রস্ফুটিত হয় আপন ঐতিহ্যে। আমরা আজন্ম বন্দি, বক্ষে চাপা নির্বেদের ভার- চলুন না ঘুরে আসি পারস্যের ফুলবনে। যেখানে শুধু ফুল আর ফুল। ফুল কে না ভালোবাসে। উত্তর একটাই- সবাই। ক্ষণস্থায়ী এই দৃষ্টিকাড়া ফুলের জন্য সবার রয়েছে দীর্ঘস্থায়ী ভালোবাসা। তবে বন্ধুরা প্রিয় মানুষটিকে নিয়ে ইরানের বসন্তকালীন উৎসবের দিনসহ বিশেষ বিশেষ দিনে রকমারি বাহারি সব ফুলের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ফুলের দেশ পারস্য থেকে ঘুরে আসুন। আর প্রিয়জনকে পারস্যের ফুলেল মেলায় ফুলেল উপহার দিন। আর তাইতো হাস্যোজ্জ্বল সাত রঙের ফুলের বাহার, পারস্যের ফুল বনের সৌরভে হারিয়ে যেতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বন্ধু তোমাকে, আংকেল আপনাকে আর ভাইয়া তোমাকেও, আর সাথে প্রিয়জনরাও যেতে পারো।

পারস্যের সৌরভ

Black rose = Enemy
White rose = Peace
Yellow rose = Friend
Pink rose = Special friend
Red rose = Very special friend

"ফুল অনেক হয় 'গোলাপ'- এর মতো নয়।
সৌরভ অনেক হয় 'পারস্যের' সৌরভের মতো নয়।

প্রকৃতি অনেক হয় 'ইরানের' শান্ত স্নিগ্ধ প্রকৃতির মতো নয়।" ফুল সুন্দরের প্রতীক, ফুল সম্প্রীতির প্রতীক। দেশে দেশে বিভিন্ন উৎসবে ফুলের ব্যবহার ব্যাপক। আদি যুগ থেকে এর প্রচলন। বিশ্বের অনেক দেশেই গোলাপ ফুল জন্মে থাকে তবে ইরানি সুগন্ধি এবং গোলাপের খ্যাতি সমগ্র বিশ্ব জুড়ে সমাদৃত। ইরানিরা ফার্সি ভাষায় ফুলের রানীকে 'গোলাব' বলে। পারস্যের সব জায়গায় মন মাতানো গোলাপ ফুলের সৌরভ মেলে। শুধু দেশটির কাশান প্রদেশে ব্যাপক হারে গোলাপ ফুলের চাষাবাদ হয়ে থাকে। ভালোবাসার সাথে গোলাপ ফুল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রিয়জনকে ভালোবাসার শুভেচ্ছা পাঠাতে গোলাপ ফুল অনন্য। আর এই গোলাপ ফুলের আছে আবার অনেক অর্থ। চলুন বন্ধুরা তা জেনে নি...

www.pathagar.com

- সাদা গোলাপ : নিরীহ আর খাঁটি ভালোবাসার প্রতীক।
- হলুদ গোলাপ : শ্রদ্ধা আর দায়িত্বশীলতার প্রতীক।
- গোলাপী গোলাপ : বন্ধুত্বের প্রতীক আর ভালোবাসা শুরু হবার সংকেত।
- লাল গোলাপ : নির্দেশ করে উত্তেজনা আর শারীরিক আবেগ ভরা ভালোবাসা।

বন্ধুরা এতো গেলো গোলাপ ফুলের রঙের ব্যবচ্ছেদ। তবে গোলাপ ফুল গুনে গুনেও অনেক কিছু প্রকাশ করা যায়। যা আমরা অনেকেই হয়তোবা জানি না। চলুন তবে জেনে নি...

- ১ টি গোলাপ... প্রথম দেখায় প্রেম।
- ২ টি গোলাপ... সাধারণ ভাব বিনিময়।
- ৩ টি গোলাপ... আমি তোমাকে ভালোবাসি।
- ৭ টি গোলাপ... তোমার প্রেমে পাগল।
- ৯ টি গোলাপ... আমরা সারাজীবন এক সাথে থাকব।
- ১০ টি গোলাপ... তুমি শুধুই আমার।
- ১১ টি গোলাপ... পৃথিবীতে তোমাকেই আমি সবচেয়ে বিশ্বাস করি।
- ১২ টি গোলাপ... প্রতিশ্রুতি দিলাম সবসময় কাছে থাকব।
- ১৩ টি গোলাপ... সারাজীবন বন্ধুর মতো কাছে থাকব।
- ১৫ টি গোলাপ... আমি দুঃখিত।
- ১৯ টি গোলাপ... আমি সারাজীবন বিশ্বাসী হয়ে থাকব।
- ২১ টি গোলাপ... আমি তোমার কাছে দায়বদ্ধ।
- ৩৬ টি গোলাপ... আমাদের ভালোবাসার মুহূর্তগুলো আমি সারাজীবন মনে রাখব।
- ৪০ টি গোলাপ... আমার পুরো হৃদয় দিয়ে আমি তোমাকে ভালোবাসি।
- ১০৮ টি গোলাপ... আমাকে জীবনসঙ্গী করবে?

বন্ধুরা একবার চোখ বুজে কল্পনা করুন তো, গোলাপ যার নাম সে কি শুধুই গোলাপি রঙের? কোনোটা লাল, কোনোটা সাদা, কোনোটা হলুদ, কোনোটা গোলাপি। চাই কি বেগুনি রঙের বা কালো রঙের বা অন্য সব বাহারি রঙের গোলাপ ফুল পাওয়া দুর্লভ নয়। ইরানের বসন্তকালীন সময়ে চারদিক জুড়ে গোলাপ ফুল বেশ ভালোই ফোটে। তাই এ সময়টিতে পরিবার-পরিজন কিংবা বন্ধুদের সাথে ইরান ভ্রমণে মুগ্ধ হবেন নিশ্চয়ই, আর প্রিয়জনের সাথে পারস্যের ফুলের সৌরভে হারিয়ে যাবেন প্রকৃতির কোলে। অত্যন্ত আকর্ষণীয় সব ফুলের দেখা পাবেন ইরান জুড়ে। দুই রঙা বড় জাতের গোলাপ 'ডাবল ডিলাইট'কে পছন্দ করতে পারেন চোখ বুজে। এরপর বেছে নিতে পারেন প্রিয়জনের জন্য...

www.pathagar.com

কেন্দ্রস্থল হলুদ ও কমলা রঙের পাপড়ির গোলাপ ফুল 'অ্যালেংকা'কে। কিংবা গাউস ফুলের হলদে কুসুম রঙের ইয়েলো গ্রান্ড মোগল জাতকে। আর যদি পদ্ম ফুল ফোঁটা গোলাপ নিতে চান তো আমি বলব, 'প্রিন্সেস ডি মোনাক্কা'কে বেছে নিতে। আর প্রিয়জন বেগুনি রঙের মায়াবী গোলাপ ফুল চাইলে পছন্দ করে ক্রয় করতে পারেন 'প্যারাডাইস' জাতটিকে। গোলাপ সকলের কাছে ভালোবাসার প্রতীক, তাইতো এর বিভিন্ন রঙ ভালোবাসার বিভিন্ন অর্থ বহন করে। টুকটুকে লাল গোলাপ প্রকৃত ভালোবাসার কথা বলে, হালকা রঙের গোলাপি গোলাপ প্রিয়জনের কাছে প্রিয়জনের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, আর ঝলমলে হলুদ গোলাপ 'বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট' অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফার্সি ভাষায় পারস্যবাসী ফুল কে 'গোল' বলে আর গোলাপ ফুল তাদের কাছে 'গোলাব' নামে পরিচিত। বসন্তকালীন সময়ে সমগ্র ইরানজুড়ে প্রদেশে প্রদেশে বাহারি সব ফুলের মেলা হয়, ইরানি ফুল চাষিদের একটি বিরাট অংশ শুধু দেশটির 'কাশান' প্রদেশে বাহারি সব গোলাপ ফুলের চাষাবাদ করে থাকেন। ফুল বাণিজ্যে দেশের গাহিদা মিটিয়ে বন্ধুদেশগুলোতে ইরানি ফুলের রপ্তানি হচ্ছে ব্যাপক হারে। আমার দৃষ্টিতে পারস্যের বাগ-বাগিচা ইরানিদের সুন্দর পরিকল্পনার এক অনন্য নিদর্শন। যেখানে পাহাড়-পর্বত, বিস্তৃত জলরাশি, দৃষ্টি নন্দন স্থাপনা, সেতু, চিড়িয়াখানা সব মিলিয়ে পারস্যের সৌরভের এক অপূর্ব ঐকতান সৃষ্টি করছে ইরান। তাইতো ইরানের চারপাশটা অসাধারণ আর অতুলনীয় দেশটিতে ভ্রমণকালীন অভিজ্ঞতা নিয়ে বলতে পারি... ইরানে প্রকৃতি বাড়ছে, প্রকৃতির মতো আর প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা জানানো পুরো ইরানবাসীর জীবনের সুন্দর এক অংশ।

পারস্যের ফুলবনে ইরানি কিশোরী সাকিনা ও জেহেরা

www.pathagar.com

পারস্যের ফুলবনে এমনই সব দৃষ্টিনন্দন ময়ূরের দেখা মেলে

বার্ডস ক্লাবে দেখা মেলে দেশি-বিদেশি প
পাখিদের জন্য এখানে গড়ে তোলা হয়েছে
তারই ফলশ্রুতিতে ম্যাকাও পাখি, ফ্লামিং গো
পেলিকেন পাখি, টিয়া, উটপাখি, কবুতর, গিঙ
নানা প্রজাতির পাক- পাখালির কলকাকলিতে
ব্রোঞ্জসহ নানা প্রকার মূল্যবান ধাতু এবং অন্যা
গড়ে তোলা হয়েছে হরেক রকম ভাস্কর্য। বন্ধুর
উন্মুক্ত কিছু পাখির কথা বলতে চাই আপনাদে
নাম : Phoenicopterus ruber, এরা কানঠুঁসি
লম্বায় ১৪৫ সেন্টিমিটার। ওজন ৪ কেজির ম
আভার মিশ্রণ। ওড়ার পালক সিঁদুরে লাল, ডান
অস্বাভাবিক লম্বা। পা গোলাপি লাল। পায়ের
লাগানো। বাঁকানো ঠোঁটের ডগা কুচকুচে কালে
পাখি দেখতে একই রকম। প্রধান খাবার কুঁ
ছোট শামুক, গুগলি, জলজ পোকামাকড়। কাদ

www.pathagar.com

উঁচু ঢিবির মতো বাসা বানায়। সূর্যের আলোতে কাদা শুকিয়ে শক্ত হলে বাসার ভেতর ঢুকে ডিম পাড়ে। কানঠুঁসি সারস আকৃতির পাখি। এ পাখিরা বেশিরভাগই লোনা জলে বিচরণ করে। দলবেঁধে একত্রে থাকতে পছন্দ করে, পাখিটির কর্কশ কণ্ঠে শোনা যায় 'ক্রেক... ক্রেক' শব্দের ডাক।

পারস্যের হাস্যোজ্জ্বল শিশু ছবির জন্য পোজ দিতে ব্যস্ত

বাগানটিতে মনের আনন্দে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় উটপাখি আর 'পেলিকন' পাখির দলকে। পুরুষ ও স্ত্রী পেলিকন পাখি প্রত্যেকটির ওজন ১৯ কেজির মতো। প্রতিদিন সকালে পেলিকন পাখির জোড়া ১০ কেজি মাছ খায়। ইস্পাহানের কৃত্রিম হ্রদে বোটিং করা যায়। পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইস্পাহানের মিউজিয়াম বাগিচায় গাছ দিয়ে তৈরি ভাস্কর্য। সমগ্র ইরানের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার কাছাকাছি সন্ধান মিলে অনেক সুন্দর সুন্দর দুষ্প্রাপ্য ভাস্কর্যের। একাধিক আকর্ষণ ইরানের ইস্পাহানে বারবার ফিরিয়ে আনে দেশি বিদেশি পর্যটকদের। এই আকর্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে ঝর্ণার কোল ঘেঁষেই এক পুকুর শ্বেত পদ্ম। পাশেই উঁচু নিচু সব পাহাড় পর্বত, নদী, ফল ফুলে ঘেরা নীরব সবুজ প্রকৃতি আর পাখিদের মিষ্টি মধুর গুঞ্জন। ইস্পাহানের পাহাড়ের কোল ঘেঁষেই কৃত্রিম ঝর্ণা তার পাশেই গোলাকার ফুটন্ত শ্বেত পদ্মের পুকুরটি, যেন পুকুর নয় পদ্ম বাগান। শ্বেত পদ্মের ইংরেজি নাম হোয়াইট লোটাস। পদ্মফুল যারা ভালোবাসেন, তাদের কাছে সাদা পদ্মতো আরও মনোমুগ্ধ ব্যাপার। টলটলে জলের উপর লালচে সবুজ পাতার মাঝে ঢাউস আকারের শ্বেতপদ্ম, তাও আবার ইরানে, এর চেয়ে মন মাতানো দৃশ্য মনে হয় খুব কমই আছে। তাও আবার একটি দুটি নয়, অসংখ্য। বন্ধুরা বলুন... এমনসব মনোমুগ্ধকর দৃশ্য সহজে কি

www.pathagar.com

কোথাও দেখা যায়, পাওয়া যায়! পারস্যে শীত শেষে আসে বসন্ত। তাইতো বসন্তকালীন সময়ে ইরান ভ্রমণে চোখ ধাঁধানো বসন্তের সব হাস্যোজ্জ্বল বাহারি ফুল মৃদু হেসে স্বাগতম জানায় আমাদের। শীতে পাতাঝরা গাছগুলো কচি পাতা আর ফুলে ফুলে ভরিয়ে দেয় বসন্তের ইরানকে। বলতে গেলে প্রায় বসন্তের শুরু থেকেই দেশটির বেশকিছু বড় বড় দেশি ও কিছু বিদেশি গাছে ফুল ফুটতে থাকে। একেবারে নিঃশব্দে নয়, বেশ যেন ঘটা করেই সেটা ঘটে। অবস্থা দেখে মনে হবে, এ কোন ফুলের দেশে এলাম আমরা। ফুলের বাগানকে ইরানিরা 'গুলিস্তান' / 'গোলিস্তান' বলে, আর সুন্দরকে বলে 'খুশদিল'/ 'খুবসুরাত', 'Zarang' (জারান) এই ফার্সি শব্দটি বুদ্ধিমান অর্থে ব্যবহৃত হয়, এছাড়া 'Shab' (শাব)-কে ইরানি বন্ধুরা রাতি বলে। এই সকল শব্দ আমরা বাংলাদেশিরা দৈনন্দিন কাজে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে থাকি।

পারস্যের তরুণ ডাক্তারের সাথে লেখক

বাংলার বীর নবাব আলিবর্দী খানের জন্মভূমি আজকের ইরান-এ, সেই সুদূর ইরান থেকে বাংলায় এসে তৎকালীন দু'বাংলার রাজধানী মুর্শিবাদে অবস্থান নেন এবং অল্প কিছু দিনেই ভাগ্য তার সাথে হয়ে দেখা দেয়, হয়ে যান বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব। তাঁর নবাবি আমলে অতি আদরের নাতি সিরাজউদ্দৌলার বিবাহতে অতিথিদের প্রত্যেককে পারস্যের সুগন্ধি উপহার হিসেবে দিয়ে পারস্যের সৌরভে মাতিয়ে দেন সকালকে। শুধু এখানেই শেষ নয় নাতির বিয়েতে এসেছিলেন পারস্যের নামি দামি ব্যক্তিত্ব। বিবাহ উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখলেন ইরানি বিখ্যাত সব শায়ের কবি। নাতি এবং নাতি বৌ সিরাজউদ্দৌলা- লুৎফার স্বপ্নের প্রাসাদ 'হিরাঝিল' নির্মাণে ভালোবাসার হাত

www.pathagar.com

বাড়িয়ে ছিলেন নানা নবাব আলিবর্দী খান। তাইতো 'হিরাঝিল' নির্মাণে পারস্যের কারিগররা সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করল তাঁর নবাবি আমলে। নির্মাণ শেষে দৃষ্টি নন্দন এই প্রাসাদটির সৌন্দর্যকে আরও ফুটিয়ে তুলতে হিরাঝিলের চারপাশ ঘিরে তৈরি করা হলো বাগবাগিচা। এই বাগবাগিচায় প্রাধান্য পেল পারস্যের সৌরভ। সিরাজউদ্দৌলার প্রিয়তমা স্ত্রী- বেগম লুৎফুন্নিসা পারস্যের প্রকৃতি থেকে নির্যাসিত বিশেষ সৌরভ গায়ে মেখে নিজেকে সুরভিত করতেন। ঐতিহ্যে ভরা পারস্যের ইতিহাসের মতো সুগন্ধ ব্যবহারের ইতিহাসও অতি প্রাচীন। অতীতে মৃত ব্যক্তির আত্মার শ্রদ্ধাঞ্জলিতে ব্যবহৃত হতো নানারকম সুগন্ধ। দেহের নানা রকম অসুখে ব্যবহার করা হতো সুগন্ধি মলম। এছাড়া অনেক গাছ-গাছড়া, ফল, ফুলের নির্যাসের ধোঁয়ায় নানারকম কীট-পতঙ্গ শ্বাপদ বিতাড়িত হতো। রসায়ন বিজ্ঞান আবিষ্কারের বহু আগেই সুগন্ধ'র প্রচলন শুরু হয়েছিল প্রাচীন ইরানে। পবিত্র স্থানসমূহে সুগন্ধ ব্যবহার পারস্যে এখন যেমন রয়েছে তেমনটি অতীতেও ছিল। ধর্মীয় স্থানকে সুগন্ধ সৌরভে ভরিয়ে দিতে প্রাচীন ইরানে কয়েকটি গাছের নির্যাস পোড়ানো হতো এতে ধর্মীয় স্থানটি ভরে যেতো সুগন্ধের সৌরভে। ঐতিহাসিকদের মতে, পারস্যে নারীর চেয়ে পুরুষেরাই যুগে যুগে সুগন্ধ'র ব্যবহার বেশি করেছে। প্রেম ভালোবাসা আর যুদ্ধের সাথে সুগন্ধর সম্পর্ক বেশ নিবিড়। তাই লুৎফুন্নিসার নৌকা যখন ভাগিরথী নদীতে ভেসে যাচ্ছিল তখন বাতাসের দারুণ সুরভিতে আমোদিত হয়ে উঠেছিলেন বাংলার যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলা। প্রিয়জন প্রিয়জনকে আকৃষ্ট করতে সুগন্ধির সাহায্য নিয়েছে বহুবার। আবার বাংলার বীর নবাব আলিবর্দী খান যুদ্ধে যেতেন পারস্যের বিভিন্ন সুগন্ধি নিয়ে। এটা নাকি তাঁর ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতো আর যুদ্ধে উৎসাহ যোগাত। আবার সুগন্ধিপ্রেমী নামে লুৎফুন্নিসার কাছে পরিচিত ছিলেন বাংলার বীর পুত্র সিরাজউদ্দৌলা। নবাব আলিবর্দী খানের নবাবি আমলে ফ্রান্স থেকে আগত সেনাপতি সিনফ্রে দুধে গোলাপের পাপড়ি ফেলে আর পারস্যের সুগন্ধি মিশিয়ে তাতে গোসল করতেন এবং প্রচুর পারস্যের সুগন্ধ গায়ে মাখতেন। সেইসব দিনগুলোয় 'হিরাঝিল' প্রাসাদের কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠানে পায়রা, আবাবিল, টিয়া, কাকাতুয়া, ময়ূর বা অন্য কোনো পাখিদের পারস্যের সুগন্ধির তরলে ভিজিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হতো হল ঘরে। আর এতে সুন্দর স্নিগ্ধ গন্ধের পারস্যের সৌরভে ছেয়ে যেতো, বাংলার যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলার স্বপ্ন রঙে সাজানো 'হিরাঝিল'- প্রাসাদ। পারস্যবাসীর কাছে ফুলের গন্ধযুক্ত গোলাপ, নার্সিসাস, জেসমিন, লিলি অফ- দ্য ভ্যালি, কারনেশন, হায়াসিন্থ, লাইল্যাক, গার্ডিনিয়া, কমলালেবুর ফুলের সুগন্ধি বেশ জনপ্রিয়। এক সময়ের বিখ্যাত 'ইন্টিমেট' ছিল উডি পারফিউম। চন্দন কাঠ, সিডার কাঠ, গুইয়াক কাঠ প্রভৃতির সুগন্ধ থেকে তৈরি হয় এই পারফিউম। এছাড়া ওরিয়েন্টাল ফ্যামিলি, এটা অনেকটা মিশ্রজাতের পারফিউম। এতে উডি, মসি এবং স্পাইসি নোটের সাথে মিশেছে ভ্যানিলা ও বালসামের মিষ্টত্ব। ওরিয়েন্টাল নোটটিকে ফুটিয়ে তুলতে

www.pathagar.com

মাস্ক, সিভেট বা অ্যাম্বার নোট ব্যবহার করা হয়। এগুলো সুগন্ধিও রয়েছে পারস্যবাসীর পছন্দের তালিকায়। সুগন্ধির প্রতি ভালোলাগা আর ভালোবাসাই বলে দিচ্ছে পারস্যবাসী কতটা রুচিশীল এবং আধুনিক। একদা পারস্যের সুরভি ছিল সারা দুনিয়ার স্বপ্ন। তারাই রুচিবান নাগরিককে উপহার দিয়েছেন আতরের ব্যবহার। সুরভি আর রোমান্টিসিজম চিরকালই মিলেমিশে একাকার। লুৎফা অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন কিন্তু তার জাদুকরী ব্যক্তিত্ব ও তীব্র আকর্ষণীয় ক্ষমতা তখন অপ্রতিরোধ্য। আর সেই গোপন চৌম্বক ক্ষেত্রের অনেকটাই জুড়ে ছিল সুগন্ধি। তাঁর স্বর্ণ তরণীর পালটি ছিল সুগন্ধের আকর। সোনাঝরা চাঁদনী রাতে প্রায়ই ভেসে যেত লুৎফার সোনার তরী। সেই দৃশ্য যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলাকে ভ্রান্তি জাগাতো একি স্বপ্ন না মায়া? কিন্তু প্রায় এক মাইলব্যাপী ভাগীরথী নদীর সমীরণই বলে দিতো অনেক না বলা কথা। ঋতুভেদে বিভিন্ন উৎসবে পারস্যের ফুল ও চন্দন ছিল লুৎফার প্রিয় প্রসাধন। সুগন্ধি অলঙ্কার পরা ছিল সে সময়ের ফ্যাশন। যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রী বেগম লুৎফুন্নিসা হেঁটে গেলে সবাই বলতেন পদ্মগন্ধা। লুৎফার সাতনরী হার হাতে নিয়ে শুঁকে দেখতো অনেকেই। আতর-চন্দনের গন্ধ লেগে থাকতো সেই গহনায়। সুগন্ধে ভুরভুর করতো চারদার। গ্রীষ্মের দহন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য লুৎফুন্নিসা স্নান করতেন পারস্যের সুগন্ধি জলে। তারপর চন্দনচর্চিত দেহে, নানাবিধ দ্রব্যে প্রসাধন সেরে নিজেকে সজ্জিত করতেন কুসুম আভরণে। এমন গন্ধ বিলাস শুধু সেকালের নয়, সুগন্ধির ওপর পারস্য ও বাংলার নারীদের আকর্ষণ জন্মজাত। লুৎফার নিজের ব্যবহৃত নানা সুগন্ধির মধ্যে চন্দন ও কস্তুরির নিজস্ব গন্ধতো ছিলই। তাছাড়া তিনি জটামাংসী নামে এক প্রকার গাছের শেকড় দিয়ে তাঁর পোশাককে সুগন্ধি করে নিতেন। তবে যেভাবেই বলা হোক না কেন সর্বপ্রথম আধুনিক প্রসাধন হিসেবে সুগন্ধের প্রচলন শুরু পারস্যে। যেখান থেকে সারা বিশ্ব গ্রহণ করেছে সুগন্ধ চর্চা। আতর তৈরির সবচেয়ে পুরনো জায়গা হলো ভারতের 'মুর্শিদাবাদ'। মুঘল আমল থেকে এখানকার আজগর হোসেনের তৈরি গোলাপি আতর ভুবন বিখ্যাত। গোলাপি আতর এখনো মুসলিম বিবাহের আবশ্যক অঙ্গ। পারস্যের নারী নূরজাহানের রক্তে মিশে ছিল সুগন্ধের সাহায্যে প্রসাধন চর্চা। তৎকালীন একটি লেখা থেকে জানা যায়, ৩০ কেজি গোলাপের নির্যাস সংগ্রহ করে তার সঙ্গে ৫ কেজি চন্দন তেল মিশিয়ে এক মাসের মাথায় পাওয়া যেত ৫ কেজি আতর। আর তা ছিল পারস্য সুন্দরী নূরজাহানের অন্দর মহলের মাত্র কয়েক দিনের বরাদ্দ। সে সময় ঘোড়ার লেজেও লাগানো হতো দামি আতর। ইরানে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে উৎসবের আমেজ আনতে যে উপকরণটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হচ্ছে সুগন্ধি। পারস্যবাসী উৎসবের সময় কেশ বিন্যাস, পোশাক আশাক এবং প্রসাধনের পাশাপাশি সুগন্ধি ব্যবহারে বেশ যত্নশীল এবং সচেতনতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। সে যা হোক, নিজের ব্যক্তিত্ব আর সুষমা বাড়িয়ে দিতে সুগন্ধির বিকল্প নেই। এছাড়া মুড অথবা ইমেজ অনুযায়ী নিজেকে

www.pathagar.com

প্রকাশনা করতে সুগন্ধ সহযোগী ভূমিকা পালন করে। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে কিছু রোগ আছে যা সারাতে সুগন্ধিকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইরানিদের কাছে উৎসবের আমেজে গাঢ় সুগন্ধি বা ঐতিহ্যবাহী সনাতন তীব্র সুবাসই বেশি মানানসই। তবে দেশটির বিভিন্ন প্রসাধনি প্রতিষ্ঠান, পারস্যবাসীর পছন্দ হিসেবে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন সুগন্ধি বের করে। আর নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী বাছাই করে নেয় সে দেশের তারুণ্য।

ফুল ও সুগন্ধির পাশাপাশি পারস্যের সৌরভে মিশে আছে দেশটির তারুণ্য। ত্বক পোশাক, ব্যক্তিত্ব-এসব ক্ষেত্রেই ইরানি তারুণ্যের নান্দনিকতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। যেকোনো নতুন ফ্যাশনকেই নিজস্ব স্টাইলে যোগ করে নিতে ২য় বার ভাবে না দেশটির তরুণ সমাজ। নানা রকম গয়না পরার ফ্যাশন টাও তাই তাদের মধ্যে বেশি প্রচলিত। ফ্যাশন সচেতন তরুণরা শুধু কেতাদুরস্ত পোশাকেই সন্তুষ্ট নয়, নানা রকম গয়না পরাটাও তাই বাদ যাচ্ছে না আজকাল। হাল ফ্যাশনের বেলায় তা যেন একটু বেশিই। ব্রেসলেট, চেইন থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সবই রয়েছে পারস্যের নতুন প্রজন্মের ফ্যাশন ভাবনায়। ব্রেসলেটের বেলায় টিন এজারদের পছন্দের পরিধিটা বেশ চওড়া। স্টিল, পিতল, নিকেল, মেটাল, রুপা থেকে শুরু করে সুতা, বিডস, মোটা কাপড় সবই আছে এ তালিকায়। একসঙ্গে বেশকিছু কালো রাবারের ব্যান্ড বা লালসুতা পরাটাই এখন টিন এজারদের সবচেয়ে বেশি পছন্দ। বিডস বা কাঠের মোটা ব্রেসলেটও অবশ্য পিছিয়ে নেই। একটু বয়স্কদের বেলায় ফ্যাশনটা ঝুঁকছে মেটালের মোটা ব্রেসলেটের দিকেই। কালো সুতা অথবা রুপার চেইনে ঝোলানো যেকোনো লকেট এখানকার তরুণদের প্রথম পছন্দ। পারস্যের ফ্যাশনের পালে হাওয়া লেগেছে যুগপৎভাবে। মেয়েরা শালিন স্টাইলে নিজস্বতায় নিজেকে প্রকাশ করছে, তো ছেলেরা ফ্যাশনের ধারাবাহিকতায় মেলে ধরছে নিজস্বতা। এভাবেই যা এতদিন ছিল অভ্যাস, এখন তা বদলে গিয়ে রূপ নিয়েছে ফ্যাশন অনুষঙ্গে। হাতে ব্রেসলেট, গলায় লকেট এগুলো এখানকার ছেলেদের মানিয়ে যাচ্ছে বেশ। দেশটির তারুণ্য সুন্দর সুস্বাস্থ্য এবং আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী। তাঁদের নম্র ব্যবহার এবং মিষ্টি হাসিতেই পারস্যের সৌরভের সুবাস পাওয়া যায়। হেভি মেটালের গয়না দেশটির টিন-এজার বা তরুণদের পছন্দের উপষঙ্গ। রাশি অনুযায়ী নামিদামি পাথর নির্বাচন করে রুপোর আংটি বা লকেট পরতে পছন্দ করেন ইরানি সমাজ। আর সানগ্লাস বা চশমার ফ্রেমে আভিজাত্য আনতে দেশটির নতুন প্রজন্ম রুপার প্রলেপ ব্যবহার করে থাকেন। তাদের ঘড়ির ডায়ালেও দেখা যায় রুপা ও হীরা। দেশটির তারুণ্যের ফ্যাশনে ভিন্ন সব চমক দেখতে পাই। অনেক তরুণ গলায় মাওলানা স্কার্ফ পরে নিজ ফ্যাশনের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। তবে যত যাই হোক দেশটির ইতিহাস, ঐতিহ্যের ছোঁয়া তারুণ্যের ফ্যাশনে লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে তাদের শতভাগ দেশপ্রেম সত্যিই লক্ষণীয়, সকলের কাছে।

www.pathagar.com

ঐতিহ্যের ছোঁয়ায় ইন্ডিয়া
বীর দেশপ্রেমিক সিরাজউদ্দৌলার জন্মভূমিতে

বাংলার স্বাধীনতার নাম নিলেই যার নাম উচ্চারণ অনিবার্য হয়ে উঠে, তিনি হচ্ছেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ও স্বাধীনতার প্রথম শহীদ বীর নবাব সিরাজউদ্দৌলা। চার চারটি যুদ্ধের সফল অধিনায়ক, স্রেফ একটি বিশ্বাসঘাতকতার যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। তারও নায়ক তিনি। কখনও কখনও দেখা যায় বিশাল কিছু জয়েও রয়ে যায়, হেরে যাওয়ার ব্যথা বেদনা। আবার এরকমও দেখা যায় বিশাল কিছু হারিয়েও সে ব্যক্তি হয়ে যান হৃদয়ের ভালোবাসায় অমর। যেমনটি আমাদের নবাব সিরাজউদ্দৌলা লাল সবুজের হৃদয়ে হৃদয়ে আজও অমর হয়ে আছেন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ নামের যে মর্মস্পর্শী নাটক অভিনীত হয়েছিল, সেই পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় কেবল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের পতন হয়নি, অবসান হয় বাংলার স্বাধীনতার। পলাশীর যুদ্ধে চূড়ান্ত যবনিকাপাত ঘটে ২রা জুলাই সিরাজকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার মাধ্যমে। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার রক্তস্রোত সেদিন বাংলার মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। দেশপ্রেমিক যুবক সিরাজ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকল চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়েছিলেন। অবশেষে আপন বক্ষ নিঃসৃত রক্তে রঞ্জিত করেছিলেন বাংলার মাটি। সিরাজ ছিলেন বাংলার স্বাধীনতার সূর্য। তাঁর পরাজয় ও নির্মম হত্যার পরিণতিতে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয় ১৭৫৭ সালে।

মুর্শিদাবাদ বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এক নাম। এককালে এটি ছিল বাংলার রাজধানী। বাংলার স্বাধীন নবাব ও তাঁর আপনজনদের নিয়ে যতো ইতিহাস, গল্প গাঁথা প্রচলিত, অনেক কিছুই শুনেছি দেখেছি নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে। বেশ কয়েকবার ঘুরে এসেছি মুর্শিদাবাদ। তাইতো পাঠক বন্ধুদের জন্য নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ৯ম বংশধর (এস.জি. আব্বাস) হিসেবে তুলে ধরেছি আমি সেইসব দিনের সেইসব কথা..... ১৭২৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সিরাজউদ্দৌলা নামক ফুটফুটে সুন্দর ১ ফুল ফুটল বাংলার বাগিচায়। সেই থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত সিরাজউদ্দৌলা শুধু ১টি নাম নয় ... লাল সবুজের হৃদয়ও বটে। যুবরাজ সিরাজ যখন নবাব হলেন তখন সুদূর কারবালা ও মদিনা থেকে মাটি এনে প্রথমে নৌসেরী বানুর সমাধি মসজিদে রাখা হয়। পরে সিরাজ সেখান থেকে সোনার ঝুড়িতে করে খালি পায়ে সেই মাটি এনে মুর্শিদাবাদে মদিনার ভিত্তি স্থাপন করেন। নির্মাণকালে এর দরজাটি বহু মুল্যবান রত্ন খচিত ছিল, যা ইংরেজদের যোগসাজসে মীরকাশিম কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। চুন সুরকির গাঁথুনি যুক্ত এই মদিনা মসজিদটি সপ্তদশ শতকের মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন।

www.pathagar.com

হাজার দুয়ারী ভবন ও ইমামবারা মসজিদের মাঝখানে সিরাজের স্বপ্ন রঙে তৈরি মদিনা মসজিদ। সিরাজউদ্দৌলার মাতা আমিনা বেগম মানাত করেন যে তার ছেলে যদি নবাব হন তাহলে কারবালার প্রান্তর থেকে মাটি এনে মুর্শিদাবাদে মদিনা মসজিদ তৈরি করবেন। আর তাই সিরাজ নবাব হয়ে তাঁর প্রিয় মাতার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেন মদিনা মসজিদ তৈরি করে। আমাদের এই হৃদয়ের নবাব বাংলার মাটিতে মিশে আছেন খোশবাগে। এর অবস্থান লালবাগ নদীর খেয়া পার হয়ে ২ কিলোমিটার পর ভাগীরথী নদীর অপর তীরে। আলিবর্দী খাঁ তাঁর জীবনে নিজ সমাধির জন্য তৈরি করেছিলেন এই খোশবাগ। চার দিকে উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত। আগে নাম ছিল খোশবুবাগ, যার অর্থ সুগন্ধি বাগান। সে সব দিনগুলোয় নানা ফুলের সুগন্ধে ভরে যেত এ বাগানটি। 'খোশবাগে' আছে নবাব আলিবর্দী খাঁ, তাঁর প্রিয় নাতি সিরাজউদ্দৌলা, নাতি বৌ বেগম লুৎফুন্নিসা, সিরাজ কন্যা উম্মে জোহরাসহ একই পরিবারের অনেকের সমাধি। জাফরাগঞ্জের অপর পারে রয়েছে নবাব সিরাজউদ্দৌলার স্বপ্ন রঙে তৈরি 'হিরাঝিলে' এর অবশিষ্টাংশে। সিরাজকে হত্যার পর দীর্ঘকালের অযত্ন এবং অবহেলায় 'হিরাঝিলে'-র অনেক কিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে। সিরাজ শহীদ হওয়ার পর বেগম লুৎফুন্নিসা আরো ৩০ বছর জীবিত ছিলেন এবং প্রতিদিনই কন্যা উম্মে জোহরাসহ স্বামীর কবরে গিয়ে কান্নাকাটি করতেন, পবিত্র কোরআন পাঠ ও দোয়া দুরূদ করতেন, মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালাতেন। আর এভাবেই স্বামীর কবরে মাথা রেখে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে ১৭৮৬ সালে ১০ নভেম্বর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। খোশবাগে স্বামীর ঠিক পায়ের নিচে বেগম লুৎফুন্নিসার শেষ ইচ্ছায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। মুর্শিদাবাদ থেকে সামান্য দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে প্রাচীর বেষ্টিত সমাধি ভবনে চির নিদ্রায় শায়িত লাল সবুজের হৃদয়ের নবাব সিরাজউদ্দৌলা। পাশে তাঁর প্রিয় নানাজান আলিবর্দী, প্রিয়তমা স্ত্রী বেগম লুৎফুন্নিসার কবরও একই সমাধি ভবনে। আজো ভাগীরথীর পানি কুল কুল শব্দে বয়ে যায় সমাধি ভবনের পাশ দিয়ে। প্রত্যহ নিশিথে নির্মল নীলাকাশ থেকে ঝরে পড়ে বিন্দু বিন্দু শিশির অশ্রু হয়ে, যেন সারারাত হাজারো তারার চোখের জলে স্নাত হয় সমাধি। ঐতিহাসিক নির্দশন দেখতে এসে ভ্রমণকারীরা হতভাগ্য সিরাজের করুণ পরিণতির কথা ভেবে ফেলেন চোখের জল। এক অব্যক্ত বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে তাদের হৃদয় মন। মীরজাফরের প্রাসাদের যে কক্ষে নবাব সিরাজকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল তা এখন আর নেই, আছে সেই কক্ষের ধ্বংসবিশেষ। আজো স্থানীয় লোকেরা ঐ ধ্বংসস্তূপকে দেখিয়ে বলে 'নিমকহারামীর দরওয়াজ'। কারণ যে মীরজাফর নবাব আলিবর্দী ও নবাব সিরাজের অনুগ্রহে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল সেই মীরজাফরই নিরপরাধ দেশপ্রেমিক সিরাজকে নিজ প্রাসাদে বন্দি করে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে। আজো নবাব সিরাজের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ দেশি-বিদেশি অসংখ্য মানুষ পরিদর্শন করতে আসেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন নবাবের করুণ পরিণতির জন্য, অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে দর্শকের শোককাতর চোখ। নতুন প্রজন্মের

www.pathagar.com

সিরাজভক্তরা দেখতে পান নিমকহারামীর দরওয়াজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ১টি নিম গাছ, তারই পার্শ্বে রয়েছে ১টি 'শোক নহবৎখানা'। প্রতি সন্ধ্যাবেলা নবাব সিরাজের করুণ স্মৃতিকে স্মরণ করে নহবৎখানার সানাইবাদকেরা গভীর শোকাচ্ছন্ন সুর বাজিয়ে থাকেন। পাঠক বন্ধুরা আপনারার মুর্শিদাবাদ ভ্রমণে আরও দেখে আসতে পারেন, ফারিদুন যা দ্বারা নির্মিত হাজার দুয়ারি প্রাসাদের সামনে অবস্থিত অপূর্ব সুন্দর কারুশৈল্পের তৈরি বড় ইমামবাড়া। নবাব সিরাজউদ্দৌলা নির্মিত সুন্দর, কারুকার্য খচিত কাঠের তৈরি ইমামবাড়ায় মহররমের মূল উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। ইংরেজদের দ্বারা আগুন লাগিয়ে, আগুনে সেটা পুড়ে যাওয়াতে বড় ইমামবাড়া তৈরি হয়। যা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বৃহত্তম এবং অপূর্ব সুন্দর একটি স্থাপনা। কাঠগোলার বাগানে দেখতে পাবেন বীর সিরাজের ভাস্কর্য, আরও আছে নবাব সিরাজউদ্দৌলা মিউজিয়াম, সাদা মসজিদসহ বেশকিছু উল্লেখযোগ্য স্থাপনাসমূহ।

পলাশীর যুদ্ধের ২৫০ বছর পূর্তিতে ২০০৭ সালে বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান পিপলস ফোরাম পলাশীর প্রান্তরে মনুমেন্টের বাঁ পাশে ১টি স্তম্ভের ওপর নবাব সিরাজউদ্দৌলার আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করে। স্মারকস্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে পরদেশ গ্রাসীদের বিজয়স্তম্ভ নয়, সিরাজ, মীর মর্দান মোহনলালের নাম হোক অক্ষয়। একটু সামনেই রয়েছে মীর মর্দানের সমাধিস্থল। এ সমাধিস্থলে শায়িত আছেন সিরাজের আরও দুই বীর, কমান্ডার বাহাদুর আলী খান ও ক্যাপ্টেন নৌয়েসিং হাজরা। আজও সিরাজের তিন অমর বীরের সমাধি দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার পলাশী প্রান্তরে। নদীয়ার পলাশীর সেই ইতিহাসখ্যাত আমবাগান ঘেরা প্রান্তর বাংলাদেশের মেহেরপুরের মুজিবনগর থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরে। ২৩ জুন মীর মর্দানের মৃত্যুবার্ষিকী তাই বাঙালি জাতি এই দিনে নবাবের এই বীরকে স্মরণ করে। বর্তমানে পলাশীর হৃদয়ের ঠিক মাঝখানে, পৌনে দু'হাত উঁচু দেওয়াল দ্বারা ঘেরাও, উত্তর দক্ষিণে পৌনে চার হাত লম্বা সিমেন্টের চত্বর, এই চত্বরের দেড় হাত অভ্যন্তরে দুই হাত উঁচু লাল ইটের ১টা বেদী। বেদীর মাঝ খানে ৩টি স্তম্ভ। মাঝখানের স্তম্ভটি অন্য দুটির চেয়ে উঁচু। ১টিতে খোদাই করা মীর মর্দানের নাম, মীর মর্দানের স্তম্ভের ডানে নৌয়েসিং হাজরা, বামে বাহাদুর আলী খানের স্তম্ভ। পুরো চত্বরে উর্ধ্বাংশে খোলা। চত্বর ও স্তম্ভের নির্মাতা নদীয়া সিটিজেনস কাউন্সিল। ১৯৭২-৭৩ সালে তারা তাদের স্বাধীনতার সিলভার জুবিলি উপলক্ষে এই চত্বর নির্মাণ করে। এই স্তম্ভ চত্বরের পশ্চিমে কোণায় ১টি ঘন সবুজ নিমগাছ। আর উপরে নীল পাথরের মতো জমাট আকাশ মৌন।

কীভাবে মুর্শিদাবাদ যাবেন : কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পথ দুটি, সড়ক ও রেলপথ। উল্টো ডাঙ্গা বাস টার্মিনাল থেকে সরকারি বাস যায় মদিনা মসজিদ পর্যন্ত। রেলপথে শিয়ালদা থেকে ট্রেনে চড়ে মুর্শিদাবাদ স্টেশনে নামবেন। বর্ধমান, দুর্গাপুর থেকেও সড়ক ও রেলপথে যাতায়াতের সুব্যবস্থা আছে।

www.pathagar.com

কীভাবে বেড়াবেন : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব আবাস আছে। এছাড়াও সীমিত খরচে থাকার মতো বহু হোটেল পাবেন। দরদাম ঠিক করে সমগ্র মুর্শিদাবাদ ঘুরে দেখার জন্য টাঙ্গা, ঘোড়াচালিত টমটম গাড়ি, প্রাইভেট গাড়ি ইত্যাদি ভাড়া নিতে পারেন।

পলাশী : কলকাতা থেকে বাস অথবা শিয়ালদা-লালগোলা লাইনের ট্রেনে পলাশী যাওয়া যায়। পলাশীর প্রান্তরে ঘুরে দেখার জন্য রিক্সা ও ভ্যান উত্তম। ঢাকা থেকে ভ্রমণ করতে ইচ্ছুকরা মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনে করে কলকাতা পর্যন্ত যেতে পারেন, তারপর সেখান থেকে পলাশী এবং মুর্শিদাবাদ যাওয়ার বিভিন্ন যাতায়াত মাধ্যম সহজেই নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে আর দেরি না করে ঘুরে আসুন বন্ধুরা... সিরাজউদ্দৌলার দেশে। (দৈনিক সমকাল, শৈলি- ১৮.৯.২০১৩ এবং দৈনিক সমকাল, শৈলি- ১৭.৯.২০১৪)

দার্জিলিং

স্বীকার করুন আর নাই করুন- মানুষ কিন্তু চিরদিনই ভ্রমণ পিপাসু। প্রতিটি মানুষের মনের গভীরে রয়েছে কল্পনাবিলাসী ভ্রমণপ্রিয় মন। চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট কিংবা বগুড়া দেখার পর ইচ্ছে করবে বহির্বিশ্ব ভ্রমণ করার। আর ভ্রমণেই খুঁজে পাওয়া যায় অন্য রকম বাঁচার আনন্দ। তাইতো 'Shab' ফ্রেন্ডশিপ গার্ডেনের বন্ধুরা বাংলাদেশের সীমান্ত পেরিয়ে পা রাখল দার্জিলিং ও ভুটান। রাতে গাবতলী থেকে যাত্রা শুরু। ভোর নাগাদ বুড়িমারি বর্ডারে পৌঁছে ইমিগ্রেশনে নেয়া হলো। চ্যাঙারাবান্দা থেকে প্রথমেই জয়গার উদ্দেশে রওনা। মাঝখানে জলপাইগুড়িতে খানিকটা ক্লান্তি ঝরানো হলো। ক্ষুধা নিবারণের সাথে চা বাগানের শৈল্পিক দৃশ্যও উপভোগ করলাম। এবার গন্তব্য ফুটসিলিং। ভুটানের এ অংশে পৌঁছতে ভিসা লাগে না। এখানে রয়েছে রাজপ্রাসাদ (যা রাজার বোনের) ও বৌদ্ধ মন্দির। ফুটসিলিং এর প্রধান আকর্ষণ কুমিরের ফার্ম। নানান আকৃতির কুমির যা পর্যটকদের জন্য দৃষ্টি নন্দনিও। পাহাড় ঘেঁষে চলেছে নদী। নদীর পানির চঞ্চলতা দেখে গোধূলি লগ্নে হোটেলে ফেরা হলো। রাতে চলল কেনাকাটার ধুম।

পরদিন সকালে যাত্রা। পর্বতময় স্থান দার্জিলিং। সারা বিশ্বের সৌন্দর্যস্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম। ফিরে তাকাই ইংরেজ শাসন আমল। দার্জিলিং ছিল ভারতবর্ষের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। গরম থেকে বাঁচার জন্য গভর্নর থেকে শুরু করে হাজার হাজার মানুষ দার্জিলিং ছুটে আসত। একটু প্রশান্তি পাবার জন্য। এই ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। যদিও শীতের প্রারম্ভের মাসগুলো বেড়ানোর জন্য উত্তম। কিংবা প্রচণ্ড তাপদাহ থেকে মুক্তি পেতে গ্রীষ্মকালে। সেক্ষেত্রে আমাদের যাওয়াটা ছিল একটু ব্যতিক্রম। উপযুক্ত সময় থেকে এখন যাওয়ার মূল পার্থক্য-

www.pathagar.com

'আকাশ ভরা মেঘ'। বলা হয় মেঘের রাজ্য দার্জিলিংকে। ঘর থেকে বাইরে তাকালে দেখা যায় মেঘের আনাগোনা। চঞ্চল মেঘেরা যেন আপনার ঘরে ঢুকে যেতে চাইছে। প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফুট পাহাড় চূড়া। মেঘের ফালিগুলো দুহাত ভরে নেয়া যায়। দার্জিলিং এর শ্রেষ্ঠ দৃশ্য ছিল ভোরের সূর্যের রক্তিম আভায় লাল হয়ে যাওয়া অনন্যা পর্বত কন্যা কাঞ্চনজঙ্গার সূর্যোদয়।

দার্জিলিংয়ের পথেই পড়ে সেবক ব্রিজ। মজার ব্যাপার হলো সেবকের রাস্তায় বানরদের ছড়াছড়ি। পাহাড়ি রাস্তা সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয়। ঝর্ণার পানি ঝরছে অঝোর ধারায়। বিখ্যাত পাহাড়ি নদী তিস্তা। নিচে নদী আর দুই পাহাড়ের সংযোগ বস্তু সেবক ব্রিজ। এ দৃশ্য সত্যিই দুর্লভ।

সবুজ প্রকৃতির মধ্যে ছিল আমাদের ভিন্ন রকমের আয়োজন, মুভি দেখা, রাতে কুকের চমৎকার সব রান্না, আরও কত কি। রাত তখন ৩টা। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। জোনাকি পোকার আলোয় আলোকিত। গহীন জঙ্গলের সরু পথ ধরে এগিয়ে চলা। বাতাসের ধ্বনি। ঘুমিয়ে আছে জঙ্গলের সব প্রাণী। এগিয়ে যাচ্ছি কেবল আমরা কজন। উদ্দেশ্য টাইগার হিলের চূড়া। চারপাশে মেঘের দেখা। গাঢ় অন্ধকারকে পেছনে ফেলে অবশেষে চূড়ায় পৌঁছলাম। টাইগার হিলের চূড়া থেকে কাঞ্চন জঙ্গার বুকে সূর্যোদয়। সত্যিই আনন্দের এক অনির্বচনীয় ঠিকানা।

এখানের পাহাড়গুলোর গায়ে রডোডেনড্রন আর ম্যাগনোলিয়া ফুলের মেলা বসে। পাহাড়গুলো তখন লাল এবং হলুদের সোনালি আভায় সেজে থাকে। দার্জিলিং শহরে পানি সরবরাহ করা হয় কৃত্রিম সিঞ্চল লেক থেকে। তিনটি লেকের সমাহারে গড়ে উঠেছে সিঞ্চল গেম স্যাঞ্চুয়ারী। এখানের জলরাশি স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ সবাইকে মুগ্ধ করে।

পরবর্তী দর্শন ঘুম। পৃথিবীর উচ্চতম রেলস্টেশন। ঘুমের প্রধান আকর্ষণ স্টার লিং রিসোর্ট। শিল্পীর নিপুণ কারুকাজ। এখান থেকে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টকে এক নজর দেখা যায়। বাদ যায়নি বৌদ্ধের উপাসনালয় কেন্দ্র ও সেন্ট পল স্কুল। যে স্কুলে ভারতীয় ছবি ম্যায় হুনার শুটিং হয়েছিল। আরো রয়েছে ট্রেন। যেটিতে করে বাতাসিয়ালুপ ও কাঞ্চনজঙ্গা দর্শন নিঃসন্দেহে মনোরম। বাতাসিয়া লুপে তৈরিকৃত স্মৃতিসৌধ। বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধে মারা যাওয়া সৈনিকদের স্মৃতিচারিত হয়। ওখান থেকে গঙ্গামায়া পার্ক হয়ে রক গার্ডেন। রক গার্ডেনের পুরোটাই পাথরে ব্যষ্টিত। পাথরের পাশ থেকে মৃদু গতিতে পানি গড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও ঝর্ণার ধ্বনি দেয় বাড়তি আমেজ। ঝর্ণার শীতল পানিতে গোসল সারা যায়।

ম্যালে থেকে পর্বত ও তুষার ধবল সব শৃঙ্গ দৃশ্যমান। সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময় এ দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। ম্যালে ভারত সরকারের পর্যটন অফিস রয়েছে এখানে দার্জিলিং বেড়ানোর সব তথ্য পাওয়া যায়। ম্যালের অদূরে রয়েছে জহুর পর্বত। এই পর্বতকে ঘিরেই হিমালয়ান মাউন্টানারিং ইনস্টিটিউট। এখানে

www.pathagar.com

পার্বত্য অভিযান শিক্ষা দেয়া ছাড়াও রয়েছে হিমালয় মিউজিয়াম। ফিল্ম শো ও টেলিস্কোপে কাঞ্চনজঙ্গা দেখা যায়। এর সাথেই রয়েছে হিমালয় চিড়িয়াখানা। শীতল প্রজাতির সাইবেরিয়ান বাঘ, ব্লাক বিয়ার, ক্লাউড লেপার্ড, হরিণ, প্যান্থার, রেড পাণ্ডা ও বিশেষ প্রজাতির পাহাড়ি গরু। সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চিড়িয়াখানা খোলা থাকে। তেনজিং সমাধি স্থল রয়েছে। এখানে রক ক্ল্যাইম্বিং করার জন্য দারুণ ব্যবস্থা রয়েছে। দার্জিলিংয়ের পাহাড়ের ঢালে ঢালে চা বাগান বানানো হয়েছে। সবুজ চা বাগানের দৃশ্যপট দেখে পুনরায় হোটেলে।

পরদিন সকালে মিরিখের উদ্দেশে যাত্রা। মিরিখের পথে পথে শ্যামল প্রকৃতি হাতছানি দেয়। এখানকার রাস্তা উপরের দিকে উঠতে না উঠতে নিচে নেমে যায়। মিরিখে রয়েছে বাহারি সব গাছের সমারোহ। কিছুটা জঙ্গল প্রকৃতির। তবে আকর্ষণীয় হচ্ছে মিরিখ লেকে বোর্ডিং করা। মিরিখ থেকে পুরো দল শিলিগুড়িতে চলে আসি। পুনরায় বুড়িমাড়ি বর্ডার পার হয়ে ঢাকায়। এভাবেই কেটে যায় কিছুটা সময়। সৌন্দর্যের স্বর্গময় স্থান দার্জিলিং ও ভুটানের যাত্রা শেষ করে। 'Shab' এর বন্ধুরা আবার বের হবে নতুন কোনো আকর্ষণীয় জায়গার খোঁজে।

ইতিহাসের শহর আলিনগর

আজকের কলকাতা কোনো এক যুগে 'আলিনগর' নামে খ্যাত ছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁর প্রিয় নানাজান নবাব আলিবর্দী খানের নামে রেখেছিলেন এই শহরটির নাম। সময়ের স্রোতে অনেক কিছুতে পরিবর্তন আসলেও বর্তমান কলকাতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নাম আজও রয়ে গেছে নবাব আলিবর্দীর শ্রদ্ধায়। কলকাতাবাসীর কাছে এলাকাটি 'আলিপুর দুয়ার' নামে পরিচিত। সিরাজউদ্দৌলার জন্ম ১৭২৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর এই বাংলায়। তাই তিনি ছিলেন এই বাংলারই সন্তান, এই বাংলারই বীর, এই বাংলারই নায়ক। সিরাজ ১৭৪৯ সালে যুবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েই কলকাতা পরিদর্শনে বের হন। হুগলিতে তাঁকে বিশাল অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। তখনকার হুগলির শাসনকর্তা নন্দকুমার ও খোজা বাজিদ এর সহায়তায় ফরাসি ও দিনেমাররা সিরাজউদ্দৌলার সহানুভূতিশীল দৃষ্টি লাভ করতে সমর্থ হন। কোনো এক সময় সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা শহর ঘুরে দেখেন যে... ইংরেজরা বাড়ি-ঘর বানিয়ে বেশ আরামে আছে। তাদের খাওয়া-দাওয়া, জামাকাপড়ে প্রতিনিয়ত নতুনত্বের চমক। চলনেও বড় লোকের মত। অথচ নবাবের দেশের (বাংলার) লোকজন গরিব। এসব লোকদের ঠকিয়ে ইংরেজরা কলকাতায় এত টাকা পয়সার পাহাড় গড়েছে। তাই ১৭৫৬ সালের ১৯ জুন সিরাজউদ্দৌলা কলকাতার ইংরেজদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি দখল করেন। এ সময় বাংলার জনতা এই বিজয় নিয়ে আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ে। সকলের মন আনন্দে নেচে ওঠে। ৯ ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের সাথে শান্তিপ্রিয় নবাব সিরাজ, বাংলায় শান্তি বজায় রাখার জন্য

www.pathagar.com

চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তি অনুযায়ী ১৭১৭ সালের ফরমানে উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধা ফিরিয়ে দেন। ইংরেজদের মালপত্রের ওপর থেকে ট্যাক্স প্রত্যাহার করে নেন। কলকাতায় ইংরেজদের দুর্গ ও টাকশাল গড়ার অনুমতিও দেয়া হয়। নবাব ব্যক্তিগতভাবে কলকাতায় ইংরেজদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৩ লাখ রুপি দিতে রাজি হন। এ সন্ধি 'আলিনগরের সন্ধি' নামে পরিচিত। সন্ধির শর্তানুযায়ী সিরাজ ইংরেজদেরকে অনেক ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হন। তাদের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধাও বাড়িয়ে দেন। বিনিময়ে ইংরেজগণ বাংলায় শান্তি বজায় রাখবে, শত্রুতা করবে না নবাবের সাথে, এমনটি অঙ্গীকার করে। সন্ধি চুক্তির পর নবাব আলিনগর (বর্তমান কলকাতা) থেকে ভাঙ্গা মন নিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষরের মাত্র আড়াই মাস পরেই ইংরেজরা সন্ধির একেকটি শর্ত পর্যায়ক্রমে ভাঙ্গতে থাকে। আর এভাবেই তারা বাংলার নবাব ও বাংলার আম জনতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেয়। তার পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। ২৩ জুন ১৭৫৭, পলাশী যুদ্ধ, বিশ্বাসঘাতকতা, সিরাজকে নির্মমভাবে হত্যা, আর এই বাংলার মাটিতে, দীর্ঘদিন সিরাজ পরিবারের ওপর ছেয়ে থাকে কালো মেঘের করুণ ছায়া। সে সময়কার ইংরেজ এবং বাংলার কিছু স্বার্থান্বেষী মহল সিরাজকে প্রমাণিত করতে চেয়েছিল একজন অপরাধী ব্যক্তি হিসেবে। তাই সিরাজের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে সাজানো মিথ্যা কলঙ্ক কাহিনী হলওয়েলের অন্ধকূপ হত্যা। অক্ষর কুমার মৈত্রেয়-এর চুলচেরা বিশ্লেষণে অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় এবং ১৯৪০ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বাংলার প্রধানমন্ত্রী শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এর উপস্থিতিতে সেদিনকার হিন্দু মুসলমান ছাত্র সমাজ সংগ্রাম করে কলকাতার বুক থেকে কথিত অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিচিহ্ন হলওয়েল মনুমেন্ট উপড়ে ফেলে। ১৯১১ সালের ৮ জানুয়ারি সিরাজউদ্দৌলার দেশপ্রেম নিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ কলকাতায় ' সিরাজউদ্দৌলা' নাটক মঞ্চস্থ করেন। বাংলার দেশপ্রেমী মানুষ লুফে নেয় নাটকটি, আতঙ্কিত হয়ে পড়ে তৎকালীন সরকার। তাই নাটকটির সব রকম প্রচার প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হয়। পলাশী দিবস বাংলায় প্রথম যথাযথ মর্যাদায় পালনের উদ্যোগ নেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, দৈনিক আজাদের সম্পাদক মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও অন্যান্য প্রগতিশীল বিপ্লবীরা। উক্ত সময়ে কাজী নজরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে বলেন, মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে কলকাতায় সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি কমিটি উক্ত অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কলকাতা কমিটিকে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করিয়া আমাদের জাতীয় বীরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য আমি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট আবেদন জানাইতেছি। বিদেশির বন্ধন- শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভের জন্য আমরা সংগ্রামরত। নবাব সিরাজউদ্দৌলার জীবনস্মৃতি হইতে যেন আমরা অনুপ্রাণিত হই। ইহাই আমার প্রার্থনা (২৯.০৬.১৯৩৯ দৈনিক আজাদ ও মাসিক

www.pathagar.com

মোহাম্মদী)। কলকাতা ইতিহাসের শহর। এর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নতুন ইতিহাসের জন্ম। এখানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মসজিদ গির্জা আর মন্দির। শহরটিতে রয়েছে বহু দ্রষ্টব্য স্থান। আকাশবাণী ভবন... চমৎকার এই ভবনটি সবার দৃষ্টি কেড়ে নেয়। এর পাশেই জন্ম নিল চমৎকার একটি বাগান 'অকল্যান্ড সার্কাস গার্ডেন'। অনেকের কাছে এটি ইডেন উদ্যান নামেও পরিচিত। ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম স্থাপিত হয় ১৮১৪ তে। পৃথিবীর ৯টি সেরা যাদুঘরের অন্যতম এই যাদুঘর এশিয়ার এবং কলকাতার প্রাচীনতম জাদুঘর। এখানে আছে ২৪০০ বছরেরও পুরনো ৫৪ হাজার মুদ্রা। সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারতে শিল্পকলার সংগ্রহ একমাত্র এখানেই আছে। রয়েছে চার হাজার বছরের পুরনো মিশরীয় মমি, তিমি মাছের চোয়াল নানা স্টাফড্ (খড় গোঁজা) পাখি।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। অনেকটা তাজমহলের মতো সাদা অট্টালিকা। এর মাথার উপর ঘুরে চলেছে ঘূর্ণায়মান পরী। এর উচ্চতা দুইশত ফুট। বড়দিনে অপরূপ রূপে সাজে 'সেন্ট পলস ক্যাতিড্রাল'। 'কলকাতা সিমেট্রিতে' সমাহিত আছেন মাইকেল মধুসূদনসহ বহু বিখ্যাত ব্যক্তি। পরেশনাথের মন্দিরে আছে শ্বেত পাথরের বিগ্রহ, নানা মূল্যবান পাথর, প্রবালের নানা কারুকার্য মন্দিরের গায়ে। চিৎপুর এর কাছাকাছি অবস্থিত বিশাল নাখোদা মসজিদ। সম্রাট আকবরের সমাধি অনুকরণে ইন্দো-সেরাসেনিক পদ্ধতিতে ১৫ লাখ রুপি খরচ করে এই বিশাল মসজিদ গড়ে তোলা হয়। আরও দেখার আছে হাওড়া সেতু। এই সেতুর ওপর দিয়ে বাসে চড়ে হাওড়া স্টেশন থেকে ৪ কি. মি. দক্ষিণে শিবপুরে গড়ে উঠেছে পৃথিবীখ্যাত একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন। ২৭০ একর জমি জুড়ে এখানে প্রায় ৫০ হাজার প্রজাতির নানা রকম গাছের সংসার। ১৮৭৬ -এ স্থাপিত কলকাতা চিড়িয়াখানা ৪৫ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে। দৃষ্টিনন্দন এই চিড়িয়াখানায় দেখা মেলে চেনা অচেনা নানা রকম পশুপাখির আনন্দ মেলা। চিড়িয়াখানার খুব কাছেই দেখা মেলে অ্যাকোরিয়াম মাছেদের এক রঙিন জগৎ, দেখতে দেখতে মনে হয় এই তো সমুদ্রের গভীরতায় হারিয়ে গেলাম।

কলকাতার নিচের অংশ কত সুন্দর! দেখতে হলে এসপ্ল্যানেড স্টেশন থেকে মেট্রো রেলে ঘুরতেই হবে। কলকাতায় আসলাম আর ট্রামে চড়লাম না এটা কি হয়! কলকাতার ট্রামে চড়ে এদিক ওদিক ভ্রমণ করতে বেশ মজাই লাগে। কলকাতার সন্ধ্যায় আলোকোজ্জ্বল বিড়লা মন্দিরটির সৌন্দর্য সত্যিই অনুপম। মন্দিরটির নির্মাণ শৈলীতে অভিনবত্ব আছে। কলকাতার মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের উপর মার্বেল প্যালেস। সেখানে রয়েছে বহু ছবি, পাথরের মূর্তি, ঝর্ণা, অলংকৃত ঘড়িসহ আরও অনেক কিছু। শহরটিতে ছোটদের জন্য রয়েছে বিধান নগরে বিধান শিশু উদ্যান আর নিক্কো পার্ক।

পশ্চিমবঙ্গের দেশপ্রেমী মানুষ বিশেষ দিনগুলোতে শ্রদ্ধার সাথে আজও স্মরণ করে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

তাইতো পলাশী দিবসের ২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ সড়কে শোভা পায় বাংলার বীর নবাব সিরাজউদ্দৌলার চিত্র। যা প্রতিনিয়ত কলকাতাবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেয় দেশপ্রেমের কথা। কলকাতায় এলাম কিছু দর্শনীয় স্থান দেখলাম, এখানেই শেষ নয়। কিছু মাস্তি মজা কেনাকাটা না করলে কেমন হয়। শহরটিতে অনেক মানসম্মত সিনেমা ঘর রয়েছে। যেখানে বাংলা, হিন্দি, ইংলিশসহ ভালো মন্দ সব ধরনের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। আর কলকাতার হলে পপকর্ণ হাতে পাশে প্রিয় বন্ধুরা মিলে মাস্তি মজায় ফিল্ম না দেখলে জীবনটাই বৃথা। ফিল্ম দেখা শেষে কেনাকাটা না করলে কি হয়। তাইতো কেনাকাটার জন্য রয়েছে নিউমার্কেট, ট্রেজার আইল্যান্ড এসি মার্কেট, বড় বাজার, পার্ক স্ট্রীট ইত্যাদি। মল্লিক স্ট্রীটে রয়েছে সব ধরনের পণ্যের পাইকার বাজার। এখান থেকে খুবই স্বল্পমূল্যে মানসম্মত যেকোনো জিনিস ক্রয় করা যায়। কেনাকাটা শেষে কলকাতার সব ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্বাদ না নিলে, মনটা অতৃপ্ত থেকে যায়। কলকাতার গোলা ও কুলফি আইসক্রিমের স্বাদ-ই আলাদা। হাতে কুলফি আর গোলা সাথে বন্ধু আর টাঙ্গা রিক্সায় ইতিহাসের শহর আলিনগর ভ্রমণের মজাটাই আলাদা।

দীঘা টু উড়িষ্যা

কলকাতায় যারা প্রথমে ভ্রমণের উদ্দেশে যায় তারা বুঝে উঠতে পারে না কোথায় কোথায় তারা ঘুরবে। বেশিরভাগ লোকই নিউমার্কেট এলাকাতে ঘুরে ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে দেয়। নতুন পর্যটকরা একটু খোঁজখবর নিয়ে গেলে এই সমস্যা সহজেই এড়াতে পারেন। কলকাতা শহরের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত এটি ৩০০ বছরের পুরনো শহর। কেউ কেউ যাকে বলে রংচটা শহর। কিন্তু এই শহরের বিবর্ণতার আড়ালে রয়েছে দুর্নিবার আকর্ষণের নানা দিক। ভবনগুলোর কিছু নবাব আলিবর্দী- সিরাজউদ্দৌলার আমলে তৈরি বাকি সবই ইংরেজ আমলে তৈরি। যার আদল প্রায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে আকর্ষণীয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে ভারতীয়রা যাই মনে করুন না কেন আমি এটিকে ইংরেজ শাসন আমলের অত্যাচারের প্রতীক বলে মনে করি। কেননা এই ভবনে বাস করে ইংরেজরা উপমহাদেশে তাদের অপশাসনের খড়্গ চালিয়েছে। কলকাতা দর্শন শেষে উক্ত শহরের ধর্মতলা থেকে দীঘা সমুদ্র সৈকত দেখতে যাই। দীঘার অপূর্ব সমুদ্র সৈকত যেকোনো পর্যটকদের কাছে সারাজীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে। কক্সবাজার থেকে দীঘার সমুদ্র সৈকতের ব্যবস্থা অনেক উন্নত। নির্জন ও নিরিবিলিতে কাটানোর জন্য দীঘার বিকল্প খুব কমই আছে। পর্যটকরা এখানে প্রায় সারা রাত ধরে বিচে ঘোরফেরা করতে পারেন। সমুদ্রের পাড়ে দোকানগুলোতে রয়েছে নানা জাতের শামুকের বিচিত্র অলঙ্কার, আছে সারি সারি কাজু বাদামের দোকান। প্রসঙ্গত

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, দীঘা এবং পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যার বিশাল এলাকা জুড়ে বাদামের বাগান। দীঘা মাছের জন্য বিখ্যাত। সমুদ্রের পাড়ে অনেক ধরনের বিচিত্র মাছ স্থানীয়রা ফ্রাই করে বিক্রি করে। আমরা ফিশ ফ্রাই বিক্রেতার কাছে চিংড়ি ও রূপচাঁদা ফ্রাই কিনি। এরপর কিছুদূর এগিয়ে রাস্তার ধারে চমৎকারভাবে সাজানো কাজু বাদামের দোকান থেকে কয়েক প্যাকেট বাদাম কিনি। সেখান থেকে আবার সমুদ্রের পাড়ে এসে বড় ও মাঝারি আকারের দুটি সামুদ্রিক শামুক কিনি। পরদিন সকালে রাস্তায় দাঁড়িয়ে টোস্ট ও চা দিয়ে নাস্তা সেরে সোজা চলে যাই হোটেল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে মোহনা নামের স্থানে। আগের দিন শুনেছিলাম মোহনায় রয়েছে ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ মাছের বাজার। ভ্যান চালককে ৩ ঘণ্টার জন্য চুক্তিবদ্ধ করি। আকাশে মেঘ আর টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ভ্যান চালক আমাদের মোহনায় নিয়ে যায়। সমুদ্রের কূলে ফাঁকা মাঠের মধ্যে প্রায় ৩০০০ কাঁচা ঘর, যার চারদিক খোলা। এসব ঘরে হাজার হাজার মন বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ডাকের মাধ্যমে বিক্রি হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই ব্যস্ত। তাদের সেই ব্যস্ততা এমনই যে কারও সঙ্গে কথা বলার ফুসরত নেই। দীঘা পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার একেবারে শেষ প্রান্তে। সমতল ভূমির এই জেলায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। সবুজ বৃক্ষরাজির প্রাচুর্য রয়েছে, তবে সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা তেমন উন্নত নয়। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে দেখা যাবে শুধু টালি ও খড়ের ঘর। পাকা ভবনগুলোতে আধুনিক ছাপ ও শৈলীর নিদর্শন পাওয়া যাবে না। ভবনগুলো অতি প্রাচীন ও বদ্ধ ধাঁচে তৈরি। দীঘা থেকে মাত্র ছয় কিলোমিটার দূরে উড়িষ্যার শুরু। দীঘার প্রান্তে উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় বেশ কয়েকটি দর্শনীয় স্থান রয়েছে। ৩ ঘণ্টার জন্য একটি ট্যাক্সি ক্যাব ভাড়া করে ঐ স্থানগুলো দেখতে হলো। প্রথমে যাই উদয়পুর সমুদ্র সৈকতে, যেখানে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অসংখ্য ফিল্মের শ্যুটিং হয়। এখানে সমুদ্রের কূল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা নির্জন ঝাউগাছের সারি সকলের মন কাড়ে। বালেশ্বর জেলায় পান ও বাঁশ উৎপন্ন হয়। মানুষের আর্থিক অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের মতোই। এই প্রদেশের ভাষা 'উড়িয়া' হলেও সীমান্ত এলাকার মানুষ বাংলায় কথা বলে। তবে জাতীয়ভাবে সর্বত্রই প্রচলন রয়েছে হিন্দি ভাষার। সমুদ্রকূলবর্তী হওয়ায় উড়িষ্যায় ঝড়, বৃষ্টি বেশি হয়। দীঘার মতো বালেশ্বর জেলাতেও প্রচুর কাজু বাদামের বাগান রয়েছে।

কেউ যদি দীঘাতে বেড়াতে এসে মোহনার মাছ বাজার এবং অমরাবতী পার্ক না দেখে ফিরে যান তাহলে তিনি অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হবেন। এই পার্কে রয়েছে হাজার প্রজাতির ফুল। পার্কের সিকিউরিটি গার্ড জানালেন, বিশেষ করে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই পার্কে প্রচুর ফুলের সমারোহ থাকে। ফুল ছাড়াও এই পার্কে রয়েছে চমৎকার লেক। সেখানে বেড়ানোর জন্য রয়েছে ছোট ছোট নৌকা, ঘণ্টা হিসাবে সেগুলো ভাড়া নেয়া যায়।

অমরাবতী পার্ক থেকে বেরিয়ে প্রধান সড়কে এসে দেখা যাবে বৃহৎ মাছের অ্যাকুরিয়াম ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাজু বাদাম চাষের একটি প্রকল্প। কাজু

www.pathagar.com

বাদাম এই উপমহাদেশের প্রায় চার শ' বছর আগে পর্তুগিজ নাবিকরা নিয়ে আসে। এই বাদামের আদি নিবাস ব্রাজিল। চীনা বাদামের মতো এটিও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আগত পর্তুগিজরা এখানে প্রথম চাষ করে।

বাগান থেকে হোটেলে ফিরে আসার পথে দেখা হয় কমলাদাস পাইকারের সঙ্গে। যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় দীঘার সৈকতে নিজের তৈরি টক-ঝাল-মিষ্টি মিশিয়ে মসলা-মুড়ি বিক্রি করে। সে যেকোনো পর্যটকের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে খুবই বিনয়ী ভঙ্গিতে একচল্লিশ ধরনের মসলা দিয়ে তৈরি মুড়ি ভাজার বিবরণ দেয়, যা সহজেই সকলের দৃষ্টি কাড়ে। কমলাদাসের অনুরোধ খুব কম পর্যটকই উপেক্ষা করতে পারে। রাতে আমরা বন্ধুরা তার কাছ থেকে কয়েক ঠোঙা ঝালমুড়ি কিনেছিলাম। আর যাত্রা শেষে নিরবতার সাথে শ্রদ্ধায় স্মরণ করে নিলাম বাংলা উড়িষ্যার বীর দেশপ্রেমিক আলিবর্দী ও সিরাজউদ্দৌলার বীরত্বের কথা।

নানান রঙে রঙিন গোয়া

ভারতের মুম্বাই-এর কোল ঘেঁষে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে রাজ্য গোয়ার অবস্থান। অপরূপ প্রকৃতি আর তার মাঝে মাস্তি, ফান, নাচ-গান এসব কিছু গোয়াতেই সম্ভব। ভোরের গোয়া.... চোখ মেলতেই অপূর্ব সুন্দর সব দৃশ্য। ট্রেন ছুটছে, বদলে যাচ্ছে বাইরের দৃশ্যপট, মাটির রং এবং গাছের ছবি। কখনো মেঘ ভেসে যাচ্ছে ট্রেনের পাশে, কখনোবা ট্রেন চলছে নদীর কোল ঘেঁষে। পাহাড়ের কোল বেয়ে আঁকাবাঁকা পথে ট্রেন ছুটছে। হঠাৎ প্রবেশ করল গুহার ভেতর। শোনা গেল এই গুহাপথই বিখ্যাত ছাঁইয়া ছাঁইয়া, গানের দৃশ্যায়ন হয়েছিল। সে এক অভিজ্ঞতা। চোখ অন্ধকার সহ্য করতে না করতেই ঝিরঝির করে পানির ছাঁট এসে গায়ে লাগল। আরে এ যে পাহাড়ি ঝরনা এভাবে বেশ কয়েকটি গুহার ভেতর দিয়ে যেতে হলো। প্রায় ১৩ ঘণ্টা পর আমরা নেমে পড়লাম ছোট্ট পাহাড়ি স্টেশন থিবিমে। কারণ, আমরা ক্যালাংগুটে বিচে যেখানে থাকব, সেখান থেকে গোয়ার মূল স্টেশন মারগাঁও অনেক দূর। গোয়ার সব বড় হোটেল বা রিসোর্টের বুকিং ইন্টারনেটেই পাওয়া যায়। আর অফ সিজনে গেলে পাওয়া যায় অনেক ডিসকাউন্ট।

ট্যাক্সিক্যাবে স্টেশন থেকে ক্যালাংগুটে রেসিডেন্সে যেতে যেতেই আমরা চারপাশের বাড়ি-ঘর, গাছপালা দেখে অভিভূত। গোয়াতে প্রায় ২৮টি বিচ রয়েছে। বিচগুলোকে কেন্দ্র করে রিসোর্ট, হোটেল-রেস্তোরাঁরও অভাব নেই। পর্যটন মৌসুমে এখানকার মানুষের বাড়িঘরগুলোও হয়ে ওঠে রিসোর্ট। পর্তুগিজ ও ভারতীয় সংস্কৃতির এবং পুরোনো ও আধুনিকতার মিশেলে একটি অপূর্ব শহর

www.pathagar.com

এই গোয়া। যার রাজধানী পানাজি বা পানজেম। কোনো এককালে বীর দেশপ্রেমিক সিরাজউদ্দৌলার প্রিয়তমা স্ত্রী বেগম লৎফুন্নিসার পিতৃভূমি ও পূর্বপুরুষদের আবাসস্থল ছিল নৈসর্গিক সৌন্দর্যের শহর গোয়া। আর লুৎফার মাতৃভূমি ছিল মুম্বাই/ বম্বে। তবে তার জন্ম ১৭৩৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর রূপসী বাংলায়। তার ভাই ইরান খান, পিতা- ইরাজ খান, মাতা- গুলশান আরা, দাদান- আকবর কুলি খান।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর গোয়া

যদিও সবাই গোয়ার বিচ নিয়ে মাতামাতি করে, কিন্তু আমার পূর্বপুরুষদের মাটি ধারায় শহরও তো কম সুন্দর নয়। আর সাগরের স্বচ্ছ নীল জলরাশি, অনেক উঁচু ঢেউ, লাল বালুতট, যেমন খুশি তেমনভাবে পানিতে নামার স্বাধীনতা, বিচ রেস্তোরাঁর জমজমাট নাচ-গান গোয়ার সমুদ্র সৈকতগুলোকে করেছে আকর্ষণীয়। অন্যদিকে পর্তুগিজদের বানানো ঘর-বাড়ির নকশা, উজ্জ্বল রং, পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ানো গির্জার ঢং ঢং শব্দ, মন্দভি নদীতে পাল তোলা নৌকা, ইয়টের সারি গোয়াকে করেছে অন্য রকম সুন্দর। মন্দভি নদীকে কেন্দ্র করে এত নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন একটি শহর যেকোনো পর্যটককে মুগ্ধ করে রাখবে। পুরোনো গোয়ার সৌন্দর্য আবার অন্য রকম- একটু কম চাকচিক্য হলেও পরিচ্ছন্ন পাথর বিছানো রাস্তাঘাট, ফুলবাগানে ঘেরা বাড়িঘর এর বৈশিষ্ট্য। পুরোনো গোয়ায় এমন শহরও রয়েছে, যেখানে কোনো যানবাহন চলে না, হেঁটে যেতে হয়। পুরো গোয়া শহরটাই দেখার মতো। সুন্দর করে সাজানো অফিস, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, গ্যালারি মিউজিয়াম, নৌবন্দর এবং ছোট বড় দোকানপাট সবই

www.pathagar.com

ন্দর। গোয়ায় রয়েছে ষোলো শতকে নির্মিত সেইন্ট জেভিয়ার্স চার্চ যেখানে মমি রে রাখা আছে সাধু জেভিয়ার্সের মরদেহ। রয়েছে আগুয়ারা ফোর্ট। পর্তুগিজ ীবহরে পানি সরবরাহ করা হতো এখান থেকে। নাবিক ভাস্কো দ্যা গামার তিবিজড়িত ভাস্কো দ্যা গামা সিটি। এ ছাড়া মোলেমে আছে ভগবান মহাবীর ভয়ারণ্য, শ্রী ব্রহ্ম মন্দির, ত্বমাদি স্যুরলা মন্দির, কোরজুয়েম ফোর্ট, চাপোরা ার্ট এবং চোরও পাখি অভয়ারণ্য। মৌসুমে দেখা পাওয়া যায় ডলফিনদেরও। র্যটকদের জন্য রয়েছে ডিসকোসহ নৌভ্রমণের ব্যবস্থা।

গোয়ার আকর্ষণীয় সমুদ্র সৈকতে মোহিত

পাহাড়, সমুদ্র, নদী, অসংখ্য গির্জা, মন্দির ও দুর্গের শহর এই গোয়া। য়েছে নানা ধরনের মসলাপাতি ও বাদামের ছড়াছড়ি। বিশেষ করে এখানকার াজু বাদামের স্বাদ তো মুখে লেগে থাকার মতো। একজন পর্যটককে আনন্দ ওয়ার জন্য যা যা দরকার, সবই আছে গোয়ায়।

মানুষজন ভদ্র, ট্যাক্সির অভাব নেই, খাবারের দামও মোটামুটি, নৈশ ক্লাব ার বারও রয়েছে অনেক। সর্বোপরি রয়েছে পর্যটকদের নিরাপত্তা। তবে পর্যটন ৌসুমে সবকিছুর দামই হয়ে যায় দ্বিগুণ।

কাজেই সীমিত আয়ের পর্যটকদের গোয়া বেড়ানোর জন্য অফ সিজনটাই বছে নেওয়া ভালো। আর যাদের টাকা কোনো ব্যাপার নয়, তারা যেতে পারেন াক্টোবর থেকে ডিসেম্বরে। বড়দিনের উৎসবে গোয়ার চেহারাই নাকি পাল্টে ায়।

www.pathagar.com

চীন ও ভারতের সীমান্ত পথে

ভারত ও চীনের মধ্যে সংযোগকারী একমাত্র স্থল সীমান্ত পথ হলো নাথুলা পাস। হিমালয়ের ১৪ হাজার ৪২০ ফুট উঁচুতে নাথুলা পাসে ভারতের সিকিম রাজ্যের সীমান্তের সঙ্গে চীনের তিব্বতের সীমান্ত মিলে গেছে। ৫৬৩ কিমি দৈর্ঘ্যের নাথুলা পাসের সঙ্গে চীনের বিখ্যাত মহাসড়ক সিল্করোডের সংযোগ রয়েছে। ১৮১৫ সালের দিকে ব্রিটিশরা নাথুলা পাসের মাধ্যমে চীন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যে যোগাযোগ সম্পন্ন করত। ১৮৭৩ সালে নেপাল, ভুটান, ভারতে আসার জন্য নাথুলা পাস ব্যবহার করত। ১৮৮৩ সালে চীনের রাজতন্ত্রের রাজা, তিব্বত ও সিকিম রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে নাথুলা পাস নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির মাধ্যমেই ভারত ও চীনের জনগণ উভয়ই দেশে যাতায়াত করত। ১৯০৩ থেকে ১৯০৪ সালে ব্রিটিশ সরকার নাথুলা পাসের ক্ষেত্রে ভিন্ন নিয়ম জারি করে। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত নতুন নিয়মে উভয় দেশের কোনো জনগণই সহজে এই গিরিপথ ব্যবহার করতে পারত না। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নাথুলা পাস সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তবে ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত যুদ্ধের পর এ গিরিপথটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০০৬ সাল পর্যন্ত নাথুলা পাস গিরিপথটি ভারত ও চীন কোনো রাষ্ট্রই ব্যবহার করতে পারত না। দীর্ঘ ৪৪ বছর পর ৬ জুলাই ২০০৬ সালে ঐতিহাসিক এক চুক্তির মাধ্যমে এ পথটি খুলে দেওয়া হয়। ২০০৬ সালের ১৮ জুনের চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলে জুনের ১ তারিখ থেকে সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখ পর্যন্ত। বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী ভারত ২৯টি এবং চীন ১৫টি পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা টেক্সটাইল এবং কম্বল, কৃষিজাত দ্রব্য, মদ, সিগারেট, চা, বার্লি, চাল, ভেষজ তেল ও বনৌষধি রপ্তানি করার সুযোগ পাবে। চীন রপ্তানি করতে পারবে ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, বনগরুর লেজ ও পশম, ছাগলের চামড়া, উল এবং র-সিল্ক। ঐতিহাসিক কারণেই নাথুলা পাসটি ভারত ও চীন উভয় দেশের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৮৮ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধী, সিকিম রাজ্যের নাথুলা গিরিপথকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করেন। তৎকালীন সময়ে রাজীব গান্ধী চীন সফর করেন। চীন সফরকালে তিনি নাথুলা গিরিপথ খুলে দেওয়ার জন্য চীন সরকারকে অনুরোধ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে রাজীব গান্ধীর মৃত্যুতে পথটি খোলার সিদ্ধান্ত স্থবির হয়ে যায়। নানা জল্পনা-কল্পনার পর ১৮ জুন ২০০৬ সালে চুক্তি অনুযায়ী খুলে দেওয়া হয় নাথুলা পাস। সেই থেকে ভারত ও চীনের জনগণ মুক্ত মনে চিরচেনা এই পথটি ব্যবহার করে আসছে।

www.pathagar.com

নবাব সিরাজউদ্দৌলা শূন্য করুন বাংলা

রক্তাক্ত পলাশী যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় এবং পতন সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ সিরাজকে ঘিরে হাজারো রকম দোষারোপ করলেও প্রকৃত কারণ ছিল খুবই গভীর। সিরাজ তারই শিকার হয়েছিলেন। ষড়যন্ত্র শুরু হয় সেই মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে। ১৬০৯ হতে ১৬১৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪ বছর ধরে অনেক সাধ্য সাধনা আর অনেক উপঢৌকনের বিনিময়ে ইংরেজ দূত ক্যাপ্টেন হকিনস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য বাদশাহ আকবরের বেগমের গর্ভজাত পুত্র নিসর্গ প্রেমিক বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে আদায় করে নিলেন, সুরাটে ফ্যাক্টরি নির্মাণ করে বাণিজ্যের অধিকার। সেই প্রথম স্বীকৃতি পেলো ভারতের মাটিতে ইংরেজদের অধিকার। জাহাঙ্গীরের পুত্র বাদশাহ শাহজাহান আরও ১ ধাপ এগিয়ে দিলেন। শাহজাহানের কন্যা জাহানারা, বাঁদীর কাপড়ের আগুন নিভাতে গিয়ে নিজে অগ্নিদগ্ধ হলেন। সম্রাট দুহিতা আগুনে ঝলসে বিছানায় আশ্রয় নিলেন। বহু হাকিম কবিরাজ একের পর এক এসে চিকিৎসা করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। পরিশেষে এলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাক্তার সার্জন জ্যাব্রাইল বাউটন। তিনি দু'হাত জোর করে প্রার্থনা জানালেন, বাদশাজাদীর চিকিৎসা তিনিই করবেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। ডাক্তার বাউটনের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলেন বাদশাহজাদী। বাদশাহ তো মহাখুশি। হে ডাক্তার কি পুরস্কার চাই তোমার। ডাক্তার বাউটন জাতে ইংরেজ বেনিয়া, বুদ্ধিতে ১৬ আনা পাকা। তিনি চাইলেন না লক্ষ আশরাফি। চাইলেন উড়িষ্যার মহানদীর মোহনায় হরিহরপুর আর বলেশ্বরের কিছু জমিন ফ্যাক্টরি নির্মাণের জন্য। বাদশাহের কাছে এই প্রার্থনা তো নস্যি। ফরমান জারি হলো সঙ্গে সঙ্গে। কোম্পানি ১৬৩৩ সালে বলেশ্বর আর হরিহরপুরে কুঠি নির্মাণ করল। পরে পাটনা ও কাশিম বাজারেও কুঠি নির্মাণের অনুমতি পাওয়া গেল। ভারতের মাটিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শক্ত ভিত গেড়ে বসল। সতেরো শ শতাব্দীর শেষদিকে বাদশাহ আওরঙ্গজেব তার পৌত্র আজীম উশ শানকে বাংলার সুবাদার করে পাঠালেন। আজীম উশ শান অত্যন্ত অলস ও লোভী ছিলেন। পর্যাপ্ত ঘুষ পেলে তিনি সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। ১৬৯৮ সালের জুলাই মাসে তিনি মাত্র ১৬ হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজদের কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর এই ৩টি গ্রামের ইজারা বন্দোবস্ত দিয়ে দেন। এরপর সারবুলন্দ খান বাংলার অস্থায়ী সুবাদার থাকাকালীন ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৪৫,০০০ টাকা ঘুষ নিয়ে ইংরেজ বণিকদের বাংলা বিহার উড়িষ্যায় ব্যবসা করার অধিকার দিলেন। এরপর ইংরেজদের আর কে ঠেকায়? বীর নবাব সিরাজউদ্দৌলা, বীরত্বের সাথে এগিয়ে এসেছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনিও পারেননি ঠেকাতে।

১৭৫৭ সালের ২ জুলাই ইংরেজদের বোনা গভীর ষড়যন্ত্রে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের পুত্র মীরনের নির্দেশ জাফরাগঞ্জের কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় মোহাম্মদী বেগ তার তলোয়ার দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে সিরাজের দেহ

www.pathagar.com

ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। রক্ত স্রোতের উপর লুটিয়ে পড়েন বাংলার দেশপ্রেমিক বীর নবাব সিরাজউদ্দৌলা। মীরজাফর পুতুল নবাব হন। পলাশীর বিপর্যয়ের ধারাবাহিকতায় কালক্রমে ইউরোপের খ্রিস্টানরা সামরিক শক্তিবলে এই পাক ভারত উপমহাদেশসহ সমস্ত মুসলিম ভূখণ্ড পদানত করে। যখন ইউরোপের খ্রিস্টানরা সামরিক শক্তিবলে মুসলিম ভূখণ্ড পদানত করে তাদের আইন-কানুন, শিক্ষা সংস্কৃতিসহ জাতীয় বিষয়গুলো এই পরাজিত মুসলিম জাতির ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দিল। তারা লাখ লাখ মুসলিমকে ট্যাংকের তলায় পিষে, জীবিত কবর দিয়ে, পুড়িয়ে, গুলি করে, বেয়নেট দিয়ে, তলোয়ার দিয়ে এবং লাইন করে মেশিনগান দিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে, বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে, মসজিদগুলো ভেঙে সেগুলো অফিস ও ক্লাবে পরিণত করেছে। লাখ লাখ মুসলিম মা বোনদের ধর্ষণ করে ইউরোপ ও আফ্রিকান নানা বেশ্যালয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। ইউরোপের খ্রিস্টানরা মুসলিম জনসংখ্যাকে তাদের পদানত দাসে পরিণত করার পরও এ জাতির অনেকের মধ্যেই ইসলামের চেতনা, আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্য এবং মুসলিম হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের অনভূতি কিছু হলেও অবশিষ্ট ছিল, বিধায় বিভিন্ন স্থানে এমনকি পাক ভারত উপমহাদেশে স্বাধীনচেতা মুসলিমদের বিদ্রোহ লেগেছিল। যেমন : হাজী শরিয়তুল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদু মিয়া মিয়ার ফারায়েজি আন্দোলন, ফকীর মজুন শাহের ফকির আন্দোলন, শেষ মোগল সম্রাট ২য় বাহাদুর শাহ জাফরের নেতৃত্বে সিপাহী বিদ্রোহ এবং তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার ঘটনাগুলো ব্রিটিশ শাসকদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। হাজার হাজার মুসলিম এসব আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বহুসংখ্যক তাদের জীবন উৎসর্গও করে গেছেন। এরপর খ্রিস্টানরা এ অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতে যে পথ বের করলো এবং তা হলো এই পদানত মুসলিম জাতিকে নিজেদের মতো করে ১টি বিকৃত ইসলাম শিক্ষা দিতে হবে। বিশ্বের সব মুসলিম উপনিবেশগুলোতে ইউরোপের খ্রিস্টান শাসকগণ এ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এ লক্ষ্যে ১৭৮০ সালে বড়লাট উইলিয়াম ওয়ারেন্ট হেস্টিংসের নেতৃত্বে তারা কলকাতায় আলিয়া মাদ্রাস প্রতিষ্ঠা করল এবং নিজেদের তৈরি ১টি বিকৃত ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে লাগল মুসলিম সমাজকে। আর আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা দেয়ার জন্য মাদ্রাসা পরিচালনার ভার ইংরেজরা তাদের পছন্দ করা তথাকথিত মুসলিম মোল্লাদের হাতে দেয়ার পরও যখন দেখল যে তাদের পছন্দমতো কাজ হচ্ছে না তখন তারা মাদ্রাসা পরিচালনার ভার নিজেরাই নিয়ে নিল। ১৮৫০-১৯২৬ সাল পর্যন্ত এক নাগাড়ে ২৬ জন খ্রিস্টান ব্যক্তি আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে থেকে এই জাতিকে বিকৃত ইসলাম শিক্ষা দিতে থাকেন। ৭৬ বছর পর যখন ব্রিটিশ খ্রিস্টান শাসকেরা দেখল যে তাদের সৃষ্ট বিকৃত, মরা, প্রাণহীন ইসলাম এই তথাকথিত মুসলিম জাতির মন মগজে ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে তখন সেই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদ তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত মাদ্রাসার আলেমদের হাতে ছেড়ে দিল। ব্রিটিশরা চলে গেছে কিন্তু পৃথিবীর ৯৫% মাদ্রাসাগুলোতে বিকৃত ইসলাম শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এবং জাতি তা প্রকৃত ইসলাম মনে করে প্রাণপণে তা ধুমধামের সাথে পালন

www.pathagar.com

করে যাচ্ছে। এই জাতি যাতে আর কখনো শত্রুর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য ইউরোপীয় খ্রিস্টান ও ইহুদিরা তাদের শয়তানি পরিকল্পনামাফিক বিকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠা করল। খ্রিস্টানদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় শিক্ষিত হয়ে জন্ম হলো এই বিকৃত ইসলামের হর্তা-কর্তা, ধ্বজাধারী ধর্ম ব্যবসায়ী আলেম মোল্লা শ্রেণি। এই জাতির তথাকথিত আলেম সমাজ ইসলামের খুঁটিনাটি মাসলা-মাসায়েল নিয়ে হাজারো ভাগে বিভক্ত এবং এরা খ্রিস্টানদের তৈরি করা বিকৃত, বিপরীতমুখী, মরা ইসলামকে অর্থ ও জীবিকার পথ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

এরা জনসাধারণের মধ্যে ইসলামকে বিক্রি করে অর্থাৎ নামাজ, জুম্মা, ঈদের ইমামতি করে, মিলাদ, জানাজা, তারাবি, কোরআন খতম পড়িয়ে, ধর্মের ওয়াজ করে, ফতোয়া দিয়ে, খুৎবা দিয়ে, আযান দিয়ে, কোরবানি করে, মসজিদ মাদ্রাসার জন্য চাঁদা তুলে এবং আরো বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ধর্মকে পুঁজি করে খাচ্ছেন, তা আল্লাহর ভাষায় আগুন খাওয়ার সমান। (সূরা বাকারা : ১৭৫-১৭৬)

শুধু পলাশী যুদ্ধ পরবর্তী সময়গুলো নয় আজও অন্যান্য জাতিদের দ্বারা মুসলিম জাতিটি পদদলিত, অপমানিত আর লাঞ্ছিত হচ্ছে। একদিন ভারতবর্ষে মসলা বিক্রি করতে আসা ৮০ জন ইংরেজ সওদাগর ১৫৯৯ সালে যে কোম্পানি গঠন করেছিলেন। সময়ের ব্যবধানে সেই কোম্পানিই হয়ে উঠল আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রধান শত্রু। পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে মীরজাফরের বেইমানিতে ইংরেজরা এদেশে আধিপত্য লাভ করে। মীরজাফরের পরবর্তী বংশধরেরা ইংরেজদের মন-মান রক্ষা করে তাদের আশীর্বাদ লাভ করে দীর্ঘকাল ক্ষমতাসীন ছিল। যার দরুন মীরজাফর বংশের অন্তত ৮ জনকে ইংরেজরা রাজ্য প্রশাসনের বিশেষ কর্তৃত্ব প্রদান করেছিল।

এক নজরে মীরজাফর বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ-

মধ্যযুগের অগণিত ব্যক্তির ন্যায় মীরজাফর নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায় ভাগ্য পরীক্ষার জন্য বাংলায় এসেছিলেন। মীরজাফরের পিতৃভূমি ও মাতৃভূমি তুরস্ক। তার মাতা, পিতা এবং একই বংশের সকলে তুর্কি সুন্নি ছিলেন। এই ধারাবাহিকতায়, তিনিও তুরস্কে জন্মগ্রহণকারী সুন্নি ধর্মাবলম্বি মুসলমান ছিলেন। তবে মীরজাফর নিজ মাতাপিতার মৃত্যুর পর, সৎমা (যিনি আফসার বংশীয় শিয়া মুসলিম ছিলেন)-র কাছে লালিতপালিত হন। তার সৎমা ইরাকের নাজাফ প্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন। তাই অতীত ইতিহাস বলে...

অনাথ বালক মীরজাফর মানুষ হয়েছিলেন, তার সৎমার বাড়িতেই, ইরাকের নাজাফে। আর এভাবেই একদিন, নিজ ভাগ্য পরিবর্তনের আসায় খালি হাতে সুদূর ইরাক থেকে মীরজাফরের বাংলায় আগমন ঘটে। স্বল্প সময়ে নিতান্ত সৌভাগ্যক্রমে মীরজাফর মহৎ হৃদয়ের ব্যক্তি নবাব আলিবর্দী খানের কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে সক্ষম হন। আলিবর্দী খান তাকে সেনাবাহিনীর প্রধান করেন এবং তার সঙ্গে নিজ সৎ বোন শাহ খানমের বিয়ে দেন। আলিবর্দী খানের সৎমা ছিলেন খোরাসানের আফসার বংশীয় তুর্কি শিয়া মুসলিম। আলিবর্দী খান মুর্শিদাবাদের জাফরাগঞ্জ প্রাসাদটি নির্মাণ করেন.... তার সৎবোন শাহ খানমের

www.pathagar.com

জন্য। বিয়ের পর শাহ খানম তার স্বামী মীরজাফরের সাথে এই প্রাসাদেই বসবাস করতেন। স্বভাবত বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর একবার নবাব আলিবর্দী খানকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করেছিল। এর মধ্যে দিয়ে মীরজাফরের বাংলা দখলের চক্রান্ত হলো উদঘাটিত। সেজন্য মীরজাফর কোরআন শরীফ মাথায় নিয়ে অর্ধরাত পর্যন্ত কেঁদে কেটে মাফ পেলেন নবাব আলিবর্দীর। বহাল হলেন পূর্বপদে। আবার জালিয়াতি, আবার চুরি, দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র। আবার বরখাস্ত হলেন মীরজাফর। কিন্তু অসীম দয়ালু আলিবর্দী খান আবারও ক্ষমা করলেন মীরজাফরকে। তিনি পবিত্র কোরআন শরীফ মাথায় নিয়ে শপথ করলেন তিনি কখনও আর বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না এবং নবাবের অবর্তমানে বীর সিরাজউদ্দৌলাকে প্রতি পদে পদে রক্ষা করবেন। এবারও মীরজাফর তার নিজ ওয়াদা থেকে সরে এলেন.... বিশ্বাসঘাতকতা করলেন বাংলার সাথে, বাংলার বীর দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজের সাথে। বাংলাকে তুলে দিলেন বিশ্বাসঘাতকদের হাতে। আর এভাবেই বাংলার প্রতিটি দেশপ্রেমিক হৃদয় বিশ্বাসঘাতক শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত হলো প্রায় ২০০ বছর। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক, বেঈমান মীরজাফর আলি খানের ঘোষিত ৩ জন স্ত্রী থাকলেও, বিভিন্ন ধর্মের কম বয়সি সুন্দরী নারীদের সাথে অবৈধ শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন তিনি। এই অবৈধ সম্পর্কের বন্ধনে মীরজাফর অজস্র ইহুদি, হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান নারীর গর্ভে তাঁর সন্তান উপহার দেন। অতীতে ইতিহাস থেকে জানা যায়... ঘোষিত এবং অঘোষিত হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান, ইহুদি স্ত্রী থেকে মীরজাফর অজস্র সন্তান লাভ করেন। শুধু মীরজাফরের সবচেয়ে ছোট সন্তান মুবারকউদ্দৌলার ১০ জন বিবাহিত হিন্দু ও মুসলিম স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের ঘরে জন্ম নেয় ১৩ কন্যা সন্তান এবং ১২ পুত্র সন্তান। মীরজাফর বংশের শেষ নবাব ছিলেন ফারেদুন জাহ, তিনিও একাধিক হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান নারীকে বিয়ে করেন। ফারেদুন জাহের কন্যা সন্তান ৩৪ জন আর পুত্র সন্তান ১৬ জন। মীরজাফর বংশের পরবর্তী প্রজন্মরা যুগে যুগে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং আজও আছে বহাল তবিয়তে। আর নীরবে দংশন করে যাচ্ছে আম জনতাকে।

মীরজাফর জন্মসূত্রে তুরস্কের সুন্নি মুসলমান। জন্মসূত্রে সুন্নি মুসলমান হয়েও মীরজাফর তার সৎমায়ের কাছে থাকাকালীন অবস্থায়, শিয়া ধর্মের অনুসারী হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত তার নবাবি আমলের মাঝামাঝি সময়ে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নন্দকুমারের পরামর্শে হিন্দু দেবীর পা ধোয়া পানি পান করে হিন্দু হয়ে পড়েন। আর এভাবে নিজ স্বার্থের জন্য মীরজাফর ও তার বংশধরেরা বারবার গিরগিটির মতো রঙ ও ধর্ম পরিবর্তন করে আসছে বাংলার জমিনে।

বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক আর বেঈমান মীরজাফরের ঘোষিত ৩ জন স্ত্রী ছিল। এরা হলেন শাহ খানম, মুন্নি বাঈ, বাব্বু বাঈ। আর অঘোষিত স্ত্রী ছিলেন একাধিক। ১৭৫৭ সালের ২৫ জুন - ১৭৬৫ সালে করুণ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইংরেজদের পরিচালিত পুতুল নবাব ছিলেন মীরজাফর, এর মধ্যবর্তী স্বল্প

www.pathagar.com

এক সময়ে মীরজাফর জামাতা মীর কাশিম (১৭৬০-১৭৬৩) ইংরেজদের মনোনিত নবাব হন। ১৭৬৫ সালে মীরজাফরের মৃত্যুর পর নবাব হলেন মুন্নি বাঈ-এর গর্ভজাত, মীরজাফরের কম বয়সি পুত্র নাজমুদ্দৌলা। বয়স কম হওয়ায় তার অভিভাবক হয়ে রইলেন মীরজাফর পত্নী মুন্নি বাঈ। কিন্তু তার নিয়োগ নিয়ে ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ইংরেজদের সহযোগিতায় মীরজাফরের অন্য পত্নী কর্তৃক তাকে বিষপানে হত্যা করা হয় ১৭৬৬ সালে। এরপর মাত্র ৬ বছর বয়সে মীরজাফরের আরেক পুত্র সাঈফউদ্দৌলা রাজ্যের নবাব হন। সাঈফউদ্দৌলার মা ছিলেন মুন্নি বাঈ, এবারও নামেমাত্র নবাব। ক্ষমতাহীন অভিভাবক মুন্নি বাঈ। তাতেও সন্তুষ্ট নয় ইংরেজরা। আবার ষড়যন্ত্র করল তার বিরুদ্ধেও। তাকেও হত্যা করা হলো বিষ প্রয়োগে ১৭৭০ সালে। মীরজাফরের তৃতীয় ঘোষিত স্ত্রী বাব্বু বেগমের গর্ভজাত পুত্র মুবারক উদ্দৌলা। এবার তিনি হলেন নবাব। বয়স মাত্র ১২ বছর। নাবালক নবাবের অভিভাবককে হবেন? এই নিয়ে রেষারেষি চলতে থাকল মুন্নি আর বাব্বুর মধ্যে। বাব্বু বাঈ ছিলেন অনেকটা স্বাধীনচেতা। মুন্নি বাঈ তার নবাব সন্তানদের অভিভাবকত্ব নিয়ে ইংরেজদের বাধ্যগত হয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই বাব্বু বাঈ নবনিযুক্ত নবাব মুবারকউদ্দৌলার মা হলেও তার অভিভাবক হিসেবে মুন্নিকে ইংরেজদের পছন্দ। তাই মুন্নি বাঈ নিযুক্ত হলেন অভিভাবক। মুন্নির নবাবিতে নিযুক্ত তার গর্ভজাত দু'টি পুত্রেরই অভিভাবক ছিলেন তিনি। কিন্তু নিজের ভুলেই অকালে হারিয়েছেন দু'জনকেই। মাঝে মধ্যে কিছু কিছু অবাধ্যতার কারণে। কিন্তু এবার আর সে ভুল করলেন না। ইংরেজদের পুরোপুরি আজ্ঞাবাহীরূপে দেশ চালাতে লাগলেন। তাতে প্রশাসনে চরম বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে। ১৭৯৩ সালে মুবারকউদ্দৌলার মৃত্যু হয়। মুন্নি বাঈ চাইলেন তার আপন ভাই মীর মাংলীকে নবাবের আসনে বসাতে।

কিন্তু মুবারকউদ্দৌলার পুত্র বাবর আলী চাইলেন নবাব হতে। বেঁধে গেল বিবাদ। ইংরেজরা বলল, তাদেরকেই ঠিক করতে হবে, কে হবেন নবাব। তুমুল দেনদরবার। অবশেষে জয়ী হলেন মীরজাফরের ছোট পুত্র মুবারকউদ্দৌলার ছেলে বাবর আলী। তার নবাব হওয়ার পেছনে শক্তিশালী ভূমিকা গ্রহণ করেন মীরজাফরের বড় ছেলে মীরনের পুত্র মীর সাঈদু ও মর্তুজা খান। ১৭৯৩-১৮০২ বিমাতা মুন্নি বাঈ এর সাথে চরম বিবাদ আর অসহযোগিতা নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে হয় নবাব বাবর আলীকে। ১৮০২ সাল তাদের বিবাদ মিটে যায়। মুন্নির সাহায্য ও পরামর্শ নিয়ে এবং ইংরেজদের মনোরঞ্জন করে রাজ্যশাসন করতে থাকেন বাবর আলী। ১৮১০ সালে মারা যান তিনি। এরপর নবাব হন জয়েনউদ্দীন আলীজাহ খান তিনি বাবর আলীর আপন ভাই। ইংরেজদের ইচ্ছাপূরণ করে রাজ্য পরিচালনা করেন তিনি। তার আমলেই প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।

১৮২১ সালে ইংরেজদের কৃপায় নবাব হলেন ওয়ালা জাহ। তিনি বাবর আলীর ২য় পুত্র। কাউকে পরোয়া করতেন না। এমন কড়া মেজাজের মানুষটিও ইংরেজদের খুব সমীহ করে চলতেন। নবাব ওয়ালা জাহর মৃত্যুর পর নবাব

www.pathagar.com

হলেন হুমায়ুন জাহ ১৮২৪ সালে। প্রতিদিন কয়েকবার পোশাক পাল্টাতেন। সবসময় আতর মাখা অবস্থায় থাকতেন। মুসলমান হয়েও রাষ্ট্রের সর্বত্র মুসলিম সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য নষ্ট করে দিতে প্রতিষ্ঠা করেন ইংরেজ সংস্কৃতি। এত দিন রাষ্ট্র ভাষা ছিল ফার্সি। নবাব হুমায়ুন জাহ রাজ্য থেকে ফার্সিকে বিদায় করে দিয়ে তার বদলে চালু করেন ইংরেজি। এতে বেকার হয়ে গেল মুসলমান চাকরিজীবীরা। তার রাজত্বকাল ছিল ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত। এরপর বাংলার নবাব হলেন ফারেদুন জাহ। মীরজাফর বংশের শেষ নবাব। তার নবাবিকালে বাংলা জুড়ে জ্বলছিল বিপদের আগুন। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির আন্দোলন। সেই ধারাবাহিকতায় ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ-এর দাবানল জ্বলছিল ভারতজুড়ে। শুধু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের মতো কিছু লোক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য উপাসনায় রত ছিলেন। এদিকে ফারেদুন জাহ মুসলমান ও বাঙালিদের বিভিন্ন আন্দোলনে ভীত হয়ে পালিয়ে গেলেন বিলাতে, আর ইংরেজদের কাছে জোর দাবি করলেন, তাকে আরও পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিতে, সেই সাথে তিনি আরও চেয়ে বসলেন, তাকে বাংলার স্বাধীন নবাব বলে ঘোষণা করতে হবে। ইংরেজরা তার দাবি মানলেন না। প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে বিলেত থেকে ফিরে এলেন। বর্জন করলেন 'বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব নাজিম' উপাধি। তার মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক নবাবি ছিল ১৮৮১ সাল পর্যন্ত। বন্ধুরা চলুন এবার ধারাবাহিকতায় জেনেনি, চিনেনি ঘৃণিত মীরজাফরের বংশধরদের। মীরজাফরের প্রথম স্ত্রী ছিলেন শাহ খানম। শাহ খানমের সন্তান ছিলেন মীরন এবং ফাতেমা, ফাতেমার স্বামী ছিল বিশ্বাসঘাতক মীর কাশিম। মীরনের ঘোষিত ৫ জন স্ত্রী ছিলেন, এরা হলেন; সালিহা বেগম, কুমারি খানম, বিবি ফজিলাতুননেসা, বিবি আমিরুন নেসা এবং মোমিনা বেগম। মীরনের দু'জন পুত্রের কথা জানা যায় প্রথম জন হলেন মীর সাঈদু, দ্বিতীয় জন হলেন মর্তুজা খান। মর্তুজা খানের পুত্র মুস্তাফা খান, মুস্তাফার পুত্র আসাদুল্লাহ খান, আসাদুল্লাহ খানের পুত্র আজম আলী খান, আজমের পুত্র ফয়েজ আলী খান, ফয়েজের পুত্র জাফর আলী খান, রেজা আলী, তাজ আলী, হাসান আলী প্রমুখ। জাফর আলীর বংশধরগণ মুর্শিদাবাদের জাফরাগঞ্জে আজও কেউ কেউ বসবাস করছেন। আবার অনেকে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। এই বংশের লোকেরা মুর্শিদাবাদের মধ্যে সবচেয়ে কুলীন বলে পরিচিত। তারা ইংরেজ সরকার থেকে ভাতা পেলেও কোনোদিন নবাবি পাননি। তারা নিজেদের মীরন বংশের বা জাফরাগঞ্জ বংশের বলে পরিচয় দেন। মীরনের একমাত্র বোন ফাতেমার সন্তানরা হলেন- গুল (পুত্র) ও বাহার (কন্যা)। মীর কাশিমকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর ইংরেজরা তার একমাত্র পুত্র গুলকে গভীর জঙ্গলে হত্যা করে।

মীরজাফরের ২য় স্ত্রী নর্তকি মুন্নি বাঈ। মুন্নি বাঈর দু'পুত্র সন্তান ছিল। এরা হলো নাজমুদ্দৌলা এবং সাঈফউদ্দৌলা।

নর্তকি বাব্বু বাঈজি মীরজাফরের তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন। বাব্বু বাঈ এবং মীরজাফর দম্পতির একমাত্র সন্তান মুবারকউদ্দৌলা (১৭৫৯-১৭৯৩)।

www.pathagar.com

মুবারকউদ্দৌলা মীরজাফরের এবং এই বংশের সবচেয়ে ছোট ছেলে। মীরজাফরের ছোট পুত্র মুবারকউদ্দৌলার ১০ জন বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন। মুবারকউদ্দৌলা প্রথম বিবাহ করেন ফজর আলী খানের মেয়ে ও রেজা খানের ভাগ্নিকে। তার ২য় স্ত্রী ফয়জুননেসা, তৃতীয় স্ত্রী জাহান বেগম, ৪র্থ স্ত্রী আমিরুন নেসা বেগম, ৫ম স্ত্রী শারফুন নেসা খানম, ৬ষ্ঠ স্ত্রী মোবারোকুননেসা খানম, ৭ম স্ত্রী লুৎফুননেসা খানম, ৮ম স্ত্রী বুন্নু খানম, ৯ম স্ত্রী ব্রিজ মহল বক্স, ১০ম স্ত্রী আদ্দা কুঁনওয়ার। মীরজাফর পুত্র মুবারকউদ্দৌলা এবং তার ১০ স্ত্রী দম্পতির ঘরে জন্ম নেয় ১২ পুত্র সন্তান এবং ১৩ কন্যা সন্তান। এই বংশধারার পরবর্তী প্রজন্মরা বিশেষ করে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আর দংশন করছে নিরীহ মানুষজনকে। মুবারকউদ্দৌলার কয়েকজন পুত্র মুর্শিদাবাদের নবাব হন। তারা হলেন : বাবর আলী ও জয়েন উদ্দীন আলী জাহ খান। বাবর আলীর ২য় পুত্র ওয়ালা জাহও মুর্শিদাবাদে নবাবি করেন। তার পরে তারই রক্তধারার হুমায়ুন জাহ এবং হুমায়ুন জাহের মৃত্যুর পর মীরজাফর বংশের শেষ নবাব ছিলেন ফারেদুন জাহ। ফারেদুন জাহও একাধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ফারেদুন জাহের পুত্র সন্তান ১৬ জন এবং কন্যা সন্তান ৩৪ জন।

বাংলা অভিধানে এদ্দিন মীরজাফর শব্দটি জায়গা না পেলেও জনজীবনে ছিল এর ব্যাপক প্রচলন। এই প্রচলনের প্রধান কারণ পলাশী ট্রাজেডির পর সিরাজ বংশের অনেককেই খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হয়। কিন্তু মীরজাফরদের বংশ ড্রাকুলার মতো জ্যামিতিক হারে বিস্তার লাভ করে। ক্লাইভ বা ইংরেজদের কল্যাণে তারা মহাধুমধামের সঙ্গে বংশ বিস্তার ঘটায়। ডোবা-পচা জলাশয় তো মশককুলের প্রজনন কেন্দ্র। ফলে বাংলাভাষী জনগণ এই প্রাণীদের দ্বারা সর্বদাই হয়েছে উৎপীড়িত, সঙ্গত কারণেই জীবন থেকে শব্দটি মুছে ফেলা যায়নি। পলাশী ট্রাজেডির ২১৪ বছর পর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতার ৪৪ বছর অতিবাহিত হলেও পলাশীর বিভীষিকার চিহ্ন আজো মুছে যায়নি। এখনো নব্য মীরজাফর, মীরন, ঘসেটি বেগম-রাজবল্লভ-ক্লাইভরা নতুন রূপে রঙ্গে আজকের বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ বিশ্বের কম বেশি সব দেশেই চষে বেড়াচ্ছে। মীরজাফর, রাজবল্লভ-ক্লাইভ-মীর বংশের নতুন প্রজন্ম দ্বারা, আজও প্রতারিত হচ্ছেন নিরীহ সাধারণ মানুষেরা, কারণ সাধারণ মানুষের ভিতর ৯৫% মানুষ জানে না এদের আসল বংশ পরিচয়!!!

পলাশীর শিক্ষা থেকে এ বিষয়ে প্রতীয়মান হয় যে, এখনও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, সিরাজ পরিবারের বিরুদ্ধে কিছু অশুভ চক্র সক্রিয় রয়েছে। তাই চলুন বন্ধুরা এই মুহূর্তে, পলাশীর পুনরাবৃত্তি রোধে আমাদের ইস্পাত কঠিন ঐক্য ঘরে- পরিবারে, সমাজে-রাষ্ট্রে গড়ে তুলতে হবে। আর দেশ, সমাজ এবং পরিবারের মঙ্গলের জন্য নব্য মীরজাফর পরিবারসহ পলাশীর ষড়যন্ত্রে সম্পৃক্ত অন্যান্য দুষ্কৃতকারী পরিবারের নব্য সদস্যদের থেকে সতর্ক ও দূরত্ব বজায় থাকতে হবে সকলকে এবং সামাজিকভাবে এদের এক ঘরে বয়কট করতে হবে। এতেই রক্তাক্ত পলাশীর বীর শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে।

www.pathagar.com

ঐতিহ্যের ছোঁয়ায় বাংলাদেশ
লাল সবুজের হৃদয়ে বীর সিরাজউদ্দৌলা

লাল সবুজের হৃদয় জুড়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা। তাইতো ভারতের মতো বাংলাদেশও নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের স্মৃতি জড়িত বেশকিছু স্থাপনা আছে। সেগুলো হলো অযত্নে অবহেলায় ঢাকার বুকে দাঁড়িয়ে থাকা ঐতিহাসিক জিঞ্জিরা প্রাসাদ, মেহেরপুরের আমঝুপি কুঠির, ঈশ্বরদীর আলোবাগ মোড় থেকে শের শাহ রোড পর্যন্ত উৎসর্গ করা হয়েছে বীর নবাব আলিবর্দীর নামে তাইতো সড়কটির নাম নবাব আলিবর্দী খান সড়ক, ঢাকার আগারগাঁয়ে অবস্থিত শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১টি ভবন নবাব সিরাজউদ্দৌলার নামে, নাটোরে আছে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সরকারি কলেজ এবং সিরাজের আদর্শ ও চেতনার সৈনিক রানী ভবানীর সম্মানে সরকারি মহিলা কলেজ ও রাজবাড়ি, পুরাতন ঢাকার নয়াবাজারের কাছে জিন্দাবাহার জামে মসজিদ সংলগ্ন অযত্ন অবহেলায় পড়ে আছে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পার্ক। বাণিজ্যিক নগরী চট্টগ্রামে বীর নবাব সিরাজের স্মরণে নামকরণ করা হয়েছে একটি সড়ক, যা চট্টগ্রামবাসীর কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সড়ক নামে পরিচিত। কুষ্টিয়ার সদরে আছে নবাব সিরাজউদ্দৌলা রোড। শ্রদ্ধেয় ড. মুহাম্মদ ফজলুল হকের ভালোবাসার নিদর্শন কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অবস্থিত নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলেজ। ঢাকার পশ্চিম কাফরুলের আছে নবাব সিরাজউদ্দৌলা হাসপাতাল। যশোরের কেশবপুরে আছে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কাছারি বাড়ি। বাংলাদেশে একমাত্র সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে নির্মিত হয়েছে সর্বাধিক চলচ্চিত্র। যার মধ্যে শ্রদ্ধেয় খান আতার নির্মিত 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' চলচ্চিত্রটি আজও বাংলার মানুষের অন্তরে অন্তরে রয়ে গেছে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প গ্রন্থে মির্জা তারেকুল কাদের লিখেছেন : নবাব সিরাজউদ্দৌলা বিপুল অঙ্কের মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। স্বাধীনতা বোধ উজ্জীবিত এবং তপ্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ার পটভূমিতে নৈপুণ্যতার সঙ্গে নির্মিত হওয়ায় 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' চলচ্চিত্রটি দর্শকেরা সাদরে গ্রহণ করে নেন। চিত্রনাট্য, সংলাপ, সংগীত ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন খান আতাউর রহমান। এই ছবিটি ৩৫ মি.মি. এর। এই ছবিটিতে অভিনয় করেছেন আনোয়ার হোসেন, খান আতা, আনোয়ারা, তুহিনসহ আরও অনেকে। তৎকালীন সময়ে বাংলা এবং উর্দু ভাষায় মুক্তি পাওয়া উক্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি বক্স অফিসে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। উক্ত চলচ্চিত্রটি পরবর্তী সময়ে আবার নির্মাণ করা হয় সম্পূর্ণ রঙিনভাবে। এতে সিরাজউদ্দৌলা চরিত্রে প্রবীর মিত্র, বেগম লুৎফুন্নিসা চরিত্রে জিনাতসহ আরও অন্যান্য চরিত্রে খ্যাতিমান অভিনেতারা অভিনয় করেন। সফল চলচ্চিত্র পরিচালক এহতেশামের ছোট ভাই পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান নির্মাণ করেন 'বর্গী এলো দেশে' নামক চলচ্চিত্রটি। এতে নবাব আলিবর্দী খানের চরিত্রে অভিনয় করেন জনপ্রিয় অভিনেতা আল মনসুর

www.pathagar.com

আর কুখ্যাত ভাস্কর পণ্ডিতের ভাই দিবাকর এর চরিত্রে অভিনয় করেন অভিনেতা জহুর। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সন্তান এবং ৯ম বংশধর সৈয়দ গোলাম আব্বাসের প্রতিষ্ঠিত সংগঠন Shab ফ্রেন্ডশিপ গার্ডেন ঐতিহ্যের ভালোবাসায় দীর্ঘদিন যাবৎ ১৯ সেপ্টেম্বর নবাব সিরাজউদ্দৌলার শুভ জন্মদিন পালন করে আসছে। খ্যাতনামা নাট্যকার, কবি, সাহিত্যিক, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও দৈনিক ইত্তেফাকের সহযোগী সম্পাদক মরহুম সিকান্দার আবু জাফরের মতে, "জাতীয় চেতনা নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। কাজেই নতুন মূল্যবোধের তাগিদে ইতিহাসের বিভ্রান্তি এড়িয়ে ঐতিহ্য এবং প্রেরণার উৎস হিসেবে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে আমি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি। একান্তভাবে প্রকৃত ইতিহাসের কাছাকাছি থেকে এবং প্রতি পদক্ষেপে ইতিহাসকে অনুসরণ করে আমি সিরাজউদ্দৌলার জীবননাট্য পুনর্নির্মাণ করেছি। ধর্ম এবং নৈতিক আদর্শে সিরাজউদ্দৌলার যে অকৃত্রিম বিশ্বাস, তাঁর চরিত্রের যে দৃঢ়তা এবং মানবীয় সদগুণগুলোকে চাপা দেবার জন্য ঔপনিবেশিক চক্রান্তকারী ও তাদের স্বার্থান্ধ স্তাবকেরা অসত্যের পাহাড় জমিয়ে তুলেছিল, আমার নির্মিত নাটক 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা'-তে প্রধানতঃ সেই আদর্শ এবং মানবীয় গুণগুলোকেই আমি তুলে ধরতে চেয়েছি।" সাম্প্রতিককালে কুষ্টিয়ার 'স্মৃতি নাট্যগোষ্ঠী'র বাচ্চু সাহেবের সাথে নবাব সিরাজউদ্দৌলার নবম বংশধর হিসেবে আমার পরিচয় হয়। পরিচিত হবার পর জনাব বাচ্চু তাদের নাট্যগোষ্ঠীর মঞ্চস্থ নাটক 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' দেখার আমন্ত্রণ জানান দু'দুবার। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে B.T.V তে মঞ্চস্থ হওয়া 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটি দেখতে পারিনি। তাই ২০১৩ সালে একই নাটক বেইলি রোডের অফিসার্স ক্লাবে ২২.০২.২০১৩ তারিখে সন্ধ্যারাতে মঞ্চস্থ হওয়াতে, স্মৃতি নাট্যগোষ্ঠীর উদ্যোক্তা বাচ্চু সাহেবের অনুরোধে কয়েকজনসহ উক্ত নাটকটি দেখতে যাই। উক্ত নাটকের কলাকুশলীবৃন্দ আমাকে অর্থাৎ নবাবের নবম বংশধরকে কাছে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে আছে 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' ব্যবহৃত একটি তরবারি। এর দৈর্ঘ্য সোয়া ৪২ ইঞ্চি। এর হাতল হাতির দাঁত দিয়ে বানানো। তরবারিটির গায়ে আরবি লিপি খচিত। এ মহামূল্যবান নিদর্শনটি আছে অস্ত্রশস্ত্র গ্যালারির একটি শোকেসে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁর পরিবারের ভালোবাসায় বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির জাতীয় দৈনিক নয়াদিগন্ত পলাশী দিবস উপলক্ষে বেশকিছু পাতা জুড়ে নামি দামি লেখকের লেখা ফিচার আকারে প্রকাশের বিশাল আয়োজন করে। অন্য উদ্যোক্তারা হলেন দৈনিক আমার দেশ, দৈনিক সমকাল, দৈনিক কালের কণ্ঠ, দৈনিক মানবজমিন, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক ইত্তেফাকসহ আরো বেশকিছু প্রথম শ্রেণির জাতীয় দৈনিক। বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও টি ভি চ্যানেলে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের নতুন প্রজন্মের কথা তুলে ধরেছেন যেই সব শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক বন্ধুরা তাঁরা হলেন : ড. মুহাম্মদ ফজলুল হক (সম্পাদক, সাপ্তাহিক পলাশী), শাইখ সিরাজ পরিচালক,

www.pathagar.com

(চ্যানেল আই), সঞ্জয় চাকী (চ্যানেল আই), রেহানা পারভিন রুমা (আমার দেশ), বিউটি আক্তার (আমার দেশ), আলমগীর হোসেন হেলাল (অর্থবিও), মুহাম্মদ রবিউল আলম (পলাশী), মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান তুহিন (কালের কণ্ঠ), ফকরে আলম (কালের কণ্ঠ), সাবিরা সুলতানা ঝর্না (নয়া দিগন্ত), গোপাল মুনির (নয়া দিগন্ত), মোসাহেদ (নয়া দিগন্ত), গোলাম মোজতবা লিটন (বিনোদন), নাসির আহাম্মেদ (সমকাল), রনজু চৌধুরী (সমকাল), রাবেয়া বেবি (দৈনিক ইত্তেফাক), শেখ আরিফ বুলবন (নিউ নেশন), আশা মেহরীন আমিন (ডেইলি স্টার), রাইসা (ডেইলি স্টার), মতিউর রহমান (মানবজমিন), লায়েকুজ্জামান (মানবজমিন), জয়নুল আবেদিন (মানবজমিন), আদনান ফকির (ডেইলি সান), সাবা এল কবির (ডেইলি সান), লাবণ্য লিপি (যুগান্তর), কালাম আজাদ (বাংলাদেশ প্রতিদিন), রেদওয়ানুল হক (ফুল কুঁড়ি), সৈয়দ তোশারফ আলী (রোববার), কামাল হোসেন বাবলু (রোববার)। মরহুম ফজলে লোহানী তাঁর উপস্থাপনায় পরিচালিত 'যদি কিছু মনে না করেন' নামক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবাব সিরাজ পরিবারকে সর্বপ্রথম টি.ভি-র পর্দায় আনেন আর আজকের মিডিয়ার উজ্জ্বল নক্ষত্র শ্রদ্ধেয় শাইখ সিরাজ ২৩ জুন ২০১২ ইং তারিখে চ্যানেল আই-এর পর্দায় আনেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৯ম বংশধর সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেবকে। উক্ত দিনে চ্যানেল আই-এ প্রচারিত সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ সংবাদে সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের নতুন প্রজন্মের বক্তব্য তুলে ধরা হয়। সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেবের সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন চ্যানেল আই-এর সিনিয়র সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় সঞ্জয় চাকী। একই বছর ২৯.১০.২০১২-তে চ্যানেল আই এবং রেডিও ভূমি ৯২.৮ Fm এ প্রচারিত জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'কৃষকের ঈদ আনন্দ'-তে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৯ম বংশধর সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেবের নিজ পরিবার সম্পর্কে কিছু অজানা কথা উক্ত অনুষ্ঠানটিতে প্রচার করা হয়। সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ভালোবাসায় উদ্যোগটি সফল করেছিলেন চ্যানেল আই -এর প্রিয় তিনটি মুখ, তারা হলেন শ্রদ্ধেয় শাইখ সিরাজ, আদিত্য শাহীন, সঞ্জয় চাকী। ঢাকা সিটি স্কুলের অধ্যক্ষ এবং সাপ্তাহিক অর্থবিত্তের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন হেলালের উগ্যোগে n.t.v -র প্রাণ মিল্ক ক্যান্ডি 'জানার আছে বলার আছে' অনুষ্ঠানটির ১৯ সেপ্টেম্বর- ২০১২ ইং তারিখ পর্বে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ২৮৫তম জন্মদিনে নবাবের ৯ম বংশধর সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেবকে উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি হিসেবে দেখা যায়। উক্ত অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ছিলেন দেবাশীষ বিশ্বাস। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় ড. মুহাম্মদ ফজলুল হক, পলাশীর শহীদ বীরদের প্রতি ও নবাব সিরাজের প্রতি বুকে শ্রদ্ধা রেখে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রকাশ করে যাচ্ছেন 'সাপ্তাহিক পলাশী' নামক একটি ম্যাগাজিন। সিরাজ পরিবার শ্রদ্ধেয় ড. মুহাম্মদ ফজলুল হক স্যার, শ্রদ্ধেয় শাইখ সিরাজ স্যারসহ উক্ত রচনায় উল্লিখিত সকল সাংবাদিক ব্যক্তিত্বকে সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের প্রতি তাঁদের হৃদয়ের এই ভালোবাসাকে শ্রদ্ধার সহিত

www.pathagar.com

সালাম জানায়। সিরাজউদ্দৌলা পরিবার পাশে পেয়েছে আজকের সমাজের দুজন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্বকে তাঁরা হলেন জনাব মোহাম্মদ তারিক উদ্দিন চৌধুরী (সমাজসেবক) এবং জনাব রমিত আজাদ (শিক্ষাবিদ)। তাঁদের অনুপ্রেরণায় সিরাজ পরিবারের নতুন প্রজন্মের এগিয়ে চলা। আর এরই চারিপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লাল সবুজের অসংখ্য ভক্ত হৃদয়। নবাব সিরাজ পরিবারের দুঃখজনক অবস্থার কথা ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহর কর্ণগোচর করা হলে তিনি তদানীন্তন বাংলার গভর্নরের নিকট সিরাজ পরিবারের ৬ষ্ঠ বংশধর সৈয়দ জাকি রেজাকে ১টি সম্মান জনক চাকরি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। উক্ত চিঠিটি ঢাকার আহসান মঞ্জিল থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ ইং তারিখে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত, উক্ত চিঠির প্রেক্ষিতে সৈয়দ জাকি রেজাকে সাব রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ দেয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। এই সেই আহসান মঞ্জিল, যা নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় ছিল ফরাসিদের একটি কুঠি। সেই দিনকার আহসান মঞ্জিল, আজকের সদরঘাটের ওয়াইজঘাটে যার অবস্থান। বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতের মধ্যে স্টুডেন্ট ওয়েজ এবং তাঁর সহযোগী প্রকাশনা তন্ময় প্রকাশনী এবং বর্ষাদুপুর তাঁদের প্রকাশনা থেকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং সেই সময়কেন্দ্রিক একাধিক বই প্রকাশিত করে নবাব সিরাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বইগুলো : ১। নবাব সিরাজউদ্দৌলা সেকালের সমাজ ও রাজনীতি : মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ ২। সিরাজউদ্দৌলার দেশে : আহমাদ কাফিল ৩। মোগল যুগে ঢাকার শাসকদের কথা-কাহিনী : শেখ মাসুম কামাল ৪। সিরাজউদ্দৌলা থেকে শেখ মুজিব : মাহমুদুল বাসার। নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবার থেকে বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত অনেক অজানা নতুন তথ্য নিয়ে মো: লিয়াকত উল্লাহ এবং মো: মাশফিক উল্লাহ তন্ময় তাঁদের বর্ষাদুপুর প্রকাশনা থেকে আজকের তারুণ্যের জন্য প্রকাশ করেছেন : 'ভালোবাসার বন্ধনে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবার' এবং 'ফুলের সৌরভে হৃদয়ের বন্ধনে SHAB' নামক ব্যতিক্রমধর্মী ২টি বই। বইটি নিয়ে বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির বিভিন্ন সংবাদপত্র ও টি.ভি চ্যানেলে ব্যাপক পজেটিভ আলোচনা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় মোঃ ফারুক হোসেন তাঁর বুকস্ ফেয়ার প্রকাশনী থেকে সিরাজ পরিবারের ভালোবাসায় প্রকাশ করেছেন : 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের অজানা কথা'- নামক গবেষণাধর্মী মূল্যবান গ্রন্থটি। উক্ত গ্রন্থটি নিয়ে বাংলাদেশের জনপ্রিয় মিডিয়াগুলো বারবার আলোকপাত করাতে পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগায়।

১৭৫৩-১৭৫৪ সালের মাঝামাঝি এক সময়ে অজিত দাস নামে এক লোক ভারতের মুর্শিদাবাদে সিরাজউদ্দৌলাকে চিঠি লিখেন বিক্রমপুরের বেজগাঁওতে রাজ বল্লভের অত্যাচার নিয়ে। সিরাজ তখনও নবাব হননি। তিনি প্রথম ঢাকার জিঞ্জিরা প্রাসাদে আসেন এবং রাজ বল্লভের পুত্রদের অত্যাচার না করার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেন। তারপরও অত্যাচার থামানো যায়নি। এসব নানা কারণে সিরাজ নানাজান আলিবর্দীর সাথে পরামর্শ করে ঢাকার ক্ষমতা থেকে

www.pathagar.com

রাজবল্লভকে সরিয়ে জেসারত খাকে বসান। এদিকে নবাব আলিবর্দী খান ইকরামউদ্দৌলাকে ঢাকার নবাব বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বিধি বাম এই ঘোষণার কিছু দিন পরই সিরাজের ভাই ইকরামউদ্দৌলা অকালে মৃত্যুবরণ করেন। বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে পলাশীর যুদ্ধে দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হারিয়ে মীরনের নির্দেশেই সিরাজের মা আমিনা বেগম, স্ত্রী লুৎফুন্নিসা, কন্যা উম্মে জোহরা, নানী শরফুন্নিসাসহ আরও কিছু আত্মীয়কে ঢাকার জিঞ্জিরা প্রাসাদে নির্বাসন দেওয়া হয়। সেই নির্বাসন জীবন ছিল তাদের পূর্বের জীবনের পুরোই বিপরীত। সেই দুঃসহ জীবনের দুঃসহ স্মৃতিকথা শুনলে যে কারোই মনে জেগে উঠবে মীরনের প্রতি তীব্র ঘৃণা। বন্দি অবস্থায় সম্মানিত সিরাজ পরিবারের নারীদের ওপর শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হতো। কোনো কোনো দিন খাওয়া ও পানি পান করা থেকে বঞ্চিত করা হতো। শরীরের কিছু অংশে ছুঁড়ে ফেলা হতো গরম পানি। সকলকে রাখা হতো ভয়ভীতি আতঙ্কের মধ্যে। এরই মধ্যে দুঃখকষ্টে পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে সুদীর্ঘ সময় কাটতে থাকলো ঢাকার জিঞ্জিরা প্রাসাদেই, বিনা দোষে বন্দিনীর মতো জীবনযাপন করে। ঢাকায় আট বছরের বন্দি জীবন কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সিরাজ পরিবারের স্মৃতিগাঁথা সেই ঐতিহাসিক জিঞ্জিরা ভবন এখনও বিদ্যমান। প্রাসাদ এবং প্রাসাদের কিছু কক্ষ দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে। প্রাসাদ এলাকার ভবনগুলো সংরক্ষণে বাংলাদেশ সরকারের কোনো উদ্যোগ না থাকলেও ঐতিহাসিক এই নিদর্শনটি দেখতে এখনও ভ্রমণ পিপাসু সিরাজভক্তদের ভিড় জমে ঢাকার কেরানীগঞ্জে। সিরাজ আমলে এই প্রাসাদের পারিপার্শ্বিক এলাকাসহ প্রাসাদ স্থলটি তখন ছিল চারপাশে নদীবেষ্টিত একটি দ্বীপের মতো। এ কারণে নির্মিত প্রাসাদটির নামকরণ করা হয় কসরে জাজিরা বা দ্বীপের প্রাসাদ। প্রাসাদটি বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে নির্মিত হয়েছিল এবং প্রাসাদের সঙ্গে ভাসমান কাঠের সেতু স্থাপন করে ঢাকার কাটরায় যাতায়াত হতো। প্রায় পৌনে চারশ বছর পুরনো এই প্রাসাদটি ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার জিঞ্জিরা ইউনিয়নের পীর মোহাম্মদ বালিকা বিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশে এবং জিঞ্জিরা বাস রোডের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত। প্রাসাদের সুপ্রশস্ত ভেতর এবং চারপাশের পরিখা, প্রাসাদ স্থলটি স্থানীয় হাউলি (হাভেলির অপভ্রংশ) নামে পরিচিত। তবে কালের বিবর্তনে জিঞ্জিরা প্রাসাদের অনেকগুলো ভবন দখল হয়ে গেছে। জিঞ্জিরা প্রাসাদের সুনির্দিষ্ট ৪টি ভবন ছাড়া বাকি ভবনগুলো দখল হয়ে গেছে। যারা এগুলো দখল করে আছেন, ভাবখানা এমন যে... তারা প্রাসাদ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। অবৈধভাবে এই সম্পত্তির মালিকদের দাবিদার এখন প্রাসাদে বসবাসকারীরা। এজন্য জাল কাগজপত্রও তৈরি করেছেন। বাংলাদেশ সরকারের অবহেলার কারণে বর্তমানে এর চারপাশে গড়ে উঠেছে ঘিঞ্জি বসতি ও বাণিজ্যিক স্থাপনা। জিঞ্জিরা প্রাসাদ প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের অধিভুক্ত স্থাপনার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের হুঁস, জ্ঞান, বিবেক, ভালোবাসা কোথায়? জাহাঙ্গীরনগর

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মোজাম্মেল হকের তত্ত্বাবধানে ঢাকার যে ৩১টি প্রত্নস্থাপনের ওপর যে গবেষণা হয়েছে তার মধ্যে জিঞ্জিরা প্রাসাদ ও জিঞ্জিরা হাম্মাম অন্যতম। সিরাজের আপনজন ও কাছের মানুষ মিলিয়ে মোট ৭২ সদস্যকে ঢাকার জিঞ্জিরা প্রাসাদে আটক রাখা হয়েছিল। নিষ্ঠুর, অত্যাচারের সাক্ষ্য এই জিঞ্জিরা প্রাসাদ। ভবনে ঢোকার দরজার পাশে রয়েছে লোহার সিঁড়ি। এটি বেয়ে ছাদে উঠলে দেখা যায় পরগাছায় ভবনের ছাদ ছেয়ে আছে। ছাদে উঠতেই গা শিউরে উঠবে অনেকের। সুড়ঙ্গপথ দেখতে চাইলে ভূত-প্রেতের কাল্পনিক গল্প শোনালেন স্থানীয় প্রাসাদ দখলকারীরা। সুড়ঙ্গপথে বড় বড় সাপ আছে বলে তাদের বিশ্বাস। তবে এগুলো কারো ক্ষতি করে না বলে জানালেন তারা। স্থানীয় কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, জিঞ্জিরা প্রাসাদে অনেক কক্ষ ছিল। এর মধ্যে সদর কক্ষ, বিচারালয়, বিশ্রামকক্ষ, কূপকক্ষ, পানি সংরক্ষণ কক্ষ ও পাইক পেয়াদা থেকে শুরু করে সবমিলে ৭-৮ টি ভবন ছিল। এর মধ্যে ৩টি ছিল মূল ভবন ও ১টি ছিল হাম্মাম, বাংলাদেশ সরকারের উদাসীনতার কারণে এসব ভবনের কয়েকটি ভেঙে দখলদাররা নতুন করে আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন তুলেছে। এত কিছু ঘটে যাওয়ার পরও বাংলাদেশের সরকার এখনও নিশ্চুপ। বাহরে বাঙালি জাতি!! বাহরে বাংলাদেশের সরকার!!! কোনো বিবেকবান জাতি বা সরকার এভাবে ঐতিহাসিক নিদর্শন সজ্ঞানে ধ্বংস করতে নিশ্চুপ থেকে সাহায্য করতে পারে?

বাংলার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর সন্তান নবাব সিরাজউদ্দৌলার মা-স্ত্রী-কন্যাসহ অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের দুঃসহ কিছু বেদনাদায়ক স্মৃতি জড়িয়ে আছে ঢাকার জিঞ্জিরা প্রাসাদকে ঘিরে। ইতিহাসের পাতায় বিষয়টি বড় আকারে দেখা হলেও নবাব পরিবারের স্মৃতি বিজড়িত প্রাসাদটির বর্তমান হাল বড়ই করুন। আর এই প্রাসাদের ব্যাপারে কোনো কালেই কোনো সরকারের তেমন উদ্বেগ লক্ষ করা যায়নি। ঢাকার দক্ষিণ তীরে বুড়িগঙ্গা নদী ঘেঁষে জিঞ্জিরা বাজারের দক্ষিণ পাশে হাউলি নামক মহল্লায় জিঞ্জিরা প্রাসাদের অবস্থান। স্থানীয়দের কাছে দর্শনীয় এই স্থানটি 'নগরা' নামে পরিচিত। প্রতিদিন সেখানে অনেক দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে। যা নবাব সিরাজউদ্দৌলার আপনজনদের বন্দি জীবনের দুঃসহ স্মৃতি জড়িত এই প্রাসাদ দেখতে দেখতে কারও কারও চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে দু'তিন ফোঁটা অশ্রু। জিঞ্জিরা প্রাসাদ ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার জিঞ্জিরা ইউনিয়নের হাউলী গ্রামে অবস্থিত। ঢাকার গুলিস্তান থেকে দিশারী পরিবহনে সরাসরি কেরানীগঞ্জের কদমতলী চৌরাস্তায় নেমে রিকশায় করে খুব সহজেই জিঞ্জিরার হাউলী গ্রামে যাওয়া যায়। ভাড়া যথাক্রমে বাসে ৮/১০ টাকা ও রিকশায় ১০/১৫ টাকা। এছাড়া রিকশায় পুরান ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল অথবা সোয়ারী ঘাট থেকে নৌকায় পার হয়ে সামান্য পথ হাঁটলেই নীরবে ক্রন্দনরত অযত্ন অবহেলায় দাঁড়িয়ে থাকা ঐতিহাসিক জিঞ্জিরা প্রাসাদের দেখা মেলে। এক্ষেত্রে খরচ হবে ৭০/৮০ টাকা।

www.pathagar.com

Topography of Dacca গ্রন্থের গ্রন্থাকার জেমস টেলর উল্লেখ করেছেন : স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বেগম লুৎফুন্নিসা প্রথম দিকে গোপনে গোপনে বিশেষ শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি আবদ হাদী খান নামের শক্তিমান রাজপুরুষের মাধ্যমে মীরজাফরকে মসনদ থেকে সরিয়ে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা ও জনসাধারণের দুর্দশা মোচনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মীরজাফর গুপ্তচর মারফত ঐ সংবাদ জানতে পারায় বেগম লুৎফন্নিসার সকল সু-নিপুণ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। খুব সুন্দর এক নদী, নামটি তার আরও সুন্দর। তাইতো সকলে একে বলে কাজলা। তার উত্তর পাড়ে ৭৭ একর জায়গা জুড়ে বিশাল এক আমবাগান। আকার -আয়তন যেমন বড়, বয়সেও তেমন পুরনো, অন্তত সাড়ে ৩০০ বছর তো হবেই। সব মিলিয়ে বাগানে এখন গাছ আছে সাড়ে ৩০০। এর বেশকিছু গাছ অনেক বয়সি, বাগানটিও আর সেই নবাবি আমলের সেইসব দিনের মতো সুন্দর নেই। কাজলা নদীটিও তাই। নবাব আলিবর্দীর আমলে কাকচক্ষু জলের স্রোতস্বিনী ছিল এই কাজলা। বাংলাদেশের মেহেরপুর শহর থেকে ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার পথের ধারেই পড়ে আমঝুপি গ্রাম। গ্রামের নাম থেকেই কুঠি বাড়ির নাম। নবাব আলিবর্দী খান আম বাগানটি করেছিলেন এবং ওখানে তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে আসতেন, কাজলা নদী দিয়ে বজরায় করে। নদীই ছিল তখন প্রধান যাতায়াতের পথ। সে কারণে বাড়ির সামনেই ঘাট। আম বাগানের পাশাপাশি আমঝুপি কুঠিরকে ঘিরে আছে দৃষ্টিনন্দন ফুলের বাগান। বাংলাদেশি মিডিয়ার জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব জনাব শাইখ সিরাজ ২০১২ ইং কোরবানি ঈদে তাঁর উপস্থাপনায় চ্যানেল আই এবং রেডিও ভূমি ৯২.৮ Fm-এ ২৯.১০.১২ তারিখে প্রচারিত 'কৃষকের ঈদ আনন্দ' অনুষ্ঠানটি ঐতিহাসিক আমঝুপি কুঠির এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় শ্যুটিং করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি বাংলার মানুষকে চিনিয়ে দেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৯ম বংশধর গোলাম আব্বাস আরেবকে।

বাংলার মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, কিষাণ-কিষাণী, শ্রমিক মজুর, জেলে, তাঁতি, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, গুণীজনসহ সকল শ্রেণির মানুষ ও প্রকৃতির সাথে নবাব সিরাজউদ্দৌলার এক নিবিড় আত্মিক স্পর্শ রয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে তাঁর ভালোবাসার সুর আজও বেজে উঠে লাল সবুজের হৃদয় জুড়ে। আজ ঘুরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। লাল সবুজের দেশে সিরাজ পরিবার সংশ্লিষ্ট স্থাপনাগুলো আজ অরক্ষিত অযত্ন অবহেলায় নীরবে কেঁদে যায়, আর আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই? আসুন বন্ধুরা আমরা যার যার অবস্থান থেকে সিরাজ পরিবার সংশ্লিষ্ট স্থাপনাগুলো সংরক্ষণের জন্য প্রতিবাদী কণ্ঠ তুলি। তবেই হয়তো ঘুমন্ত সরকারের ১ দিন ঘুম ভাঙ্গবে। (দৈনিক সমকাল, শৈলি- ৩.৭.২০১৩; দৈনিক সংগ্রাম ২০১৩ইং ঈদ সংখ্যা; দৈনিক ইত্তেফাক, ভিন্ন চোখে- ১২.৯.২০১৪ইং)

www.pathagar.com

রঙে ঢঙে ঢাকা

বাংলার প্রাচীন রাজধানী হিসেবে গৌড়, পাণ্ডুয়া ও সোনারগাঁয়ের পরে ঢাকার অবস্থান। মুর্শিদাবাদ, কলকাতা ও ঢাকার মধ্যে বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকা প্রাচীনতম। রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক প্রশাসনিক ও প্রতিরক্ষার দিক থেকে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে ইসলাম খান বাংলা সুবার রাজধানী বিহারের রাজমহল থেকে ১৬০৮ সালে ঢাকায় স্থানান্তর করেন। তবে এও শোনা যায়, ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা নগরের গোড়াপত্তন হয়েছিল। সেই মত অনুযায়ী, ঢাকা নগর ৪০০ বছরে পা রাখল ২০১০ সালে। সব মিলিয়ে বলা যায়, ঢাকা নগরের গোড়াপত্তন হয়েছে কলকাতা নগরের চেয়ে প্রায় ১০০ বছর আগে। ঢাকার প্রাচীনত্ব, ঢাকাইয়া, ঢাকাইয়া ভাষা ও ঢাকা নামকরণ সম্পর্কে বিজ্ঞজনের মত হলো নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও ভূপ্রকৃতির পরিবর্তনের ইতিহাসই হলো মূল ইতিহাস। সেই সময় কাঠের তৈরি সমুদ্রগামী পাল তোলা জাহাজে করে ঢাকা থেকে পৃথিবী বিখ্যাত মসলিন কাপড় বিদেশে রপ্তানি হতো, এমনকি কাঠের জাহাজও। ঢাকার প্রাচীন পাঠান মহল্লাগুলোতে সুলতানি আমলের স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে বড় জাফরী ইটের ও চুন সুড়কির তৈরি বেশকিছু পাকা অট্টালিকা ও মসজিদের স্মৃতিচিহ্ন এখানে বিদ্যমান। ঢাকার আদি বাসিন্দা ঢাকাইয়াদের আঞ্চলিক ভাষায়ও প্রচুর ফার্সি, আরবি, পালি ও প্রাকৃত ভাষার উপাদান বিদ্যমান। ঢাকা নামকরণ হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ জনপদ ঢাবাকা থেকে। ঢাবাকা = ঢা+বা+কা = ঢা+কা = ঢাকা। ঢাক বৃক্ষ, ঢাকেশ্বরী, ঢক্কা বা ঢাক থেকে নয়। ঢাকার প্রজন্ম চত্তরস্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানের মধুর কেন্টিন হল ঘরেই ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকায় মোগল ও পাঠান আমলে রাষ্ট্রভাষা ছিল ফার্সি। মোগল আমলে সেনানিবাসের ভাষা ছিল উর্দু ও হিন্দি। ঘরের ভাষা ছিল যার যার মাতৃভাষা। উর্দুভাষা চর্চার প্রাণকেন্দ্র হলো লাখনৌ, দিল্লী কিংবা আগ্রা নয়। ঢাকায় ফার্সি চর্চার বিকল্প হিসেবে উর্দু ১৮৩০ সালের পর চালু হয়। বাংলার প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণাকারী সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের আমল ১৩৩৮ খ্রি. থেকে ১৫৩৮ খ্রি. পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ২০০ বছর বাংলা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ছিল। এই ২০০ বছরকালীন সময়ে সোনারগাঁও বেশিরভাগ সময় সমগ্র বাংলার রাজধানী ও বাকি সময় শুধু পূর্ব বাংলার রাজধানী ছিল। এমনকি ১৫৩৮ খ্রি. থেকে ১৬০৮ খ্রি. পর্যন্ত বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের লয়প্রাপ্তকালেও সোনারগাঁও পূর্ব বাংলার একমাত্র রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ছিল। মোগল ও পাঠান আমলে ঢাকায় সরাইখানা ছিল শুধু বিদেশি যাত্রীদের জন্য। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলের শেষ দিকে রেস্টুরেন্ট প্রথা চালু হয়। পিকচার হাউজ (শাবিস্তান) হলটি স্থায়ী সিনেমা হল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৪ সালে। ১৯৩০

www.pathagar.com

সালের মধ্যে ঢাকায় আরও ৩টি স্থায়ী সিনেমা হল চালু হয়, যথাক্রমে মুকুল থিয়েটার অর্থাৎ বর্তমানের আজাদ, কাদের সরদারের লায়ন থিয়েটার ও সিনেমা প্যালেস (রূপমহল)। এমনকি ১৯৩০ সালের পূর্বেই কাহিনী চলচ্চিত্রও ঢাকায় নির্মিত হয়। সে সময়ে বনেদি ঢাকাইয়া মহিলারা শতাধিক রকমের পাক ও রান্না জানতেন। শীর অর্থ দুধ। দুধ, পোলাও চাল অর্ধেক বাটা, চিনি, মাওয়া, কিশমিশ, পেস্তাবাদাম, কেওড়া, দারচিনি, এলাচি, লং ও জাফরানের সংমিশ্রণের তৈরি এক প্রকার সুস্বাদু তরল খাদ্য হলো শীরবেরেঞ্জ যা নবাব আলিবর্দী খান ও সিরাজউদ্দৌলার খুবই প্রিয় খাদ্যবস্তু ছিল। যা দেখতে কিছুটা ফিরনীর মত। ময়দা, ঘি ও দুধের সংমিশ্রণে তৈরি রুটি হলো শীরমাল। সকালের নাস্তায় সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের প্রথম পছন্দ ছিল ঢাকাই বাবুর্চির তৈরি শীরমালরুটি। ঢাকাইয়াদের সবচেয়ে প্রিয় শরবত জাতীয় তরল সুস্বাদু পুষ্টিকর খাদ্য হলো শীরে ফালুদা। শীরে ফালুদা তৈরি করা হয় দুধ, ফালুদা, মালাই, চিনি বা মধু, পেস্তাবাদাম, কাটা মনাক্কা, কলা, আম, পেঁপে, নিশাস্তা ও জাফরান বা কেওড়া বা গোলাব পানি এবং বরফের কুচির সংমিশ্রণে। এটি প্রায় চারশত বছর পূর্বে মোগলদের দ্বারা ঢাকায় প্রচলিত হয়েছে। সিরাজপত্নী বেগম লুৎফুন্নিসার প্রিয় অবসর পানীয় ছিল শীরে ফালুদা। ফালুদা হলো সুগন্ধি পোলাও চালের গুড়ার সংমিশ্রণের তৈরি সেমাই। ঢাকার কোফতা হলো গরুর গোস্তের কিমা বা পেস্টের তৈরি, যা তেলে কিংবা ঘি-এ ভাজা ছোট ছোট গোলাকার বল। বনেদী ঢাকাইয়ারা কোফতা তেলে না ভেজে ঘি দ্বারা ভাজা পছন্দ করতেন বেশি। কোরমা হলো আদা, রসুন, ধইনা, পিঁয়াজ, হলুদ, এলাচি, দারচিনি, জৈত্রি, জয়ফল, লবণ, কাঁচামরিচ ও জাফরান এর সংমিশ্রণে তেলের তৈরি গোস্তের তরকারি। কালিয়া হলো লাল শুকনা মরিচ, হলুদ, জৈত্রী, জয়ফল, আদা, রসুন, ধইনা, পিঁয়াজ, এলাচি, দারচিনি, লং ও জাফরানের সংমিশ্রণে ঘি বা তেলের তৈরি গোশতের লাল ঝাল তরকারি। আজকের বাজারে প্রচলিত বাকরখানি সত্যিকার অর্থে আসল বাকরখানি নয়। নিমাশুকা রুটিকে বাকরখানি বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। আসল বাকরখানি ময়দা, ঘি ও দুধের সংমিশ্রণে তৈরি করা হতো। আর রেওয়াজ, চিকনা চর্বি ও হাড়বিহীন গরুর গোশতের বাছাই করা টুকরার কাবাবকে পাসান্দে কাবাব বলে।

শীরমাল রুটি মোগল নবাব আলিবর্দী খান, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, সুবেদার, দেওয়ান, বখশী, আমির ও ওমরাহদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য ছিল এবং ঢাকায় ১৬০৬ সালেই মোগল বাবুর্চি খান সামাদের রান্নার সুনাম চারিদিক ছড়াতে থাকে। তখন অবশ্য সাধারণ লোকদের ক্রয়ের জন্য কোনো দোকান ছিল না। ১৮৯৫ সালের দিকে আলাউদ্দিন হালওয়াই প্রথমবারের মতো খোলাবাজারে শীরমাল বিক্রয় আরম্ভ করেন। সেটাই বর্তমানের বিখ্যাত আলাউদ্দিন সুইটমিট। পরটা কাবাব ঢাকায় আফগান পাঠান তুর্কিদের দ্বারা প্রায় ৭০০ বছর পূর্বেই চালু হয়েছে। ঢাকার আরমানীটোলাস্থ তারা মসজিদের মূল নির্মাতা মির্জা গোলাম পীরের পিতামহ মীর আবু সাঈদ ১৭৯০ সালের দিকে প্রতি ১২ই রবিউল

www.pathagar.com

আউয়ালের দিনে তবাররুক হিসেবে ও বিভিন্ন উৎসবে নিজ খরচে সমগ্র ঢাকায় পোলাও বিতরণ করতেন। ইসলামপুরের কাদের সর্দারও ১৯৩০ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক ২০ রোযার দিন ঢাকার প্রতিটি মসজিদে তবাররুক হিসেবে নিজ খরচে তেহারী বিতরণ করতেন। ফার্সি, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় নান এর শাব্দিক অর্থ রুটি হলেও বর্তমানে ঢাকাবাসী শুধুমাত্র এক প্রকার রুটিকেই নানরুটি বোঝায়। বাকরখানি রুটি ঢাকার মোগলাই খাদ্য। তবে বাকরখানি জাতীয় রুটি রাশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে ও আফগানিস্তানে দেখতে পাওয়া যায়। পাঞ্জাবের অমৃতসার কাশ্মীরী রুটিওয়ালারা নিঃসন্দেহে বাকরখানি জাতীয় রুটি বানানো তুর্কি-আফগান-পাঠানদের থেকেই শিখেছে। ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মির্জা আগা বাকের খান যিনি পরগনা বুজুর্গ উমেদপুর ও সালিমাবাদ অর্থাৎ বর্তমানের বৃহত্তর বরিশালের জায়গীরদার ছিলেন, তিনিই বাকরখানি রুটি চালু করেন। আগা বাকের প্রথম মুর্শিদকুলী খানের নাতনী জামাই ও ২য় মুর্শিদকুলী খানের মেয়ে জামাই। কেউ কেউ বলেন থাকেন আগা বাকেরের পালক পুত্র আগা সাদেক ষড়যন্ত্র করে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার চাচাকে (যিনি ঢাকার জনপ্রিয় ডেপুটি গভর্নর ছিলেন) হত্যা করে। ঢাকার কোতোয়াল মির্জা আলী নকীর নেতৃত্বে ঢাকার দেশপ্রেমিক জনগণ হত্যাকারী আগা সাদেককে না পেয়ে তার পিতা আগা বাকেরকে হত্যা করে। ঢাকার সুস্বাদু, রুচিকর লোভনীয় খাদ্যের জন্য এবং পরিবেশ পদ্ধতির জন্যেই যুগ যুগ ধরে ঢাকাইয়ারা অতিথিপরায়ণ ও শ্রেষ্ঠতম আপ্যায়নকারী হিসেবে দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে স্বীকৃত ও সর্বজনবিদিত। বিশেষ উপকরণ ও বিশেষ রান্না প্রণালির জ্ঞান খ্যাতি... ঢাকার খাদ্যে ইরানি, আফগান, পাঠান, তুর্কি মুসলমানেরাই ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার মাটিতে চালু করে। কারণ এই খাদ্য মূলত তারাই অধুনালুপ্ত সোভিয়েত রাশিয়ার ৬টি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ থেকে নিয়ে আসে এবং ঢাকায় এই ধারাবাহিকতায় পূর্ণতা আনে। মোগল আমলে ঢাকায় খাদ্য পরিবেশন পদ্ধতি অত্যন্ত সাদামাটা ছিল। রঙিন মোটা শতরঞ্জীর উপর সাদা চৌকোণে দস্তরখান বিছিয়ে মাঝখানে ১টি বড় সেনী বা কাবোতে প্রধান খাদ্য রেখে তার চতুস্পাশ ঘিরে একই সঙ্গে অনেক মেহমান বসত। এটাই ছিল সেইসব দিনগুলোর মুসলমানদের প্রাচীন খাদ্য পরিবেশন রীতি। এই রীতি এখনও ইরানি মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান। নবাব আলিবর্দী তার আমলে ঢাকার খাদ্যকে আরো সুস্বাদু ও রুচিকর করে তোলা এবং একক খাদ্য পরিবেশন পদ্ধতি চালু করেন। আধুনিক ক্যাটারিং এর জনক বিজ্ঞজনদের মতে, মোগলরা ডাইনিং রুম পদ্ধতি বাংলাদেশে একমাত্র ঢাকাতেই নায়েব নাযিমদের আমলে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের পর প্রচলন হয়। ১৮৪০ এর দিকে ঢাকার কয়েকটি উচ্চবিত্ত পরিবারে ও সকল ইউরোপীয় কুঠিতে ডাইনিং রুম প্রচলিত হয়ে যায়। ঢাকার বিশিষ্ট খাদ্যসমূহের উপকরণ ও পাক প্রণালির মূল প্রবর্তনকারীই হলো ইরানি, আফগান, পাঠান ও তুর্কি মুসলমানরা যারা ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মুসলমানদের চিরস্থায়ী বসত প্রক্রিয়ার সূচনালগ্নে ইরান, জর্জিয়া, আজারবাইজান,

www.pathagar.com

আফগানিস্তান, তুরস্ক, উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান, কিরগিজস্তান, আর্মেনীয় ও কাজাখস্তান থেকে এই খানা ঢাকায় নিয়ে আসেন। বাংলার বীর নবাব আলিবর্দী খান তাঁর আমলে ঢাকার খানার সঙ্গে ইরানি খানার সংমিশ্রণ ঘটান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আরও উৎকৃষ্ট, সুস্বাদু ও রুচিকর খানা ও তদসঙ্গে সুন্দর খাদ্য পরিবেশন পদ্ধতি উপহার দেন। যা পৃথিবী ব্যাপী মোগলাই / মোগলরাই ডিশ নামে পরিচিত। সেই বিখ্যাত মোগলাই ডিশই নবাব আলিবর্দী খানের আমলের শুরু থেকেই ঢাকার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংযোজিত ও উদ্ভাবিত নতুন খানা... ঢাকা ডিশ নামেই পরিচিতি লাভ করে। সমগ্র ভারতের মধ্যে একমাত্র লাখনৌ ও দিল্লীর বিশেষ খানাই ঢাকা ডিশের মোটামুটি কাছাকাছি আর কলকাতা, আসাম, বিহারসহ অন্যান্য জায়গার কোথাও ঢাকা ডিশের সমকক্ষ রান্না করার কোনো প্রশ্নই আসে না। এ সময় ঢাকা অঞ্চলে অতি উৎকৃষ্টমানের তুলা উৎপন্ন হতো। ঢাকায় ইংরেজ কোম্পানির কর্মকর্তা এ তুলাকে পৃথিবীর সূক্ষ্ম তুলা বলে অভিহিত করেন। মসলিন তৈরির কাজে এ তুলা ব্যবহৃত হতো। কোনো এক যুগে ঢাকায় তৈরি হতো।

বিশ্ববিখ্যাত মসলিন, মসলিন তথা ঢাকার বস্ত্রশিল্পের ঐতিহ্য সু-প্রাচীন। প্রাচীন ব্যবিলন, গ্রিক, পারস্য, মিশর, রোম ঢাকাইয়াদের উৎপাদিত মসলিনের সঙ্গে পরিচিত। মোগল আমলে নবাব আলিবর্দী খান, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, বেগম লুৎফুন্নিসাসহ একই পরিবারের অন্যান্যরা অতি উৎসাহে মসলিন পরিধান করতেন। মসলিন বিদেশে রপ্তানি হওয়ার কারণে তখন প্রচুর বিদেশি মুদ্রা বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। মোগলরা ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের পর সারা বাংলার ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে ঢাকা। মোগলরা ঢাকা শহরে বন্দর প্রতিষ্ঠা করে ঢাকাকে ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ইরানি পর্যটকের মতে, প্রতিবছর কয়েক হাজার মসলিন টুপিও বাংলাদেশ থেকে ইরানসহ অন্যান্য দেশে রপ্তানি হতো। ইউরোপের ব্যবসায়িগণ ঢাকার বস্ত্র শিল্পের গুণগতমান দেখে খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। আদি ঢাকাইয়ারা উন্নতমানের সুতিবস্ত্র তৈরি করতেন। ইউরোপীয়রা তখন বাংলা থেকে যে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করতেন, সেগুলোর মধ্যে সুতিবস্ত্র ও ঢাকার সামগ্রী ছিল উল্লেখযোগ্য। মোগল আমলে ঢাকার তৈরি বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করে বছরে ২৮ লাখ টাকা শুল্ক হিসেবে পাওয়া যেত। ব্রিটিশ বেনিয়ারা বাংলা তথা ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মসলিন শিল্প ধ্বংস করে দেয়। এ ছাড়া তখনকার দিনে এক কোটি টাকারও বেশি দামের বিভিন্ন ঢাকাই জিনিসপত্র বিদেশ রপ্তানি হতো। তাইতো সেইসব দিনগুলোয় বাংলা প্রদেশের প্রাচুর্যের প্রতীক হয়ে উঠল...: মোগল রাজধানী ঢাকা। মোগল সাম্রাজ্যের ১২টি বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্রের ১টি ছিল ঐতিহ্যের শহর ঢাকা। তখন ফ্রান্স, পর্তুগাল, ইরান, ইরাক, গ্রিস, হল্যান্ড ইংল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে থেকে ব্যবসায়ীরা এসে, ঢাকার সাথে ব্যবসায়িক সেতুবন্ধ গড়ে তুলেন। তখন ঢাকায়

www.pathagar.com

নানা ধরনের পণ্য উৎপাদিত হতো। রমরমা ছিল ঢাকার ব্যবসায় বাণিজ্য। বিভিন্ন ধরনের মানুষ আসত ঢাকায় জীবিকার সন্ধানে। তখন কারিগরদের অত্যন্ত আকর্ষণীয় মজুরি দেওয়া হতো, জিনিসপত্রের দাম ছিল সস্তা। নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে ১ টাকায় আট মণ চাল পাওয়ার কথা অনেকেরই জানা কথা। ঢাকা এক সময় স্বর্ণ রৌপ্যের নানা রকম অলংকারের কারুকাজের জন্য সমগ্র ভারত উপমহাদেশে বিখ্যাত ছিল। ঢাকার তৈরি রুপার গোলাপ পাশ, প্লেট এবং কাপের খ্যাতি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। শাঁখার তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র বিদেশে রপ্তানি করা হতো। লালবাগের আমলী গোলার তৈরি মহিষের শিংয়ের চিরুণী এবং চুরিহাট্টার তৈরি চুরি খ্যাতি অর্জন করেছিল দেশ-বিদেশে। ঢাকার আদি বাসিন্দাগণ অতি প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান সৃষ্টির সময় ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহার থেকে আগত মোহাজেরগণ পুরান ঢাকার বেচারাম দেউরী, দক্ষিণ মৈসুণ্ডী, মালিটোলা এবং লাল মোহন সাহা স্ট্রীট এলাকায় এসে বেনারসী কাতান বয়ন আরম্ভ করেন। পরে এ সমস্ত মোহাজেরগণ ১৯৫০ সালের দিকে প্রথমে মোহাম্মদপুর এলাকায় এবং আরো কিছু মুসলমান তাঁতি বানারাস থেকে এসে ঢাকার মিরপুরে বসতি গড়ে তোলেন। ১৯৪৭ সালে অবাঙালিরা ঢাকাইয়াদের সংস্পর্শে থেকেই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার লাভ করেন। প্রাচীনকাল থেকেই ঢাকায় ১টি প্রচলন ছিল... "৫২ বাজার ৫৩ গলির শহর" - এই ঐতিহ্যবাহী ঢাকা। আর এ নামটি ঢাকা শহরের সমৃদ্ধিই বহন করে। এরকম বাজারের ১টি হলো বাংলাবাজার। ঐতিহাসিকদের ধারণা বেঙ্গল নামটাই নাকি এসেছে বাংলাবাজার থেকে। নবাবপুর, ঠাঁটারীবাজার, বাংলাবাজার,সদরঘাট, বাদামতলী, ইসলামপুর, তাঁতিবাজার, কারওয়ান বাজার, ইমামগঞ্জ ইত্যাদি এলাকাগুলো ঢাকার ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম প্রাচীন কেন্দ্র। এ সমস্ত ব্যবসায়-বাণিজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল ঢাকার চকবাজার। চকবাজারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়া ভৌগোলিক গুরুত্বও কম ছিল না। চকবাজারের দক্ষিণ পাশে বুড়িগঙ্গা নদী। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এই নদী পথেই চকবাজারে মালামাল আসত। এই জন্য চকবাজার এক সময় চক বন্দর নামেও পরিচিত ছিল। এখানে ঢাকাইয়া মালিকের সু-প্রসিদ্ধ আলাউদ্দীন সুইটমিট, বোম্বে সুইটমিট, আনন্দ অবস্থিত। রওশন চা ওয়ালা, গফুর চা ওয়ালা, বাংলাদেশ হোটেল (তদানীন্তন পাকিস্তান হোটেল)- এর দোকান রয়েছে, এসকল দোকানের পণ্যসামগ্রী এদেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও প্রশংসিত হয়েছে। দেশে, বিদেশে ঢাকাই মিষ্টির ক্রমবর্ধমান কদর ঢাকাইয়া ঐতিহ্যের ভাণ্ডারে সু-প্রতিষ্ঠিত সম্মান বয়ে আনে। এছাড়া ঢাকাইয়াদের চকবাজারের নানা ধরনের মুখরোচক ইফতারি প্রাচীনকাল থেকেই খ্যাতি অর্জন করছে দেশ-বিদেশে। এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইফতারির বাজার হিসেবে পরিচিত। মুসলিম বিশ্বের কোনো দেশে এত বড় ইফতারের বাজার কোথাও হয় বলে জানা যায় না।

www.pathagar.com

এখনকার ঐতিহ্যবাহী হাজী নুরুমিয়ার নূরানী শরবত যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। এ ছাড়া বাংলাবাজার, চকবাজার, নীলক্ষেত ও শাহবাগের কেতাবপট্টি প্রায় দীর্ঘ বছর থেকে পুস্তক প্রকাশনা ও বিপণনের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখছে।

□ ঢাকার ঐতিহ্য মসলিন

মোগল শাসন যুগে রাজধানী ঢাকায় ১টি স্থিতিশীলতা এসেছিল। নগরের বিকাশ ঘটেছিল। মোগল ভারতের প্রাদেশিক রাজধানীগুলোর মধ্যে ঢাকা অন্যতম সম্পদশালী নগরে পরিণত হয় ব্যবসায় বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে। দেশ বিদেশের বণিকরা ঢাকায় রমরমা বাণিজ্যে যুক্ত হন। ইরানিদের ব্যাপক আগমন ঘটে ঢাকায়। তারা প্রশাসন ও ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি নতুন ঢেউ এসে লাগে। ঢাকায় মোগল সুবার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঐতিহ্যের মসলিন কাপড় উৎপাদন ও বাণিজ্যের গতি ঢাকাতে অনেক বৃদ্ধি পায়।

মসলিনের আকর্ষণে নানা দেশের ক্রেতারা ঢাকায় ছুটে আসতে থাকেন। মোগল সম্রাট ও অমাত্যগণ ঢাকাই মসলিনের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। এক পরিসংখ্যান মতে, ১৭৪৭ সালে ঢাকা থেকে যে পরিমাণ মসলিন ও সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র বণিকরা সংগ্রহ করে তার মূল্য ছিল ২৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা। তাইতো ঢাকার মসলিন ইতিহাসখ্যাত এক বস্ত্রশিল্পের নাম। যার কদর কোনো একযুগে ছিল বিশ্বজুড়ে। একটা সময় ছিল যখন এ বস্ত্র শিল্পটি বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয়ে ব্যাপকভাবে তৈরি হতো। সোনারগাঁয়েই গড়ে উঠেছিল মসলিন শিল্পীদের পল্লী। তাদের হাতে তৈরি প্রায় স্পর্শাতীত অদৃশ্য ও অবিশ্বাস্য সুন্দর এ মিহি সুতার শাড়ি এক সময় ছিল সারাদুনিয়ার বিস্ময় ও মর্যাদার বস্তু। অপূর্ব দৃষ্টিনন্দন একটি মসলিন শাড়ির জন্য প্রায় ৩০ গ্রাম সুতা তৈরি করতে শিল্পীদের ২ মাস সময় চলে যেত। সুদীর্ঘ ১০ শতাব্দীকাল ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি ছিল বয়নশিল্পের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস মসলিনের সোনালি ইতিহাস। যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের ব্যাপকভাবে এদেশের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল। বাংলার তাঁতিদের নিপুণ সৃষ্টি এক সময় সোনারগাঁয়ের মসলিন বস্ত্র পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আদি মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আঠারোশ শতক পর্যন্ত যে পণ্য পৃথিবীতে একচেটিয়া বাণিজ্য করে আসছিল তা হলো এ মসলিন। নবাব আলিবর্দীর স্ত্রী শরফুন্নিসা বেগম এবং সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রী বেগম লুৎফুন্নিসার শখের কাপড় ছিল সোনারগাঁয়ের মসলিন। নবাব আলিবর্দী খানের দরবার সভায় বহু পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ প্রাচীন বাংলা মসলিনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার আম্মাজান আমিনা বেগম ও নয়নের আলো একমাত্র কন্যা উম্মে জোহরার প্রিয় কাপড় ছিল ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মসলিন। নবাব আলিবর্দীর সময় মসলিন তত্ত্বাবধায়কদের জন্য ১টি সরকারি পদ সৃষ্টি করা হয়। সে পদের নাম ছিল 'দারোগা-ই মলবুসখাস'।

www.pathagar.com

দারোগা-ই-মলবুসখাসের তত্ত্বাবধানে তাঁতিরা তৈরি করতেন রাজপরিবারের জন্য উৎকৃষ্ট মসলিন। আর এ উৎকৃষ্ট মসলিন কাপড়ের নাম 'মল বুসখাস'। মল বুসখাস ছাড়াও বিদেশে রফতানির জন্য মল-মল খাস, শবনম, পাছাদার, কুস্তিদার, আধে-ই-রাওয়া কাপড় তৈরি করতেন। নবাব আলিবর্দী খানের আমলে ১৫ গজ দৈর্ঘ্য ও ১ গজ প্রস্থ খণ্ড মসলিনের মূল্য ছিল ৩০ পাউন্ড। মসলিনের প্রাচীন নাম ছিল 'গঙ্গাবস্ত্র', 'গঙ্গাপট্টিহি' ইত্যাদি। তবে বৈচিত্র্যের কারণে মসলিন বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন : আর-ই রওয়া, বদনখাস, এক পাট্টাহামাম, জামদানি, মলমল খাস, নয়ন মুখ, সরকার-ই-আলি, সারবান্দ ইত্যাদি। চীনা ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় মসলিনকে পিপু, মালচেটি, শামাপাফু, পালিটালি ও মহামালি বলা হয়েছে। নবাব আলিবর্দী খানের আমলে মসলিনের সোনালি ও রূপালি সুতায় তৈরি জমিনে মনিমুক্তা আর মূল্যবান পাথর বসিয়ে নকশা করা হতো। ওই সময় কলকা নকশার প্রবর্তন হয়।

এক ইঞ্চির ১৫০০ ভাগের একাংশ মাপের সূক্ষ্ম সুতার মসলিন বুনতে ব্যবহৃত ১২৬টি নানা ধরনের সরঞ্জামের যার সব কয়টি উপকরণই বাংলাদেশে তৈরি হতো। এ মসলিন শিল্প সম্পর্কে অনেক চমকপ্রদ ঘটনাও ঘটে গেছে। অষ্টম শতাব্দীতে জনৈক পারস্য বণিক ১টি ঝিনুকের খোলের ভেতর করে শত শত গজ মসলিন কাপড় নিজ দেশে নিয়ে যেতেন। ১০০' ৭৫ গজ লম্বা মসলিন কাপড় একসঙ্গে করলে একটা কবুতরের ডিমের মতো হতো। একখাটি অবিশ্বাস্য হলেও সত্য এবং অবাক হওয়ার মতো। একবার নবাব আলিবর্দী খানের শখের মসলিন কাপড়টি উঠানের ঘাসের উপর শুকাতে দিয়েছিলেন নবাব পত্নী শরফুন্নিসা। সকালে কুয়াশার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল মসলিন কাপড়টি। এতে নবাবের গৃহপালিত রাম ছাগল মসলিন কাপড়টি খেয়ে ফেলেছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলার মেয়ে উম্মে জোহরা একবার মসলিনের কাপড় পরে পিতার কাছে এসেছিলেন। তনয়া বলেছিলেন, 'পিতা আমার পরিধানে ৭ খণ্ড মসলিনের কাপড় আছে'। এমনিভাবে আরও কত চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে। এক সময় ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর নিয়ে গঠিত তদানীন্তন জাহাঙ্গীরনগর মসলিন তৈরির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৮৪১ সালে ৪ হাজার ১৬০টি মসলিন তৈরির তাঁত চলত এ অঞ্চলে। ঢাকা, সোনারগাঁ, তাঁতবাদী, বালিয়াপাড়া, চরপাড়া, ডেমরা, বাঁশটেকি, মৈকুলী, নওপাড়া, নবীগঞ্জ, বাছারক, সিদ্ধিরগঞ্জ, কাঁচপুর, ধামরাই ও শাহপুর ছিল মসলিন তৈরির অন্যতম স্থান। উৎকৃষ্টতম মসলিন তৈরি হতো ঢাকা, সোনারগাঁ, ধামরাই, তাঁতবাদী, জঙ্গলবাড়ি ও বাজিতপুর। ইতিহাসের সেই সোনালি গ্রাম ও জনপদ সোনারগাঁয়ের মসলিনের কেন্দ্রভূমি 'খাসনগর গ্রাম' এখনও আছে। এখন মূলত পণ্ডগ্রাম। খাসনগর দীঘির ৪ দিকে এখনও সেই প্রাচীন জনপদের অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান। শুধু হারিয়ে গেছে সেই অস্তিত্ব ও হাজার বছরের ধন মসলিন। আর রয়ে গেছে সেই স্মৃতি। হারিয়ে যাওয়া মসলিনের কিছু স্মৃতিচিহ্ন ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

www.pathagar.com

ঢাকার হৃদয়ে ঐতিহাসিক নিদর্শন

ঢাকার হোসেনী দালান উপমহাদেশের প্রাচীনতম ইমামবাড়া মসজিদ। এটি প্রাচীন ঢাকার একটি মনোরম ঐতিহাসিক নিদর্শন। শুধু প্রাচীনত্বের দিক থেকেই নয় হোসেনী দালান প্রতিষ্ঠার পেছনেও এক তাৎপর্যময় ইতিহাস। সে ইতিহাস যেমন ধর্মীয় বিশ্বাসে পূর্ণ, তেমনি অভিনব।

আজ থেকে বহু বছর আগের কথা। শাহ সুজা তখন ঢাকার সুবেদার। তদানীন্তন নিজামতের রণতরীর প্রধান ছিলেন সৈয়দ মীর মুরাদ। (মুনসী রহমান আলী ত্বায়েশের ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'তাওয়ারিখে ঢাকা'- তে মীর মুরাদের পরিচয়ে বলা হয়েছে "নিজামতের নেওয়াড়ের দারোগা"। মীর মুরাদ যেমন সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন তেমনি ছিলেন ধার্মিক। কথিত আছে এক রাতে মীর মুরাদ স্বপ্ন দেখেলেন হযরত ইমাম হোসেন (রা) কারবালার শোকাবহ ঘটনার স্মরণে এক অনুপম স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছেন। স্বপ্নে মীর মুরাদ ইমাম হোসেনের (রা) নির্দেশ পেলেন তিনিও যেন অনুরূপ একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন।

মীর মুরাদ স্বপ্নের নির্দেশনানুযায়ী ১০৫২ হিজরি মোতাবেক ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে এই ঐতিহাসিক ইমামবাড়া হোসেনী দালান নির্মাণ করেন। এটি একটি অত্যন্ত মনোরম দ্বিতল ভবন। এতে দুটি মিনার, দক্ষিণ দিকে ভবনের কাছে ঘেঁষে রয়েছে একটি পুকুর, উত্তর দিকে একটি প্রশস্ত মাঠের পর দেউড়ি এবং দ্বিতল নহবত খানা, পশ্চিমে তাজিয়া প্রভৃতি ঘর। চারিদিকে ঘেরা দেয়াল এবং দক্ষিণ দিকেও দেউড়ি। মুহররম মাসে এসব দেয়ালের তাকের ওপর প্রদীপ দিয়ে আলো জ্বালানো হয়। এতে দালানের ধর্মীয় মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং দেখতেও সুন্দর লাগে। প্রাচীন আমলে হোসেনী দালান সংলগ্ন বিশাল এলাকা মীর মুরাদের নামানুসারে বাজারে মীর মুরাদ নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু কালের করাল গ্রাসে সংকুচিত হয়ে বর্তমানে হোসেনী দালান মাত্র ৬ বিঘা জমির উপর তার অবস্থান টিকিয়ে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে হোসেনী দালান বলে অতি পরিচিত এই ইমামবাড়াটি কারবালার শোকাবহ ঘটনার স্মরণে ইমাম হোসেনের শাহাদাতের স্মৃতিকে জাগরূক রাখার জন্য নির্মিত। মীর মুরাদ একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম হিসেবেই এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

হোসেনী দালান প্রতিষ্ঠার এই নেপথ্যে ইতিহাস, ঢাকার ওপর সর্বপ্রথম বই ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম নুসরত জংগী রচিত তারিখ-ই-ঢাকার; মুনশী রহমান আলী ত্বায়েশ এর তাওয়ারিখে ঢাকা; সৈয়দ আওলাদ হোসেনের OLD DHACCA, ড. আহম্মদ হাসান দানীর ঢাকা বিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থ DACCA, সৈয়দ মোঃ তাইফুরের Glimpses of old Dhaka প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

www.pathagar.com

লখনৌ থেকে প্রকাশিত 'সরফরাজ' নামক একটি ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিকীর '৬৯ সালের ১৭ মার্চের প্রকাশিত বিশেষ মুহররম সংখ্যায় ঢাকার হোসেনী দালান প্রতিষ্ঠার স্বপ্নাদিষ্ট ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। সাপ্তাহিকীটির বিশেষ সংখ্যায় উপ-মহাদেশের বিভিন্ন ইমামবাড়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঢাকার হোসেনী দালানকে উপমহাদেশের সুপ্রাচীন ইমামবাড়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

হোসেনী দালানের যে প্রাচীন শিলালিপি রয়েছে তা থেকেও এ ধর্মীয় ভবনটির প্রাচীনত্বের স্বীকৃতি মেলে।

প্রাচীন শিলালিপির অনুবাদ : ওই মর্যাদাবান পরাক্রান্ত ও প্রসিদ্ধ বাদশাহের আমলে সৈয়দ মুরাদ এক হাজার বায়ান্ন সালে এ শোকাগারটি নির্মাণ করেন: ১০৫২ হিজরি।

১১৩১ হিজরি সনে মীর মুরাদ ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনিই হোসেনী দালানের প্রথম মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তিনি নিজেই তখন হোসেনী দালানের সার্বিক তত্ত্বাবধান করতেন। মীর মুরাদের পর ঢাকার নায়েব-ই-নাজিমগণ মুতাওয়াল্লী থাকেন। তারা এর ব্যয় বাবদ নিজামত থেকে বছরে আড়াই হাজার টাকা খরচ বরাদ্দ করতেন। পরবর্তীকালে তৎকালীন সরকার হতে এই বরাদ্দ অব্যাহত থাকে।

নবাব আলিবর্দী খাঁর শাসনামলের শেষভাগে ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম নিযুক্ত হন জিসারত খাঁ (১৭৫৫ খ্রি. থেকে ১৭৮৯ খ্রি. পর্যন্ত)। এ সময়কালে তিনি হোসেনী দালানের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। পরবর্তীকালে নায়েব-ই-নাজিম পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে মুতাওয়াল্লী থাকে যথাক্রমে হাসমত জং (১৭৮৯ খ্রি. থেকে ১৭৯৬ খ্রি. পর্যন্ত), নুসরাত জং (১৭৯৬ খ্রি. থেকে ১৮২৩ খ্রি. পর্যন্ত), শামসউদ- দৌলা (১৮২৩ খ্রি. থেকে ১৮৩২ খ্রি. পর্যন্ত). কমর-উদ- দৌলা (১৮৩২ খ্রি. থেকে ১৮৩৬ খ্রি. পর্যন্ত) অবশেষে কমর-উদ- দৌলার সময় হতে অমিতাচারের জন্য ঢাকার নায়েব-ই-নাজিমদের বংশগত ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যে ভাটা পড়ে।

নায়েব-ই-নাজিমগণ মুতাওয়াল্লী থাকাকালে নিজামত থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়াও হোসেনী দালানের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে মুহররমের বিপুল ব্যয় ভার নায়েব-ই-নাজিমগণই বহন করতেন। জিসারত খাঁ থেকে গাজী উদ্দিন হায়দার পর্যন্ত সব নায়েব-ই-নাজিমগণই ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক। তাঁরা সকলেই হোসেনী দালানের উন্নয়ন এবং মুহররমের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য প্রচুর ব্যয় করতেন। অতীতে ঢাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ছিল মুহররম। মুহররমের তাজিয়া মিছিল খুব জাঁকজমকপূর্ণ। হাসান (রা) ও হোসেন (রা) এর মাজারের প্রতীক নিয়ে তাজিয়া মিছিলে নায়েব-ই-নাজিম, নবাব ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গসহ সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতেন। ঢাকায় মুহররমের সব ধর্মীয়

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানেই হোসেনী দালানকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হতো। এ ছাড়াও বিভি সময় ধর্মীয় পবিত্র দিনগুলোতে খতমে কোরআন এবং ওয়াজ মাহফিলের ব্যবস্থ করা হতো, যা আজো অব্যাহত রয়েছে। হোসেনী দালানের অভ্যন্তরে এস ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংশ গ্রহণের জন্য পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে প্রাচীনকাল থেকে যা আজো অটুট রয়েছে।

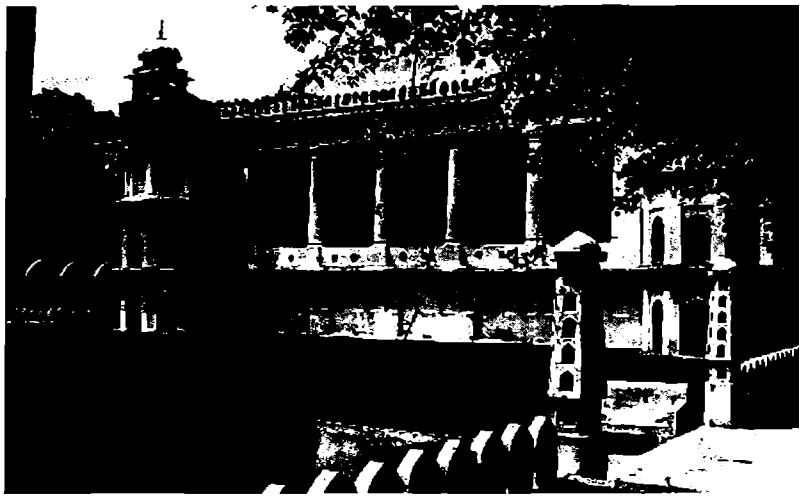

ঢাকার হৃদয়ে ঐতিহাসিক নিদর্শন হোসাইনী দালান

বাংলার বীর নবাব আলিবর্দী খান তাঁর শাসনামলের প্রথম ভাগে হোসেনী দালান ইমামবাড়া মসজিদ যিয়ারতে আসেন এবং তাঁর প্রাণপ্রিয় নাতি যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলা তাঁর শাসনামলের শেষভাগে ঢাকার উক্ত পবিত্র স্থাপনায় যিয়ারত করেন এবং জুম্মার নামাজে অংশগ্রহণ করেন। নবাব আলিবর্দী খাঁন ও বীর যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলা তাঁদের পৃথক আগমনকালে হোসেনী দালান ইমামবাড়া মসজিদের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশাল অঙ্কের নজরানা প্রদান করেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে খাজা আলীম উল্লাহ, নবাব খাজা আবদুল গণি, নবাব আহসান উল্লাহ, নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব হাবিবুল্লাহ, ইরানি বংশোদ্ভূত এ এ ইস্পাহানী (বাংলাদেশের বিখ্যাত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইস্পাহানী গ্রুপের মালিক) ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানসহ আরও সব নামিদামি ব্যক্তিত্ব হোসেনী দালান ইমামবাড়া মসজিদ পরিদর্শনকালে এখানে নামাজ পড়েন। উক্ত পবিত্র স্থাপনাটি যিয়ারত করেন এবং হোসেনী দালানের সার্বিক উন্নয়নের ব্যাপারে আলাপআলোচনা করে ফলপ্রসূ দিকনির্দেশনা দেন এবং মুক্তহস্তে নজরানাস্বরূপ বড় অঙ্কের অর্থ প্রদান করেন। হোসেনী দালানের

www.pathagar.com

অভ্যন্তরের হাসান (রা) ও হোসেন (রা) এর প্রতীক মাজারের সুদৃশ্য রুপার আবরণটি নবাব স্যার সলিমুল্লাহর অবদান। হোসেনী দালানের প্রতি নবাব পরিবারের দায়িত্ব পালন নবাব হাবিবুল্লাহ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে হোসেনী দালান পর্যটকদের নিকট একটি দর্শনীয় স্থান। তাই স্বাভাবিক আকর্ষণ নিয়ে দেশি পরিদর্শক ও বিদেশি পর্যটকগণ হোসেনী দালান পরিদর্শনে আসেন। প্রবেশ পথে দোতলায় উঠার সিঁড়ির সামনে লর্ড কার্জনের সময়কার পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আদেশের একটি সাইন বোর্ড এখনো অটুট রয়েছে। প্রাচীন ঢাকার ঐতিহাসিক নিদর্শন হোসেনী দালান। তাই ঢাকার উক্ত প্রাচীন নিদর্শনকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে যথার্থ আর্থিক সাহায্য-সহায়তা এবং উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজন।

☐ সেই বেগুনবাড়ি

২৭০ বছর আগে বর্তমান ঢাকার বেগুনবাড়ি ছিল জঙ্গল। বন্ধুরা বিশ্বাস হচ্ছে না নিশ্চয়ই! মিরপুর ও সাভারের মধ্যবর্তী এই জায়গাটা তখন ছিল নবাব পরিবারের সংরক্ষিত বন। সেই বনে চড়ে বেড়াত হরিণ, খরগোশ, কাঠবিড়ালি, অজস্র বাহারি সব পাখিসহ নানা প্রাণী। বন্ধুরা দেখুন মাত্র ২৭০ বছর আগের জায়গাটার কি দশা করেছি আমরা। বন্যপ্রাণী তো দূরের কথা বনটাকে পর্যন্ত গ্রাস করে ফেলেছে হিংস্র দানবরূপী মানুষেরা।

☐ সেই পিলখানা

পুরান ঢাকার আরেক ঐতিহাসিক স্থান পিলখানায় এখন আর একটাও পিল (হাতি) নেই। অথচ এক সময় এখানে গিজ গিজ করত শত শত হাতি। সেই কোম্পানি আমল থেকে এখানে বার্মা, ভারতের আসামসহ অন্যান্য এলাকা থেকে ধরে আনা বন্য হাতিকে পোষ মানানো হতো। নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে জমিদাররাও তাদের বন্য হাতিকে পোষ মানানোর জন্য এখানে পাঠাতেন। একসময় দূর দূরান্ত থেকে পিলখানায় হাতির বিশাল মিছিল লক্ষ করা যেত। আজ আর পিলখানার সেই হাতি নেই, নেই উদার বিস্তীর্ণ মাঠ।

☐ চার্লস ড'য়লির দৃষ্টিতে ঢাকা

চার্লস ড'য়লীর জন্ম ১৭৮১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলায়। ঢাকায় এসে ড'য়ালি আবিষ্কার করলেন মোগল সাম্রাজ্যের পড়তি সময়ের রোমান্টিকতা। শুধু যে এই রোমান্টিকতার জন্যই তিনি ঢাকার চিত্র আঁকবার জন্য উৎসাহিত হয়েছিলেন তা কিন্তু নয়। ছবি আঁকবার প্রতি আগে থেকেই তার আগ্রহ ছিল। সে সময়ে ইংল্যান্ডের উচ্চ শ্রেণিদের মধ্যে চিত্রকলা জানা বা বোঝাকে উচ্চ শ্রেণির সংস্কৃতির ১টি অংশ হিসেবে ধরা হতো। সে বিষয়গুলোতো ছিলই, তার

www.pathagar.com

সাথে আরও যুক্ত হয়েছিল ঢাকায় থাকবার সময় একাকিত্ব, পারিবারিক দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় বা মাধ্যম। ঢাকায় থাকাকালীন পুরো সময়ই চিনারির কাছ থেকে ড'য়লি ছবি আঁকার দীক্ষা চালিয়ে যান। এর পাশাপাশি তিনি যে বাংলাও শিখেছিলেন সে-বিষয়টি সম্পর্কেও জানা যায়। এতে বোঝা যায় ঢাকা আর পূর্ব বাংলা ড'য়লির কাছে খুব পছন্দেরই ছিল। ঢাকাকে নিয়ে ড'য়লির ছবির চিত্রগুলো এমন.... ১টি খাল এঁকেবেঁকে চলে গেছে অনেক দূর। সেই খালের ওপর দিয়ে তিন মাঝি ছোট্ট নৌকায় মাল বোঝাই করে দাঁড় বেয়ে চলে যাচ্ছে। নৌকার পাশে ইটের তৈরি ১টি ব্রিজ। যার মাঝখানের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরে তাঁতিদের ঘর-বাড়ি। বাংলার সাধারণ সব কুঁড়েঘর। ছন দিয়ে চালা দেয়া। ব্রিজের উপর ৪ জন মানুষ বসে অলস সময় কাটাচ্ছে। দূরের নিঃসঙ্গ এক নৌকা পাল তুলে হারিয়ে যাচ্ছে অজানায়। এই হচ্ছে ঢাকার তাঁতি বাজারের ১টি খণ্ডিত দৃশ্য। অথবা আমরা আরেকটি ছবির কথা বলতে পারি। খালের মাঝখানে ১টি দালান। বাংলার বর্ষা ঋতুর জন্য উঁচু বেদির ওপর নির্মিত ত্রিতলবিশিষ্ট ১টি দালান। দালানের পাশ দিয়েই মাল বোঝাই ১ নৌকা বেয়ে যাচ্ছে দু'মাঝি। দূরে দেখা যাচ্ছে সিঁড়ি সম্বলিত বাঁধানো ঘাট। সেই ঘাটে গোসলরত কয়েকজন মানুষ। ঘাটের সাথেই কুঁড়েঘর। সাধারণ মানুষের ঘর। খালে রয়েছে বেশকিছু ধরনের নৌকা, আর এটি হচ্ছে ঢাকার ভেতরের কিছু জায়গার চিত্র। বন্ধুরা হ্যাঁ! অবাক হবার বিষয় কিন্তু কাল্পনিক নয়। আজ থেকে কয়েকশতক আগে এক ইংরেজ শিল্পী এঁকেছিলেন ঢাকার সে সময়কার চিত্র। সে সময়কার অনেক কিছুই হয়ত আজকের আধুনিক ঢাকা শহরে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু শিল্পীর চিত্রিত ইতিহাস আমাদের বলে দেয় অতীতের কথা, অতীতের ঢাকার কথা।

☐ বড় কাটরা

বড় কাটরা ভবন বাংলার সুবাদার শাহ সুজার নির্দেশে চারকোণা জায়গাজুড়ে তৈরি হয়েছিল। আয়তাকার চকমিলান এই অট্টালিকাটির দক্ষিণ বাহু ২২৩ ফুট দীর্ঘ, উত্তর দিকটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে তবুও ধারণা করা যায় এটাও একই মাপের ছিল। ধারণা করা হয়, পূর্ব ও পশ্চিম বাহুর দৈর্ঘ্য আদতে ২৩০ ফুট করে ছিল। দক্ষিণ দিকের কেন্দ্রস্থলে ছিল বড় কাটরার প্রবেশ পথ। ভেতরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। এখন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বড় কাটরাকে খুঁজে পাওয়াটাই কষ্টকর। সেইসবদিনে এটি মুসাফিরদের সরাইখানা হিসেবে নির্দিষ্ট ছিল।

☐ আহসান মঞ্জিল

আহসান মঞ্জিল বুড়িগঙ্গা নদীর তীর অবস্থিত রাজধানী ঢাকার সুপ্রাচীন স্থাপত্য ও পুরাতন ভবনগুলোর মধ্যে অন্যতম। নবাব সিরাজউদ্দৌলা আমল এবং পরবর্তী সময় এটি ফরাসিদের দুর্গ ছিল। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ১৮৩৫

www.pathagar.com

সালে ফরাসিদের নিকট থেকে এই এলাকাটি ক্রয় করেন এবং ১৮৭২ সালে সলিমুল্লাহ পুত্র আব্দুল গনি এখানে একটি বিশাল বাসভবন তৈরি করেন এবং প্রিয়পুত্র আহসান উল্লাহর নামে এর নামকরণ করেন আহসান উল্লাহ মঞ্জিল। এটি ছিল অনেকটা বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদের মতো। কিন্তু ভবনটি আহসান মঞ্জিল নামেই ব্যাপক পরিচিতি পায়। ১৯৯২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে একে জাদুঘরে পরিণত করা হয়। ভবনের ২২টি কক্ষ প্রদর্শনীর জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এই ভবনটি অনেকের কাছে 'গোলাপি প্রাসাদ' নামে পরিচিত। নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারে দুঃখজনক অবস্থার কথা জেনে স্যার সলিমুল্লাহ তদানীন্তন বাংলার গভর্নরের নিকট এই বংশের ৬ষ্ঠ রক্তধারা সৈয়দ জাকি রেজাকে সম্মানজনক চাকরি দেওয়ার সুপারিশ করেন। সেই চিঠিটি ঢাকার আহসান মঞ্জিল থেকে ১৬.৯.১৯১৩ সালে খোলা হয় এবং উক্ত সুপারিশের পর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নবাব সিরাজের ৬ষ্ঠ বংশধরকে একটি সম্মানজনক চাকরি দেন।

☐ লালবাগ কেল্লা

বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ১৬৭৮ সালে লালবাগ কেল্লা নির্মাণ করেন মোগল সম্রাট যুবরাজ মুহাম্মদ আজম। সে সময় তিনি ছিলেন বাংলার সুবেদার। এ দুর্গে অসংখ্য গুপ্ত গলিপথ এবং স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। আরো রয়েছে পরীবিবির মাজার, দরবার মহল, হাম্মাম খানা, পানির লেন, মসজিদ, মিনার প্রভৃতি। দরবার মহলে লালবাগ দুর্গের একটি জাদুঘর গড়ে তোলা হয়েছে। জাদুঘরে বর্শা, তীর, ধনুক, শিলালিপি, কামানের গুলি, তরবারি প্রভৃতি সংরক্ষিত আছে।

www.pathagar.com

☐ শিশু পার্ক

পার্কটি শিশুদের জন্য হলেও বড়রাও আনন্দ পেতে পারেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের লাগোয়া পার্কটি খোলামেলা আনন্দমুখর। ছোট-বড় সবার জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরনের রাইড। নগরীর মানুষের স্বল্পমূল্যের বিনোদনের জন্য ঢাকা সিটি করপোরেশন ১৫ একর জমির উপর গড়ে তুলেছেন পার্কটি। ভেতরে ঢুকে ডানেই নাগরদোলা। একটু সামনেই সবচেয়ে আকর্ষণীয় রাইড ট্রেন। পার্কের মাঝখানে রয়েছে টিলাসহ আরও অনেক কিছু।

☐ নন্দন পার্ক

যুক্তরাজ্যের প্রযুক্তি ও ডিজাইন এবং ভারতের নিকো পার্কের আদলে তৈরি নন্দন পার্ক। নবীনগরের কাছে বাড়ই পাড়ায় ১২০ বিঘা জায়গা জুড়ে এই পার্কে রয়েছে দর্শনার্থী ভ্রমণপিপাসুদের জন্য বিভিন্ন আয়োজন। এর মধ্যে ক্যবর কার, প্যাডেল বোট, ক্যাটার পিলার আইসল্যান্ড, ক্রেজি সাইকেল এবং নেট-এটলসহ রোমাঞ্চকর রাইডগুলো অন্যতম।

☐ চন্দ্রিমা উদ্যান

চন্দ্রিমা উদ্যান সংসদ ভবনের কাছে বিজয় সরনির মোড়ে অবস্থিত। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত বলে এখানে সহজেই ঘুরতে যাওয়া যায়। পাশে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র। উদ্যানের মধ্যে রয়েছে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার। মাজারের প্রবেশ মুখে রয়েছে লেকের উপর নির্মিত চমৎকার ব্রিজ। গাছপালা ঘেরা এই উদ্যানে বেড়ানোর জন্য প্রবেশ ফি লাগবে না।

☐ শিশু মেলা

ঢাকার শ্যামলীতে অবস্থিত শিশু মেলায় আছে শিশুদের জন্য নানা আয়োজন। এখানেও আসতে পারেন শিশুদের নিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে। এখানে পাবেন ঘোড়া, দোলনা, নাগরদোলা, রোলিং বোর্ট, রেল গাড়িসহ আরো অনেক কিছু। এটির ভেতরে রয়েছে বিভিন্ন গাছ ও ফুলগাছের সমারোহ। শিশুদের মানসিক বিকাশ ও আনন্দ লাভের জন্য অন্যতম উপযোগী স্থান।

☐ ওয়াটার কিংডম ও ফ্যান্টাসি কিংডম

সাভারের আশুলিয়ায় ফ্যান্টাসি কিংডম। যেকোনো উৎসব আনন্দে এখানেই মেতে উঠতে পারেন সপরিবারে। ফ্যান্টাসি কিংডমের রয়েছে ওয়াটার বোট, রোলার কোস্টারসহ আরও অনেক কিছু। এখানে ওয়াটার ওয়ান্ডে চলে আসতে পারেন বিভিন্ন রাইডস উপভোগ করতে।

☐ বোটানিক্যাল গার্ডেন

ঢাকার মিরপুরের চিড়িয়াখানার পাশেই রয়েছে বোটানিক্যাল গার্ডেন। এটি অন্যতম পার্ক, যেখানে পরিবারের সঙ্গে ছুটির একটি দিন কাটাতে পারেন। এখানে রয়েছে নানা ধরনের ঔষধি গাছ, রয়েছে কৃষ্ণচূড়া ও রাধাচূড়া গাছ। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির ফুল। এখানে রয়েছে লেক, যেখানে ভাসতে থাকে শাপলা ও পদ্ম। ছুটির দিনগুলোতে একটু শান্তি পেতে চলে আসতে পারেন বোটানিক্যাল গার্ডেনের মনোরম পরিবেশে।

www.pathagar.com

☐ যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলা ঢাকায়

নবাব আলিবর্দী খানের নবাবি আমলের শেষ দিকে যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলা ঢাকায় পৌঁছান। যুবরাজ সিরাজ ঢাকায় পৌঁছে বেশ ভালো অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন। সে আমলে ঢাকায় নিয়োগপ্রাপ্ত দরবারের সমস্ত কর্মকর্তা কর্মচারী তাঁদের পদমর্যাদা অনুযায়ী একজনের পর একজন করে, এক থেকে দুই মাইল অগ্রসর হয়ে যুবরাজকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সমবেত হন। তাঁদের প্রত্যেককেই পদ মর্যাদা অনুযায়ী সম্মানসূচক পোশাক, ঘোড়া, শাল, পারস্যের সুগন্ধি এবং অন্যান্য জিনিস দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সে আমলে ঢাকায় অত্যাচারিত নির্যাতিত অনেক পরিবার সু-বিচারের আশায় তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে বাংলার যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলার পদপ্রান্তে হাজির হয়ে গৌরবান্বিত হন এবং প্রত্যেক বিচার প্রার্থির সু-বিচারের যথাযথ ব্যবস্থা নেন যুবরাজ। সিরাজউদ্দৌলা জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকা) অবস্থিত জিঞ্জিরা প্যালেসে ১৫ দিন কাটালেন। ঢাকাবাসের প্রায় প্রতিটি দিনই কর্মব্যস্ততায় কাটিয়েছেন যুবরাজ। ঢাকার নবাবি প্রশাসনের ব্যাপক প্রশাসনিক রদবদল করে যুবরাজ আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার মাপকাঠিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ ও বদলি দিলেন। সাথে সাথে প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করা হলো। ঢাকাবাসীর মঙ্গলের জন্য নেয়া যুবরাজ সিরাজের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার, ষড়যন্ত্রকারীদের গভীর ষড়যন্ত্রের সামনে খুব বেশিদিন টেকেনি। এছাড়া যুবরাজ বহু বস্ত্র, নবাবি অস্ত্রাগারের স্থায়ী যুদ্ধ উপকরণ, ৩০০ উট, ৩০০ হাতি, ৩০০ ঘোড়া, গোলন্দাজ বাহিনীর প্রায় পুরো সরঞ্জাম এবং বিশাল মোগল নৌবহর তার নিয়ন্ত্রণে নেন। এসব উপকরণ বিশেষ করে নৌবহর তিনি পরবর্তীকালে তাঁর শাসন আমলে বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের বিনাশ করতে ব্যবহার করেছিলেন। যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলা স্থল পথে তৎকালীন দু'বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকায় এসেছিলেন আর হিরাঝিলের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করলেন তাঁর নবাবি নৌবহর নিয়ে, আজ নবাব সিরাজউদ্দৌলা নেই, নেই তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী বেগম লুৎফুন্নিসা ও অন্য আপনজনেরা। তবুও সাক্ষী হয়ে রয়ে গেছে ঢাকার জিঞ্জির প্যালেস.... সে জানে সিরাজউদ্দৌলা ঢাকায় এসেছিলেন এবং সিরাজকে ষড়যন্ত্রকারীরা পরাজিত করার পর তাঁর প্রিয় আপনজনদের অনেককেই দীর্ঘ ৮ বছর ঢাকার এই প্রাসাদে বন্দি রাখা হয়। ঢাকার দক্ষিণ তীরে বুড়িগঙ্গা নদী ঘেঁষে গড়ে ওঠা জিঞ্জিরা প্রাসাদের অস্তিত্ব আজ প্রায় বিলীন হয়ে গেলেও এর সঙ্গে নবাব সিরাজের আপনজনদের কিছু বেদনাদায়ক স্মৃতি রয়েছে। সরকারের উদাসীনতার কারণে এই প্রাসাদটি সময়ের ব্যবধানে শুধু ক্ষয়ে ক্ষয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

☐ ঢালিউডের মুকুটহীন সম্রাট

ইতিহাসের ট্রাজিক নায়ক বাংলার বীর নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে দেশপ্রেমিক মানুষেরা সকলেই জানে আর ঢাকা চলচ্চিত্রের সিরাজউদ্দৌলাকে চেনে না এমন মানুষ কম। দুটি ভিন্ন সময়, দুটি ভিন্ন মানুষ, দুই ভিন্ন ট্রাজেডি, কিন্তু যেখানে তাঁরা এক হয়ে যান তা... দেশপ্রেম, জাতীয় দুঃখ ও আবেগ। আমরা সবাই

www.pathagar.com

সিরাজের দুঃখ জানি, তাঁর ট্রাজেডি জানি, ব্যক্তি আনোয়ার হোসেনের জীবনে তাই আমাদের আগ্রহ নেই। আমরা যখন নবাব সিরাজউদ্দৌলার জীবনকেই তাঁর জীবন বলে মেনে নিয়েছি, যখন সিরাজের হতাশা ও আক্ষেপকে আনোয়ার হোসেনের অভিনয় দেখে বিশ্বাস করেছি, তখন আর পর্দার পেছনের ঢাকাই চলচ্চিত্রের অভিনেতা আনোয়ার হোসেন কেমন, তা জানার আগ্রহ হবে কেন? হয়ওনি। নবাব সিরাজউদ্দৌলা চরিত্রের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে এভাবেই আনোয়ার হোসেন হয়ে উঠেছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন দেশপ্রেমিক নবাবের প্রতিকৃতি। বাংলার মানুষের মনে চিরকাল তরুণ বীরের প্রতি যে ভালোবাসা কাজ করে, আনোয়ার হোসেন তাঁর অসাধারণ আন্তরিক অভিনয় দিয়ে দর্শকের মনে সেই সুপ্ত নহর জাগাতে পেরেছিলেন। তিনি যখন গলা কাঁপিয়ে সংলাপ দিতেন, 'আমিই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা', মানুষের মনে বিশ্বাস আর সমীহ দুটোই জাগত। দুজনকে আর আলাদা করা যায়নি। সিরাজই আনোয়ার, আনোয়ারই সিরাজ। আনোয়ার হোসেন নিজস্ব ইমেজে জাগিয়ে তুলেছিলেন সিরাজের জীবনকে। কৃষক চেতনার বাংলাদেশে সফল নায়কের চেয়ে ট্রাজিক বীরেরা বেশি সহানুভূতি আর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা পান। আনোয়ার হোসেন সেই ভালোবাসায় আবেগ ও সহানুভূতি জাগাতে পেরেছিলেন। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ বীর চায়, নিপীড়িত জাতি নায়ক চায়, বাংলার জনগণ চায় ট্রাজিক দেশপ্রেমিক সিরাজউদ্দৌলার পুনর্জাগরণ। সিরাজ চরিত্র এই তিনের অভাব অন্তত ৩ বার মিটিয়েছে। ইতিহাসে ৩ বার বেঁচে ছিলেন তিনি। ১ বার নিজের দেশপ্রেমিক জীবনে, ২য় বার মঞ্চ নাটক সিরাজউদ্দৌলায় এবং তৃতীয়বার ঢাকার চলচ্চিত্রে। আর আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশের কোটি কোটি হৃদয় থেকে আবার ডাক পড়ল .... হে বীর, হে দেশপ্রেমিক, তুমি কোথায়? টেকনাফ-তেঁতুলিয়া পর্যন্ত শোনা যায় শ্লোগান... জয়তু সিরাজউদ্দৌলা। আজ আবার বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী আবেগ বীর দেশপ্রেমিক 'সিরাজউদ্দৌলা' প্রতীক চায়। আনোয়ার হোসেন 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' ছবিটির মাধ্যমে বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি হয়ে আছেন। তাকে বলা হয় ঢাকা চলচ্চিত্রের মুকুটহীন সম্রাট আর উক্ত ছবির চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন বলেই সারা বাংলাদেশের লোকজন তাকে সিরাজের মতো আপন করে নিল। ঢালিউডের এই মুকুটহীন সম্রাট পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালে ঢাকায়।

দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার তরুণ সাংবাদিক বিউটি আক্তার নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ভালোবাসায় একাধিক ফিচার প্রকাশ করেছেন

www.pathagar.com

☐ ঢাকায় নবাব পরিবার

রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর উদযাপন
রাজউদ্দৌলা পরিবারের সাক্ষাৎকার প্রকা
লের কণ্ঠের 'শুধুই ঢাকা' পাতায়। দৈ
াহাম্মদ আরিফুজ্জামান তুহিনকে দেয়া
ক্ষাৎকার ফিচার আকারে প্রকাশ পায় ১
রের দিনই অর্থাৎ ১৮.৭.২০১০ ইং - এ
ভার স্টোরি ছিল "ঢাকায় সিরাজউদ্দৌলা
নাব গোলাপ মুনীর। বাংলার বীর নবাব
াব্বাস আরেবকে বসুন্ধরা গ্রুপের জনপ্রিয়
র সম্মাননা.... "We wish the young "na
his endeavours." (সংক্ষিপ্ত), যা উক্ত
াকারে প্রকাশ পায়। ফিচারের শিরোনাম
চারটি তৈরি করেছেন জনাব আদনান এম.

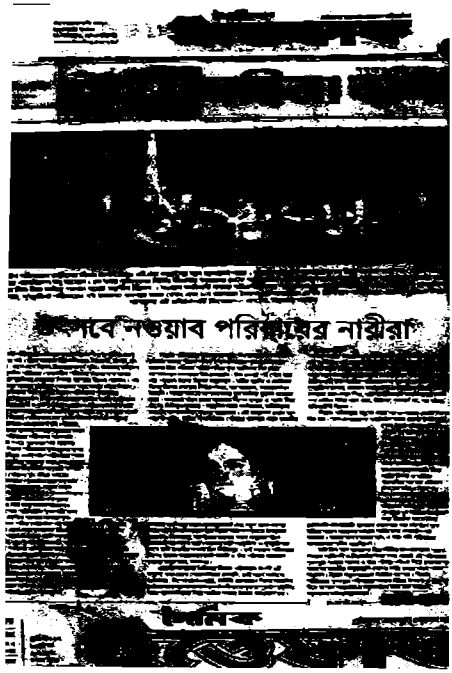

নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের নারীদের
জীবন-যাপনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন
ইত্তেফাকের সিনিয়র সাংবাদিক রাবেয়া বেবী

www.pathagar.com

জনপ্রিয় পত্রিকায় ঢাকায় বসবাসকারী বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব পরিবারকে নিয়ে ফিচার ও সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির জাতীয় দৈনিক মানবজমিন সর্বপ্রথম তাদের পত্রিকার প্রধান শিরোনামে আনে সিরাজউদ্দৌলা পরিবারকে। উক্ত পত্রিকার ২৯.৬.২০১২ তারিখে প্রকাশিত প্রধান শিরোনাম ছিল "নবাব সিরাজউদ্দৌলার বংশধর ঢাকায়"। উক্ত নিউজটি প্রধান শিরোনামে এনে আলোড়ন সৃষ্টি করেন জনাব লায়েকুজ্জামান। এতো গেল পত্রিকার কথা, ঢাকা থেকে প্রচারিত টিভি চ্যানেল... চ্যানেল আই, এন টিভি, চ্যানেল 24 তাঁদের প্রাইম টাইম নিউজ এ এবং গুরুত্বপূর্ণ টকশোগুলোতে ঢাকায় বসবাসরত নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৯ম প্রজন্ম এস. জি. আব্বাসকে অতিথি করে আলোকিত করেন বাংলার ঐতিহ্যকে।

☐ ঢাকায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিষদ

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁর প্রিয় আপনজনদের আদর্শ, চেতনা ও ভালোবাসা তুলে ধরতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিষদ দীর্ঘদিন যাবৎ গঠনমূলক কাজ করে যাচ্ছে বাংলার হৃদয়ে। এই ধারাবাহিকতায় ৯ আষাঢ় ১৪২১ বাংলা সালে ঢাকা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো 'পলাশী দিবস'। লাল সবুজের মাটিতে এই প্রথম (২৪ শাবান ১৪৩৫) বাংলার বীর নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ৮ম ও ৯ম প্রজন্মের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো একটি সফল পলাশী দিবস। পলাশীর শিক্ষা ও বর্তমান নবাব সিরাজ পরিবারকে আলাপচারিতায় ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতায় গণমানুষের সামনে তুলে ধরেন আজকের সমাজের গণ্যমান্য সকল বক্তা। ঐতিহাসিক পলাশী ট্রাজেডির ২৫৭ তম বার্ষিকী উপলক্ষে এ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. রমিত আজাদ। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কর্নেল (অব.) শেখ আকরাম আলী, মুহাম্মদ তারিক উদ্দিন চৌধুরী, পাট সচিব অ্যাড. মির্জা মাহাবুব সুলতান বেগ বাচ্চু, সমাজসেবক গোলাম মওলা রনি, এরশাদ মজুমদার, মোঃ রহুল আমিন মল্লিক, মেজর (অব.) ইব্রাহিম বীর প্রতীক, ড. কে এম মোহসীন, এবং প্রধান অতিথি সাবেক সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ নূর উদ্দিন খান প্রমুখ। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক, গবেষক ও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ- এর অধ্যাপক ড. রমিত আজাদ বলেছেন, "যে মহান ব্যক্তিটির সাথে আমাদের বাঙালি জাতির ভাগ্য গাঁথা হয়ে গেছে তিনি হলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। আগ্রাসী কূটকৌশলী ইংরেজ ও দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের হাতে নবাবের পতন কেবল একটি ব্যক্তির পতন ছিল না, উনার পতনের সাথে সাথে আমাদের জাতিরও পতন ঘটে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পর থেকে জাতির ক্রমাগত অবনতি ঘটতে থাকে ও আমরাও ধীরে ধীরে শ্রীহীন হয়ে যেতে থাকি। এটাই পরাধীনতা। এভাবেই নবাবের ভাগ্যের সাথে আমাদের ভাগ্য গাঁথা হয়ে গেছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার

www.pathagar.com

নানা আলিবর্দী খান নিজ গুণে সমাজের উঁচু মহলে স্থান করে নিয়েছিলেন এবং কঠোর অধ্যবসায়ের পর একসময় তিনি এ দেশের সর্বোচ্চ পদ অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশকে ভালোবাসতেন ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন। দেশকে তিনি রেখেছিলেন সুশাসনে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার জন্ম এই রূপসী বাংলায় (তৎকালীন রাজধানী মুর্শিদাবাদে)। উনার জন্ম তারিখ ও বৎসর নিয়ে ইংরেজরা অনেক বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, উনার জন্ম ১৯ সেপ্টেম্বর ১৭২৭ সালে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তার নানা আলিবর্দী খান দুজনই শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। তারা শিক্ষিতদের সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের অষ্টম ও নবম প্রজন্ম সৈয়দ গোলাম মোস্তফা ও পুত্র সৈয়দ গোলাম আব্বাসকে সম্মাননা জানাচ্ছেন সাবেক সেনাপ্রধান নুর উদ্দিন, সাবেক এমপি গোলাম মাওলা রনি, কর্নেল (অব.) আকরাম আলী এবং সমাজের অন্যান্য বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিবর্গ

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন যুদ্ধ নামক এক ষড়যন্ত্রে দেশপ্রেমী নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন। অতঃপর তিনি নিহত হলেন ২রা জুলাই ১৭৫৭ সালে। তাকে জনসমক্ষে বিচার করে জনমত যাচাই করে ফাঁসি দেয়া হয়নি। আমাদের কপালের লিখন, আমাদের নবাবকে বাঁচাতে পারলাম না। আর এর খেসারত আমাদের দিতে হয়েছে পরবর্তী দু'শো বছর। নবাব পরিবারের পুরো ইতিহাস আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে পাওয়া যায় না। তাই অনেকের জানা নেই যে, পরম করুণাময়ের কৃপায় নবাবের বংশধরেরা টিকে আছে। নবাবের একমাত্র কন্যা উম্মে জোহরার বিবাহ হয় সিরাজের আপন ভ্রাতুষ্পুত্র মুরাদউদ্দৌলার

www.pathagar.com

সাথে। তবে ইংরেজ আমলে তারা নীরবে নিভৃতে দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন। একসময় ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ জানেন নবাব পরিবারের দুঃখের কথা। তিনি ঢাকার আহসান মঞ্জিল থেকে ১৬.০৬.১৯১৩ সালে লিখিত এক পত্রে তদানীন্তন বাংলার গভর্নরের নিকট সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ৬ষ্ঠ বংশধর সৈয়দ জাকি রেজাকে একটি সম্মানজনক চাকরি দেয়ার সুপারিশ করেন। উনার সুপারিশে সৈয়দ জাকি রেজা একটি সম্মানজনক চাকরি পান। ৭ম বংশধর সৈয়দ গোলাম মুর্তজা ১৯৪৭ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে পূর্ব বাংলায় চলে আসেন। তিনি সরকারি চাকরি করতেন।

সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল (অব.) নুর উদ্দিন ও সাবেক সেনা কর্মকর্তারা নবাব সিরাজউদ্দৌলার নবম প্রজন্ম সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেবকে নবাবজাদা আলী আব্বাসউদ্দৌলা উপাধিতে সম্মানিত করেছেন। ছবিতে সাবেক সেনাপ্রধান নবাবজাদা আলী আব্বাসউদ্দৌলা ও তার পিতা সৈয়দ গোলাম মোস্তফাকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন।

১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথিতযশা সাংবাদিক ফজলে লোহানী তার জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান (বিটিভি-তে প্রচারিত) 'যদি কিছু মনে না করেন'- এ জনাব সৈয়দ গোলাম মুর্তজাকে পরিচিত করিয়ে দেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৮ম বংশধর সৈয়দ গোলাম মোস্তফা পিডিবি-র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ৯ম বংশধর সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেব ওরফে নবাবজাদা আব্বাসউদ্দৌলা একজন লেখক। আমাদের দেশে অনেক শহীদ পরিবার, বুদ্ধিজীবী পরিবার ও ক্ষতিগ্রস্ত অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের পরিবারবর্গ সরকারি সাহায্য, সহযোগিতা ও আনুকূল্য পেয়েছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারকেও মর্যাদার আসনে

www.pathagar.com

অধিষ্ঠিত করা হোক, সমাজের কাছে এই দাবি আমরা করতে পারি।" পলাশী ট্র্যাজেডি দিবস ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার নতুন প্রজন্ম কে সংবর্ধনা উপলক্ষে ২৪ শাবান ১৪৩৫ হিজরি (সকাল ১১টা)- তে জাতীয় প্রেসক্লাবে সেন্টার ফর মিলিটারি হিস্ট্রি' এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিষদের আলোচনা সভায়, তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সেন্টার ফর মিলিটারি হিস্ট্রি, ঢাকা (CMHD) এর ৯ আষাঢ় ১৪২১ বাংলা সনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ৮ম ও ৯ম বংশধর সৈয়দ গোলাম মোস্তফা ও সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেবকে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মানীত করা হয়। এবং উক্ত অনুষ্ঠানের আলোচকরা সকলেই সিরাজ পরিবারের নতুন প্রজন্মের প্রতি ভালোবাসার হাত সম্প্রসারণের আহ্বান জানান।

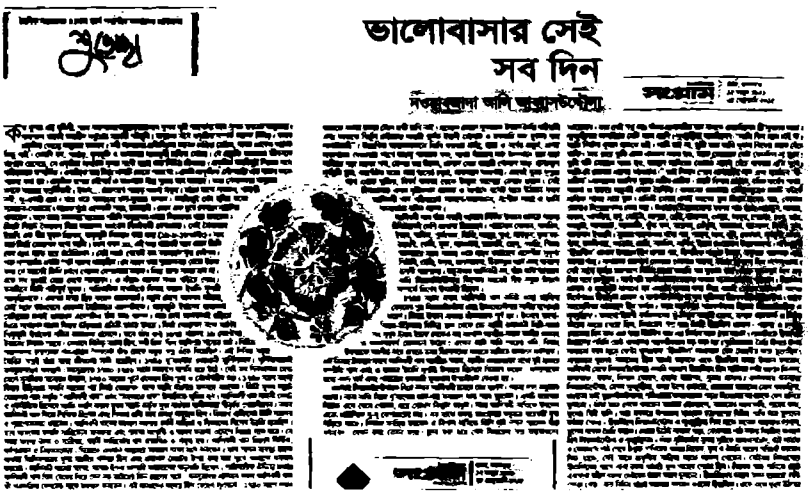

ভালোবাসার সেই
সব দিন

নবাবজাদা আলী আব্বাসউদ্দৌলা উক্ত লেখাটি ভালোবাসার মাস ফেব্রুয়ারিতে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়

উক্ত অনুষ্ঠান শেষে সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের সম্মানে একটি রেস্তোরাঁয় বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব মুহাম্মদ তারিক উদ্দিন চৌধুরী ও তাঁর সহধর্মিনী একটি ভোজসভার আয়োজন করেন। উক্ত ভোজসভায় সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এবং সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের জন্য আশীর্বাদ করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম বি.এন.পি-র কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম মিথিল। জুলাই মাস শোকের মাস। ১৭৫৭ সালে এই মাসে বাংলার মানুষের প্রাণপ্রিয় নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নির্মমভাবে রাতের অন্ধকারে হত্যা করা হয়, তারিখটি ছিল ২ জুলাই। এ

www.pathagar.com

শাকের মাস জুলাই আর বাংলা মাস শ্রাবণের ৪ তারিখ ১৪২১-এ। বাংলার দশপ্রেমিক নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে দোয়া ও ইফতার মাহফিলের মাধ্যমে স্মরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিল নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিষদ ও সেন্টার ফর মিলিটারি হিস্ট্রি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিচারপতি জয়নুল আবেদিন। উপস্থিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দের মধ্যে অন্যতম তমদ্দুন মজলিসের ভাইস প্রসিডেন্ট ও সাংবাদিক মুহাম্মদ সিদ্দিক, এরশাদ মজুমদার, কর্নেল (অব.) মোঃ হিদুল্লাহ, সাংবাদিক আতিকুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার সোহাগ, জনাব হমতউল্লাহসহ আজকের সমাজের সকল ক্ষেত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্মরণে শোকসভা ও ইফতার মাহফিল ৪.৪.১৪২১ বাংলা তারিখে াকার মহাখালীতে অবস্থিত রাওয়া ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটির সফল দ্যোক্তা ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিষদের ড. রমিত আজাদ, কর্নেল অব.) শেখ আকরাম আলী, মোঃ রুহুল আমিন মল্লিক, মুহাম্মদ তারিক উদ্দিন চৌধুরী (বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ), নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৯ম বংশধর সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেবসহ আরো অনেকে।

মাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শাইক সিরাজ, ড. মুহাম্মদ ফজলুল হক, ড. মুহাম্মদ তারিক চৌধুরী, পুলিশের সাবেক আইজি এ কে এম মাহবুবুল হক, সাবেক এ: পি আন্দালিব রহমান পার্থ, মেজর জেনারেল (অব.) ইব্রাহিম বীর প্রতিক এ: াথে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ৯ম প্রজন্ম সৈয়দ গোলাম আব্বাস

www.pathagar.com

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. রমিত আজাদ উ
মাঝে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৯ম বংশধর
সাথে পরিচয় করিয়ে দেন, পাশাপাশি ি
হারিয়েছি দেশপ্রেমিক নবাব, হারিয়েছি ৈ
মূল্যবোধ ও মনোবলের অভাবে আমরা
অর্জন করতে পারিনি বহুকাল। সেই সুযে
পুরাতন শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি-ঐ
ধ্বংসযজ্ঞ। যাতে আমরা সচেতন হয়ে উ
পেতে না পারি। তিনি বলেন... আমাদের
অতীব জরুরি।"

□ **ঢাকার বাতাসে ভালোবাসার রং**

ভালোবাসা দিবস ১৫ শতাব্দীর প্রথম
একজন যুবককে আগিন কোর্ট যুদ্ধে জেলে
খুব মিস করছিল। সে ভালোবাসার চিঠির ম
স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করে। এর প্রায় ২০০
দিবসের প্রতীক হিসেবে প্রচলিত হয়ে ও

ছবিতে ড. মুহাম্মদ তরিক চৌধুরী ও লেখক

www.pathagar.com

দখতে পেতেন এবং পত্রিকাটির তেজগাঁও কার্যালয়ের সামনের সড়কটি লাভলেন' হিসেবে ঘোষণা করেন তিনি। সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে তিনি াকা থেকে 'মৌচাকে ঢিল' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। তার মতে, শ্চিমা দেশগুলোতে ভ্যালেন্টাইন ডে পালিত হয় প্রেমিক প্রেমিকার এবং স্বামী-ীর মধ্যে।

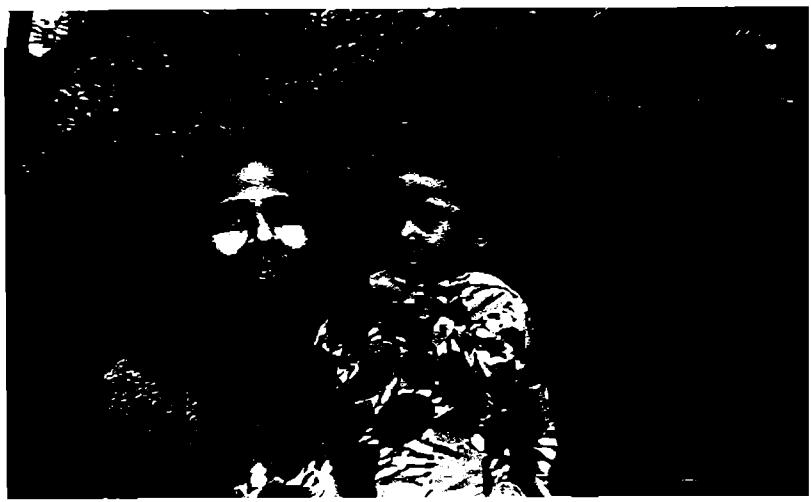

ছবিতে সৈয়দা সাকিনা ও ফিজ্জা এ ফাতমী

আমি চিন্তা করলাম। এটার পরিধি বাড়াতে হবে। নামটা বদলে দিতে হবে। টায় যেন বাঙালিত্ব থাকে। আমি যখন কলকাতায় ছিলাম তখন আমাদের াশপাশে অনেকেই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। আমার বাড়িওয়ালাও ছিলেন হিন্দু ক্ষণ। আমি খুব মুগ্ধ হতাম যখন আমার হাতে তাদের মেয়েরা রাখি পরিয়ে ত। এই যে ভাই আর বোনের মধ্যে সম্পর্ক এটা ১টা আবহমান বাংলার ম্পর্ক। এগুলো চালু হওয়া উচিত। তার মতে, ভালোবাসা তো শুধু প্রেমিক মিকা, স্বামী স্ত্রীর নয়, এটা ভাই বোনের মধ্যে হতে পারে, মা-বাবা সন্তানদের ধ্য হতে পারে। সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার সম্পর্ক হচ্ছে মা এবং সন্তানের ধ্যে। শফিক রেহমান আরও বলেন, বাংলাদেশে ভালোবাসা দিবসের প্রচলনের বার ২১ বছর চলছে। এই ২১ বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে। অনেকে এই নে বিয়ে করে, প্রথম হাত ধরে ভালোবাসার কথা বলে, চুমু খায়, বেড়াতে য়, ডেট করে। এটা আমার জন্য নিতান্তই আনন্দের বিষয়। ভালোবাসার বাণী বা-মা, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশী, পুলিশের সঙ্গে জনগণের, বাড়িওয়ালার ঙ্গে ভাড়াটিয়ার হতে পারে। যেখানেই সংঘাত সেখানেই যদি ভালোবাসা থাকে হলে দেশটা অনেক শান্তিপূর্ণ অবস্থায় থাকবে। আমি ভালোবাসার কুশন বের রেছিলাম। আমার পত্রিকার ভালোবাসা সংখ্যায় নানা রকম ব্যাজ, ব্যাগ,

www.pathagar.com

চকোলেট ইত্যাদি ফ্রি দেওয়ার প্রচলন, বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে আমি শুরু করেছিলাম। যাতে বাংলাদেশে ভালোবাসার বাণী ছড়িয়ে পড়ে। আমি খুশি এদেশের তরুণ সমাজ সাদরে এটা গ্রহণ করেছে। এতো গেলো শফিক রহমানের কথা। আমার মতে ভালোবাসা দিবসের মর্মকথা আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে প্রিয়জনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। কারণ ভালোবাসা শেখায় সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-উৎসবের গান ভাগাভাগি করে নিতে।

ছবিতে নাজনীন ও শিশুকন্যা আলিয়া ও সুক্যাইনা

অনতি-অতীত থেকে আমাদের দেশে ভালোবাসা দিবস সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়ে আসছে, বিশেষ করে ঢাকার তারুণ্যের মধ্যে। যখন যৌবন আছে প্রণয় থাকবে, বয়স যখন আছে প্রেমও থাকবে। বিশ্বের মুগ্ধতা নিয়ে ফুল পাখি গাছপালা,নদী কোনো এক অগোচর দায়ে যে যার মতো সবাই রয়েছে মগ্ন ভালোবাসা' শব্দটি এখানে গভীর তাৎপর্যবাহী। আসলে ভালো না বাসলে দুর্দিনে তীব্র সংগ্রামে বেঁচে ওঠা যায় না। ভালোবাসা কি? বলা যেতে পারে- ১. দৈহিক আকর্ষণের ভদ্র রুচিসম্মত প্রতিশব্দ। ২. জীবনের প্রাপ্তিগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাওয়া। ৩. সাহচর্য বা কমপ্যানিয়নশিপ। মানব সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে ভালোবাসার বিচিত্র রূপ। কনিষ্ঠদের প্রতি ভালোবাসা, বয়োজ্যেষ্ঠর প্রতি ভালোবাসা, অন্যান্য সম্পর্কিত ব্যক্তিদের প্রতি ভালোবাসা। প্রতিটি ভালোবাসার মধ্যে আছে শ্রদ্ধা, স্নেহ, আবেগ, আত্মিক সম্পর্ক, কল্যাণ, কামনা ও ত্যাগ একইভাবে জীবনসঙ্গীর ভালোবাসায়, থাকতে হয় পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান কল্যাণবোধ, ত্যাগ ও রোমান্টিকতা। মনে রাখা দরকার, সাংসারিক জীবন ভালোবাসা স্নেহের হাত ধরে চলে। বস্তুত ভালোবাসা মানুষের জীবনে এক দুর্লভ সৌভাগ্য। ভালোবাসা অহৈতুকী হলেও আগের দিনে একটা বিচারবোধ কাজ

www.pathagar.com

করত। কিন্তু ইদানীং যেন স্খলিত স্বরেই এর উচ্চারণ হচ্ছে বেশি। এক পিচ্ছি সময়ে যখন নতুন প্রজন্মের কাছে অতীত হয়ে উঠেছে ধূসর, দেশ-বিদেশের অত্যাধুনিক উন্মুক্ত সংস্কৃতি গ্রাস করে ফেলছে তাদের কাঁচা আবেগ অনুচিত্যবোধ কিছুই যেন আর নিয়ন্ত্রণে থাকছে না। ভুবনজুড়ে প্রেমের স্রোতে তরুণ বয়সের ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। তাইতো বাজার অর্থনীতিতে 'ভালোবাসা'ও যেন আজ পণ্য।

ছবিতে আলিশান ও ফাতমী ভালোবাসার বন্ধনে

১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার আকাশ বাতাস হয়ে উঠে বেশ রঙিন। এদিন ঢাকা নব ধরনের ভালোবাসার সুভাস ছড়ায়। ছেলেমেয়েরা এদিন মা-বাবাকে ভালোবাসা জানিয়ে থাকে, বন্ধু-বন্ধুকে ভালোবাসার শুভেচ্ছা জানায় হৃদয় ছোঁয়া ভালোবাসায়। এদিবসে ঢাকায় ফুল, চকোলেট, ফল, মিষ্টি, কেক এবং অন্যান্য উপহার ভালোবাসার মানুষদের মধ্যে বিনিময় করা হয় আর উপহারের মাধ্যমে থকে অন্যের জন্য, মিষ্টি মিষ্টি ভালোবাসা প্রকাশ পায়। ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি াকা হয়ে উঠে ফুলের শহর। ঢাকার অলিগলি ও ব্যস্ত সড়কে মানুষের হাতে াহারি সব ফুল দেখো যায় পাশাপাশি চারিপাশে ফুলের দোকান লক্ষ করা যায়, তবে শাহবাগের ফুলের দোকানগুলোর কথাই ভিন্ন... সব বয়সি মানুষের উপচেপড়া ভিড় থাকে ভালোবাসার বিশেষ দিনগুলোয়। দোকানগুলোতে বিভিন্ন কমের রঙিন ফুলের বাহার দেখা যায়। ঢাকার প্রজন্ম চত্বর বা শাহবাগে তিদিন বিকাল-রাত্রি পর্যন্ত বসে তারুণ্যের মেলা। এই মেলার বিস্তৃতি ঘটে মনা পার্কের ভেতর পর্যন্ত যে যার মনের মানুষ খুঁজে নেয় এই মেলা থেকে। ার সরকারি ছুটির দিন এবং ভালোবাসা দিবসগুলোয় এই এলাকা হয়ে উঠে ানা রঙের প্রাণের মেলায় আরও প্রাণবন্ত আরও রঙিন।

www.pathagar.com

□ ঢাকার অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে

* পুরানো ঢাকার ওয়ারিতে উঁচু পাচিলে ঘেরা বলধা গার্ডেন। এই উদ্ভিদ উদ্যানটিতে অনেক দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষ ও ফুলের গাছ রয়েছে।

* কমলাপুর বৌদ্ধ বিহার * জাতীয় সংসদ ভবন * বায়তুল মোকাররম মসজিদ * বেনারসি পল্লী (মিরপুর) * শিখ গুরুদুয়ারা * ছোট্ট কাটরা * আগারগাঁও এলাকায় অবস্থিত বিজ্ঞান যাদুঘর * সোহরাওয়ার্দী উদ্যান * ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলেখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে খ্যাত। এর একটু সামনেই T.S.C -এর বিশাল চত্বর * এছাড়াও রয়েছে লাইব্রেরী, অডিটরিয়াম * চারুকলা ইনস্টিটিউট, * জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি * আর্ট ইনস্টিটিউট এর পাশেই রয়েছে জাতীয় লাইব্রেরি * কার্জন হল * সবুজ গাছ গাছালিতে ঘেরা শের-এ-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলার দেশপ্রেমী বীর নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের শ্রদ্ধায় উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ঢাকার আগারগাঁয়ে * বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর : ঢাকার প্রাণকেন্দ্র শাহবাগে জাতীয় গ্রন্থাগারের পাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সবুজ বাগান ঘেরা মনোরম পরিবেশে যাদুঘরটি অবস্থিত। * বাহাদুর শাহ পার্ক * নজরুল জাদুঘর ঃ ধানমণ্ডির নজরুল ইনস্টিটিউট জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। * ঢাকা নগর জাদুঘর ঃ এই জাদুঘরটি ঢাকা নগরীর ইতিহাস, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে তুলে ধরার লক্ষ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। * খাজা আম্বর শাহ মসজিদ : শায়েস্তা খাঁর আমলে নির্মিত উক্ত মসজিদ কারওয়ান বাজারে অবস্থিত। * সাতগম্বুজ মসজিদ : এটিও শায়েস্তা খাঁ নির্মিত, এর অবস্থান মোহাম্মদপুরের জাফরাবাদে * সাত মসজিদ রোডের ধানমণ্ডি ঈদগাহ * পুরোনো হাইকোর্ট এলাকার শাহবাজ খান মসজিদ * বেগমবাজারের কারতালাব খান মসজিদ * মিটফোর্ড এলাকার শায়েস্তা খান মসজিদ * বাংলা একাডেমি * তেজগাঁওয়ের হলি রোজারিও চার্চ * আরমানিটোলার তারা মসজিদ * বংশাল জামে মসজিদ * রমনার রেসকোর্স গ্যালারি * বসুন্ধরা শপিংমল (পান্থপথ) * যমুনা ফিচারপার্ক ও দেশের সর্ববৃহৎ শপিংমল, সিনেপ্লেক্স, মিডিয়া হাউজ (বিশ্বরোড) * লেকসিটি (খিলক্ষেত)।

□ হোসাইনি দালান

এটি একটি ইমাম বাড়া মসজিদ। এই স্থাপনা ও তার চারপাশের পরিবেশ একবার মন দিয়ে দেখলে দূরদূরান্ত থেকে আসা বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় ভক্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যা কয়েক যুগ ধরে ইসলামি ঐতিহ্য কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। ইসলামি ঐতিহ্যের ছোঁয়া আর কারুকার্য ও নকশায় নির্মিত ভবনটি সহজেই পর্যটকদের দৃষ্টি কাড়ে। স্থাপনাটির পাশ ঘেঁষে রয়েছে বিশাল আকৃতির চমৎকার পুকুর আর পুকুরে বিচরণ করে রাজহাঁস, পাতিহাঁসের

www.pathagar.com

দল। আকর্ষণীয় পবিত্র এই ভবনটির ভেতর প্রবেশ করলেই দেখা যাবে ইরানি শিল্পীদের সুনিপুণ ইসলামি শিল্পকলার সার্থক নিদর্শন। সব মিলিয়ে এর স্থাপত্য বিশালকার ভবন, শান্ত পরিবেশ, মনে আনে প্রশান্তি।

□ ফুলে ফুলে সাদা ঢাকা

সকালের মিষ্টি রোদ, ঘাসের ডগায় শিশিরের স্নিগ্ধ পরশ, আকাশজুড়ে সাদা মেঘের আনাগোনা, পথে পথে কাশফুলের শুভ্রতা- এসব মিলিয়েই হলো শরৎ কাল। রাজধানী ঢাকার কোলাহল ও যান্ত্রিক জীবনকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে ঠেলে দিয়ে ঢাকার আশপাশে কিছু জায়গায় বেড়াতে গেলেই মিলবে শরৎ প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য।

ইছাপুরা...

নগরের খিলক্ষেত থেকে একটু ভেতরে দিকেই এ জায়গাটা। ঢাকার এত কাছেই প্রকৃতি কত সুন্দর, তা দেখে চমকিত হতে হয়। বরুয়া ঢোকার পরপরই নানা পাখপাখালির কলকাকলি আর ছোটাছুটি। কখনো কখনো একটা - দুটো বক বা পানকৌড়িও এসে বসছে। সেই ভালো লাগাকে সঙ্গে নিয়ে সামনে এগোলেই এক দিকে বরুয়া বিল আর অন্যদিকে বিশাল কাশবন। সাদা সাদা কাশফুল। এখানে বিভিন্ন হাউজিং সোসাইটির ভেতর বালুর উপর ফুটেছে থোকায় থোকায় কাশফুল। অপলক চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। এখানে ঘুরতে কারও কোনো বাধা নেই। পাশের বিলে জাল দিয়ে মাছ ধরছেন জেলেরা। কিছুক্ষণ পরপর জাল তুলে দেখছেন, মাছ আটকেছে কিনা।

এই পথ ধরে আর কিছুদূর গেলেই ইছাপুর বাজার। মনে হচ্ছে, বাজারটির নাম ইচ্ছেপুরও হতে পারত! সে কথাই বলছি। ইছাপুরের সড়ক সেতুর ওপর থেকে নদটা খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়। পাশে বড় বড় কচুরিপানার ফাঁকে ফাঁকে শালিকের উড়াউড়ি। সেতুটি পার হলেই বালু নদের ঘাট অপেক্ষা করছে অনেকগুলো নৌকা। প্রতি ১০ মিনিট পরপর এ নৌকাগুলো ছেড়ে যায় দেরাইতের উদ্দেশে। নৌকা থেকে নদের দুই পাশ দেখতে অসাধারণ লাগবে। আবার এখান থেকে কাঞ্চন সেতুও ঘুরে আসা যায়। দলবেঁধে পিকনিকের জন্য এ জায়গাটা দারুণ। ঘাট থেকে সেখানটায় দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা লাগে পৌঁছাতে। ইছাপুর বাজারে হাটবার সোমবার হলে কী হবে, সারাক্ষণই এ বাজারটি জমজমাট থাকে। এখন কতবেলের মৌসুম। ছোট-বড় কতবেলের পসরা সাজিয়ে বসেছে এখানকার দোকানিরা। আছে সারি সারি আখের দোকান। পাশের গ্রামের আখ খেতের আখ পাওয়া যায় এখানে। আশপাশের গ্রামগুলোর আবাদ করা নানা জাতের তরতাজা মৌসুমি সবজিও অনেক কম দামে মিলবে এখানটায়। বিকেলে এখানে নৌকার ঘাটে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়। এ ছাড়া নৌকার ঘাটে চা, নাস্তার পাশাপাশি চিনির মুরালি, ভাজা-ভুনাও খেয়ে নিতে পারেন। ইছাপুর বাজারে পাওয়া যায় তরতাজা মাছ। ফিরে আসার সময় এর

www.pathagar.com

খোঁজখবরও নিতে পারেন। এভাবে সারা দিন ঘুরে খুব সুন্দর একটি দিন কাটিয়ে দেওয়া যায় বরুয়া বিল-ইছাপুর ও বালু নদের পাশে। এখানে যাওয়ার জন্য প্রথমে বাসে করে খিলক্ষেত। এরপর টুকটুকে ইছাপুর। তবে নিজের গাড়িতে করে কিংবা দলবেঁধে গেলে আরও ভালো লাগবে এখানটায়।

তুরাগ নদ আর বিস্তীর্ণ কাশবন...

গাবতলী থেকে আমিনবাজার পার হয়ে শালিপুর। এর একটু ভেতরে ঢুকলেই ভার্কুত্তা ইউনিয়ন। মহাসড়ক থেকে চলে গেছে একটি রাস্তা। রাস্তাটির শুরুতেই চোখে পড়বে এক দিকে তুরাগ নদ, আর অন্যদিকে বিস্তীর্ণ কাশবন। এখানে এলেই বন কথাটির যথার্থতা মেলে। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু সাদা সাদা কাশফুল। একটু ভেতরে ঢুকতেই যেন আরও অপরূপ সৌন্দর্য ধরা দিল। সুন্দর একটি বেইলি ব্রিজ পার হয়েই কাশবনের ভেতরে ছোট ছোট পাখির কিচিরমিচির শব্দ। কিন্তু পাখি কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে চোখ আটকে গেল কাশফুলের ঘন ঝোপের দিকে। কিছুটা আড়াল থেকে নানা ভঙ্গিতে ডেকে যাচ্ছে কালো আর গাঢ় হলুদ রঙের মুনিয়া পাখির দল। এখানে-সেখানে ফুরুৎ ফুরুৎ করে উড়ছে মুনিয়ারা। থোকায় থোকায় ফুটে আছে ধবধবে সাদা কাশফুল। মৃদু বাতাসে দুলছে এদিক-সেদিক, যা সত্যিই অতুলনীয়! বালুর ওপর হাতের নাগালে পাওয়া কাশফুলগুলোর নরম ছোঁয়া পেয়ে ভালো লাগে। কাশবনের উল্টোদিকে তুরাগ নদে মাছ ধরছেন জেলেরা। এই নদে নৌকায় করে ঘুরতে বের হওয়া যায়। জেলেদের জালে ধরা নদের মাছ কিনতে পাওয়া যায় এখানে। ভার্কুত্তা গ্রামের আশপাশটাও চমৎকার। পথে পথে ফুটেছে কলমিলতা আর নানা ধরনের বুনোলতার ফুল। এ গ্রামে অনেক দুধের খামার আছে। চাইলেই মিলবে গরুর খাঁটি দুধ।

ভার্কুত্তার ওপারে বয়ে গেছে ক্ষীণ স্রোতের বুড়িগঙ্গা নদী। এতটাই কম স্রোত যে সেখানে এটির উপর দিয়ে বাঁশের সাঁকো চলে গেছে। গাবতলী থেকে ছোট ছোট গাড়ি ১০ টাকার বিনিময়ে ভার্কুত্তা যায়। এই পরিবহন ছাড়া অটোরিকশা দিয়েও ঘুরে আসতে পারেন এই এলাকাটি।

আরও কিছু কাশবন...

ঢাকার আশপাশের মধ্যে বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ দিকে হাসনাবাদে সেনাছাউনির পাশে আছে কাশবন। এরপর দুই মাইল দূরে কেরানীগঞ্জের মোল্লারাপুরেও আছে কাশফুল। ঢাকার গাবতলী থেকে আরিচা মহাসড়কের দুই পাশে, বনশ্রীর আফতাবনগর, হেমায়েতপুর ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন কাশবন। এছাড়া কাশবন রয়েছে টঙ্গীর টেলিফোন শিল্প সংস্থার মাঠজুড়ে। এই স্থানগুলোর পাশেই রয়েছে নানা খাবারের দোকান। ঘোরার ফাঁকে ফাঁকে হালকা নাশতাও করে নিতে পারবেন এখানে।

www.pathagar.com

☐ ঢাকায় বিদেশি শিক্ষার্থী

আদেল হোসেন পড়াশোনা করছেন ইবরাহিম মেডিকেল কলেজে। এমবিবিএস চতুর্থ বর্ষে। থাকেন স্যার পিজে হার্টজ ইন্টারন্যাশনাল হলে। কাশ্মীরিরা কোরবানির ঈদের দিন সকালে সেমাই এবং ঐতিহ্যবাহী পানীয় 'কেহওয়া' পান করে গোসল করে। তারপর নামাজ পড়ে পশু কোরবানি করে। মাংস রান্নার পর খাওয়া-দাওয়া করে প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনের বাসায় যায়।

ওদের দেশে আমাদের মতো কোরবানির হাট বসে না। ঈদের এক সপ্তাহ বা ১০ দিন আগে থেকে মসজিদের বাইরে কোরবানির প্রাণীগুলো বিক্রি শুরু হয়। উট, ভেড়া এবং বড় বড় খাসি দিয়ে কোরবানি করে থাকে কাশ্মীরের বাসিন্দারা। এক একটি বড় খাসির ওজন ৫০ থেকে ৬০ কেজি হয়।

বাবা-মাসহ চার ভাই নিয়ে আদেলদের পরিবার। ভাইদের মধ্যে তিনি তৃতীয়। প্রতিবার ঈদ করতে ঈদের ৮-১০ দিন আগে বাড়ি যাওয়া হতো তার। এবার পরীক্ষার ব্যস্ততার কারণে এখানেই ঈদ করতে হবে। ঢাকায় থাকা বন্ধুদের অনেকে বাড়িতে চলে যাবে। ঢাকা শহর একটু ফাঁকা হয়ে যাবে। বাড়ির জন্য একটু কষ্টও হবে।

ছবিতে মিনহাজ ও তার বন্ধুরা

কীভাবে এবারের ঈদ করবেন, জানতে চাইলে ভারতের কাশ্মীরি এ তরুণ জানান, 'এবার আমাদের হলে আমরা কাশ্মীরিরা নিজেরা কোরবানি দেব ঠিক করেছি। কিছু মাংস নিজেদের জন্য রেখে বাকিটা গরিবদের দান করব। ঢাকায়

www.pathagar.com

থাকা বন্ধুদেরও আমন্ত্রণ করব এবং ওদের বাসায়ও যাব। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মীয় বা যেকোনো উৎসবে ভিনদেশিদের সঙ্গে অনেক বেশি আন্তরিক আচরণ করে। ব্যক্তিগতভাবে এটা আমার খুব ভালো লাগে। ঈদের তিন দিন পরে বাংলাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থানে ভ্রমণ করার পরিকল্পনা আছে। আশা করছি বাংলাদেশে এবারের ঈদ অন্যরকম হবে।'

☐ ফালসা

নবাব আলিবর্দী খানের প্রিয় নাতি সিরাজউদ্দৌলা তাঁর স্বপ্নরঙের সৌন্দর্যের বাস্তবরূপ দিয়েছিলেন বাংলার জমিনে, 'হিরাঝিল' প্রাসাদ দাঁড় করিয়ে। এই হিরাঝিলে বহু গাছ গাছালির ভিতর তিনি এবং তাঁর স্ত্রী বেগম লুৎফুন্নিসা একত্রে লাগিয়ে ছিলেন একটি ফলজ বৃক্ষ। সেই বৃক্ষটির নাম 'ফালসা'। বংশ পরম্পরায় ফালসার বীজ সংরক্ষণ করে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের সদস্যরা গাছটি সংরক্ষণ করছেন বহুযুগ থেকে। আজও সিরাজ পরিবারের ক্ষুদ্র বাগানে উক্ত গাছটি দেখতে পাওয়া যায়। সু-স্বাদু এই ফলটি নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁর স্ত্রী লুৎফার প্রিয় ফলের তালিকায় শীর্ষে ছিল। রসালো এই ফলটি বুলবুলি পাখি ও মৌমাছির অতি প্রিয় একটি খাদ্য। অনেকেই ফালসা চেনে না। কিন্তু সে যে আমাদের ঘরের ফল। এই উপমহাদেশই তার আদি আবাস। আর বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি করে পাখিরা। ঢাকায় জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান ও রমনা পার্কে দুটো গাছ (Grewia asiatica) আছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় এখনো অল্পস্বল্প চোখে পড়ে। মাঝারি আকৃতির পত্রমুচি বৃক্ষ। পাঁচ-সাত মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। পাতা ডিম্বাকার, খসখসে, রোমশ ও কিনারা দাঁতানো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হালকা হলদে রঙের ফুল ফোটে মার্চ-এপ্রিলে। ফল পাকে মে-জুন মাসে। দেখতে মটরদানার মতো, গোলাকার। কাঁচা রং সবুজ, স্বাদে টক। পাকলে কালচে বাদামি রঙের, টক-মিষ্টি স্বাদের। রস গরমে ক্লান্তিনাশক, তাছাড়া স্কোয়াশ ও অন্যান্য কোমল পানীয় তৈরিতেও কাজে লাগে। প্রতি ১০০০ গ্রাম ফল থেকে ৭২৪ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। মিয়ানমারে গাছের বাকল সাবানের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাকলের আঠালো উপাদান খাদ্যদ্রব্য শোধনেও কাজে লাগে।

☐ ঢাকার বাগানে নিম

এটার বৈজ্ঞানিক নাম আজাদিরক্তা ইন্ডিকা। বাংলাদেশ ও ভারতে এটা নিম নামে পরিচিত হলেও ইরানিরা একে বলে আজাদ দিরখত। ইরাকিরা বলে নিব। নিম গাছের কচি পাতা লালচে রঙের হয়ে থাকে। সাদা ও সুগন্ধি ফুল হয় গাছটিতে। জলপাইয়ের মতো ক্ষুদ্র ফল জন্মে। ভারতে নিম গাছ স্বর্গীয় বৃক্ষ, সর্বরোগের ওষুধ, প্রকৃতির ওষুধালয়, গ্রামের ফার্মেসি নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে এখনও দাঁতের ব্রাশ হিসেবে নিমের ডাল ব্যবহৃত হয়। পরিবেশবান্ধব কীটের জন্য এ গাছ বেশ উপকারী। ক্ষতিকর কীটের বংশ বিস্তার রোধ করে গাছটি। বায়ু পরিশোধনে নিম গাছের জুড়ি নেই। তাই বাড়িতে ১টি করে নিম গাছ লাগানো হলে তা স্বাস্থ্যের অনুকূল প্রমাণিত হতে বাধ্য। মসজিদের শহর ঢাকাতে মসজিদে মসজিদে বাগিচায় নিম গাছের বাহার দেখা মেলে। পাশাপাশি রমনা পার্ক, বলধা গার্ডেনসহ বিভিন্ন উদ্যান ও বাড়ির আঙিনায় ঢাকাবাসীর প্রিয়জন হয়ে আছে নিম গাছ।

□ ঢাকার মিষ্টি

১৯ শতকের শেষদিকে ঢাকায় প্রায় প্রতিদিন নানা উৎসব অনুষ্ঠান হতো। তখন চকবাজার ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। স্থানীয় ঘোষেরা দই, মাঠা, রসগোল্লা, অমৃতি আর জিলাপির মধ্যে মিষ্টান্ন শিল্পকে সীমাবদ্ধ রাখেন। সেই সময় ব্যতিক্রমী আর ভিন্ন স্বাদের মিষ্টান্ন নিয়ে সুদূর লক্ষ্ণৌ থেকে ঢাকায় আসেন আলাউদ্দিন হালুইকর ও মাদার বক্স হালুইকর। চকবাজারে মিষ্টান্ন ভাণ্ডার খুলে ভারতীয় মিষ্টি তৈরি করে এ দুই মুসলমান ময়রা নগরবাসীর মন জয় করেন। একসময় মাদার বক্স হালুইকরের মিষ্টান্ন ভাণ্ডার গুটিয়ে গেলেও আলাউদ্দিন সুইটমিট এখনো ধরে রেখেছে আলাউদ্দিন হালুইকরের বংশধরেরা।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আলাউদ্দিন সুইটমিট তৈরি করে সোহান হালুয়া, দুধের শরবত, মালাইচপ, পেড়া, সন্দেশ, জাফরান লাড্ডু, মাওয়া লাড্ডু, কাঁচাগোল্লা, স্পেশাল দই আর সাদা চমচম। এর মধ্যে সোহান হালুয়া ছিল ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর প্রিয় মিষ্টান্ন। আলাউদ্দিন হালুইকর সলিমুল্লাহর জন্য এ হালুয়া বানানো শুরু করেছিলেন। তা পরে নগরবাসীর প্রিয় খাবারে পরিণত হয়। নগরে বাংলা নববর্ষের আয়োজনের মধ্যে আছে হালখাতা, মেলা ও খেলাধুলা। এসব অনুষ্ঠানে মিষ্টান্ন খাওয়ার একটা প্রাচীন রীতি পালন করা হয়। বংশালের আদি বাসিন্দার মতে বাংলা নববর্ষ মানে উৎসব আর ভালো খাওয়া দাওয়া। গরিবেরাও এ দিন পোলাও-মাংস খাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এর মধ্যে পান্তাভাত, ইলিশ ভাজার প্রচলন কীভাবে হলো তা জানি না? বৈশাখী মেলায় বেশকিছু চিরায়ত শুকনো খাবারও পাওয়া যায়। মেলায় ঘুরে নগরবাসী মুড়ি-মুড়কি, মণ্ডা-মিঠাই, কদমা, বাতাসা, চিনির খেলনা, নিমকি, মুরালি, খই প্রভৃতি কিনে নেয়। এসবের ঠোঙা হাতে বাসায় ফেরার মধ্যে বাঙালিত্বের আমেজ পাওয়া যায়। শাঁখারী বাজার, তাঁতিবাজার, চকবাজার, ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী ও বাংলাবাজারে বাংলা নববর্ষ আর হালখাতা উৎসবে রীতিমতো মিষ্টান্ন খাওয়ার ধুম পড়ে। ঢাকাইয়ারা শুধু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই নয়, পয়লা বৈশাখে ঘরে ঘরে মিষ্টমুখ করে আনন্দ পান। অনেকে আত্মীয়ের বাসায় মিষ্টি পাঠিয়ে থাকে পূর্বপুরুষদের রেওয়াজ অনুযায়ী।

www.pathagar.com

☐ ঢাকাই জামদানি

জামদানি একান্তই ঢাকার নিজস্ব কাঁচামালের তৈরি এবং ঢাকার তাঁত শিল্পীদের মৌলিক শিল্পবোধ ও ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি। পৃথিবীর আর কোনো দেশের তাঁতিদের পক্ষে এ শাড়ি তৈরি সম্ভব হয়নি। আদিকাল থেকেই এ গুণী তাঁতিদের ঢাকার কাছে ডেমরা ও রূপগঞ্জ উপজেলার কিছু অঞ্চলে বংশানুক্রমে বসবাস। জামদানি তাঁতিদের অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে শাড়ি তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে অসংখ্যবার। কিন্তু সম্ভব হয়নি। কারণ, এ শাড়ি কেবল একজন তাঁতি বুনে যাবেন, তা নয়; বরং শাড়ি প্রস্তুত হওয়ার প্রতিটি পর্যায়ে চাই পারিবারিক সহযোগিতা, হাতের সুতা কাটা, সেই সুতায় রং দেওয়া, নাটাইয়ে সুতা পেঁচানো, তারপর সেটা মাকু করা। এ ধাপগুলো তো বাড়ির বউঝিয়েরাই করে থাকে। এরপর মাটির গর্তে যে খটাখট তাঁত চালানো চলত, তাতে ওস্তাদের পাশে যে শাগরেদ বসে থাকত, সে তো নিজের পরিবার কিংবা জ্ঞাতি থেকেই আসত। তাই সানার টানে মাকু চালিয়ে যখন জামদানি শাড়ির নকশা ফুটতে শুরু করে, তা শেষ পর্যায়ে গিয়ে আর শাড়ি থাকে না; বরং হয়ে ওঠে তাঁতশিল্পের শিল্পিত ক্যানভাস। শাড়ি শেষ হলে মাড় দিতেও চাই পারিবারিক সহযোগিতা। তা ছাড়া শীতলক্ষ্যার পানি থেকে উঠে আসা বাষ্প সুতার প্রস্তুতি ও কাপড় বোনার জন্য খুব জরুরি। জামদানি শাড়ির মূল আকর্ষণ এর নকশা বা মোটিফে। এ নকশা সাধারণত কাগজে এঁকে নেওয়া হয় না। জামদানি শিল্পীরা নকশা আঁকেন সরাসরি তাঁতে বসানো সুতায় শাড়ির বুননে বুননে। তারা এমনি পারদর্শী যে মন থেকে ভিন্ন ভিন্ন নকশা আঁকেন। পাড়ের নকশায় বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে করলা পাড়। এ ছাড়া আছে ময়ূর প্যাঁচ, কলমিলতা, পুঁইলতা, কচুলতা, গোলাপচর, কাটিহার, কলকা পাড়, কাঠপাড়, আঙুরলতা ইত্যাদি। শাড়ির জমিনে গোলাপফুল, জুঁইফুল, পদ্মফুল, তেছরী, কলার ফানা, আদার ফানা, সাগুদানা, মালা ইত্যাদি নকশা বোনা হয়।

☐ জাতীয় স্মৃতিসৌধ

প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত ও কোলাহলমুক্ত দর্শনীয় স্থানের মধ্যে ঢাকা বিভাগের সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা-আরিচা হাইওয়ের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় নবীনগরে পৌঁছে হাতের বাঁ দিকে তাকালেই সহজেই নজরে পড়ে লাল সিরামিক ইটের বিশাল চত্বর। সবুজ গাছ-পালা, সুন্দর ফুলের বাগান, পানিতে পরিপূর্ণ লেক ও ফোয়ারা সব মিলিয়ে আকর্ষণ করে দৃষ্টিকে। লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে এই স্মৃতিসৌধ বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। স্মৃতিসৌধের পাশ

www.pathagar.com

ায় স্মৃতিসৌধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবার

ল্প পাড়ায়

শিল্পের জন্য এখনো বিখ্যাত হয়ে আছে
ক সাভার পেরুলেই ধামরাই। সেখান থেকে
চোখে পড়বে ঐতিহ্যবাহী তামা-কাঁসার
নগুলো 'টুং-টাং' শব্দে মুখরিত থাকত
রেখেছে কয়েক শ বছরের পুরোনো এই

বদনা, কলস-গ্লাস ঘণ্টাসহ নানা রকম
দোকানগুলোয় সেই পুরোনো আদল বজায়
াদের কাছে জানা যায় তৈরি পদ্ধতি, তার
কাদা-ছাঁচ পদ্ধতিতে। এখানে প্রথমে ছাঁচটি
রি, ছাঁচ পোড়ানো, গলিত ধাতব সেই ছাঁচে
ক্রিয়া। ভাগ্য ভালো হলে কোনো দর্শনার্থী
পারেন। তামা-কাঁসার দোকানের অদূরেই
একটি বাড়ি। ধামরাই মেটাল ক্রাফটের
এই বাড়ির ভেতর। এখানে তামা-কাঁসার

www.pathagar.com

ধামরাই কাঁসা পল্লীতে লেখক

উপকরণ তৈরি হয় মোম-ছাঁচ পদ্ধতিতে। এখানকার উপকরণের বেশিরভাগই দেব-দেবীর মূর্তি আর বিলাসসামগ্রী। মোম-ছাঁচ পদ্ধতিতে একটি ছাঁচে একটি উপকরণ তৈরি করা যায়। তাই প্রতিটি কাজই এক একটি শিল্পকর্ম। এখানকার কম বেশি সকলের ঘর যেন একটি তামা-কাঁসার জাদুঘর। ঘোড়া-হাতির গাড়ি, দাবার ঘুঁটি, হাতি-ঘোড়া, পুতুলসহ ঘর সাজানোর নানা টুকিটাকিতে ঠাসা সেইসব ঘর। ঐতিহ্যবাহী তৈজসপত্রও আছে তাদের সংগ্রহে। এসবই রাখা হয়েছে বিক্রির জন্য। এখানকার দোকানেও তামা-কাঁসার উপকরণে ঠাসা।

মোম-ছাঁচ ও কাদা-ছাঁচ পদ্ধতি ছাড়াও আরও একটি পদ্ধতিতে তামা-কাঁসার থালা-বাটি তৈরি হয় ধামরাইয়ে। কাঁসাখণ্ড আগুনে পুড়িয়ে লাল করে পাঁচ-হয়জন মিলে পিটিয়ে তৈরি করেন থালা-বাটি আর ঘণ্টা। এই কর্ম দেখতে চাইলে যেতে হবে ধামরাইয়ের রথখোলা থেকে এক ঘণ্টার পথ দূরে শিমুলী বাজারে। এ এলাকায় কয়েকটি ঘরে এই কাজ করা হয়। ধামরাইয়ে তামা-কাঁসা ছাড়াও মৃৎশিল্পের কর্মযজ্ঞ দেখার সুযোগ আছে। বিশাল এক পালপাড়া আছে ধামরাই এলাকায়। ৬০টিরও বেশি পরিবার মাটির তৈজসপত্র তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকে প্রতিদিন। ধামরাইয়ের রথখোলা থেকে পালপাড়া যেতে রিকশা ভাড়া লাগে দশ টাকা। এখানকার পালদের এখন প্রধান ব্যবসা হচ্ছে ফুলদানি তৈরি। তবে অনেকের বাড়িতে তৈরি হয় কবুতর, পুতুলসহ নানা রকম খেলনা। পালপাড়া থেকে মৃৎশিল্পের নানা উপকরণ কেনা যাবে।

□ রায়েরবাজার পালপাড়ায়

রায়েরবাজারের একটি বাড়ির নাম মৃৎরাজ। এ বাড়ির মালিক এখনো পূর্বপুরুষদের বৃত্তি মাটির জিনিসপত্র তৈরির কাজ করছেন। নিজ বাড়িতে গড়ে তুলেছেন দেশের একমাত্র পটারি স্টুডিও। সে স্টুডিওতে তাঁর তৈরি নকশা করা মৃৎশিল্পের অনেক নমুনা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে সে বাড়িতে ছোট

www.pathagar.com

ছেলেমেয়েদের মাটির পণ্য তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। প্রতিদিন দর্শনার্থী ও বিদেশি পর্যটকরা পটারি স্টুডিও দেখতে যাচ্ছেন। হাজার বছরের পুরোনো ঐতিহ্য দেখে তাঁরা মুগ্ধ হচ্ছেন। উক্ত স্টুডিওর পাশেই আছে খ্যাতনামা আরেক মৃৎশিল্পীর বাড়ি। তাঁর পুরো বাড়িটিই মৃৎশিল্পের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে তিনি হুইল ঘুরিয়ে নিজ হাতে মাটির নানা জিনিস বানাচ্ছেন। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় মৃৎশিল্পের প্রসারে তিনি বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন।

বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী রায়েরবাজারের একমাত্র মুসলমান কুমার মোহাম্মদ আলীর তৈরি মৃৎপণ্য বেশ নাম করেছে। ১৯৬৫ সালে কুমিল্লা থেকে রায়েরবাজার এসে কাজ শিখে মাটির জিনিসপত্র তৈরি করছেন তিনি। আমৃত্যু এ কাজ করতে চান। রায়েরবাজারে পুতুল ও সরা বানিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন পরিতোষ পালও। ঐতিহাসিক কুমারপল্লী রায়েরবাজার সম্পর্কে জানতে হলে নগরবাসীকে সেখানে যেতে হবে। একসময় সেখানে সাড়ে সাত শ ঘর কুমার থাকলেও বর্তমানে অনেক কমে গেছে। তবে অনেক খ্যাতনামা কুমার যুগ যুগ ধরে বাঙালি সংস্কৃতির অংশ হিসেবে মৃৎশিল্পের এ পেশা বুকে আঁকড়ে ধরে আছেন। টালির ঘর, কাঁচা রাস্তা আর মাটিভর্তি গরুর গাড়ির আনাগোনা চোখে না পড়লেও কুমারদের জীবনব্যবস্থা যেকোনো মানুষকে আকর্ষণ করবে। সবচেয়ে বড় পাওয়া হবে, কুমার পাড়া ঘুরে তাদের তৈরি মাটির নানা পণ্য কেনা।

এখানকার শিল্পীরা শুধু নিজেদের পছন্দমতো মৃৎপাত্র তৈরি করেন না। তাঁরা যেকোনো নকশার পণ্য বানিয়ে সরবরাহ করে থাকেন। তাই কেউ ইচ্ছা করলে পালদের বাড়িতে বসে নিজেদের পছন্দমতো পণ্য তৈরি করাতে পারেন। রায়েরবাজারের কুমারপল্লী গড়ে ওঠার পেছনে ছোট একটি ইতিহাস রয়েছে। রাজা বিনোদ রায় মুর্শিদাবাদ ও রাজমহল থেকে লাখেরাজ জমি দিয়ে পালদের রায়েরবাজারে নিয়ে আসেন। বিনোদ রায়ের নাম থেকে এলাকার নাম হয় রায়েরবাজার।

☐ ঢাকার রমনা পার্ক

ঢাকার ঠিক মধ্যভাগে নগরের অক্সিজেন সরবরাহকারী হিসেবে নীরবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে রমনা পার্ক। নানা প্রজাতির গাছ, কৃত্রিম হ্রদ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে পার্কটি নগরবাসীর এক প্রিয় ঠিকানা। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬১০ সালে বাংলার সুবেদার ইসলাম খাঁর হাত ধরে যাত্রা শুরু হয় রমনা পার্কের। তখন রমনা পার্কের বর্তমান এলাকাটি ছিল ঢাকা নগরের উত্তরাংশ। এখানে নতুন আবাসিক এলাকা গড়ে তোলার জন্য ইমারত, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি গড়ে তোলা হয়। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর রমনা এলাকাটি তার জৌলুস হারিয়ে পরিত্যক্ত জঙ্গলে পরিণত হয়। তবে ১৮২৫ সালে ব্রিটিশ কালেক্টর ডাউইজের সময় ঢাকা নগর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন

www.pathagar.com

পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, যার অন্যতম ছিল রমনা এলাকার উন্নয়ন। এ সময় এলাকার একটি অংশ ঘেরাও করে ঘোড়দৌড় বা রেসকোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর অন্য অংশটি রমনা গ্রিন নাম দিয়ে যাত্রা শুরু করে। ১৯০৮ সাল থেকে পার্কের দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে যা চলে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত। এ সময় ঢাকার নবাব পরিবার এখানে একটি রাজকীয় বাগান তৈরি করেন, যার নাম দেওয়া হয় 'শাহবাগ'। এ সময় একটি চিড়িয়াখানাও গড়ে তোলেন ঢাকার নবাবরা। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে রমনা পার্ক উদ্বোধন করা হয় ১৯৪৯ সালে। তখন পার্কের আয়তন ছিল প্রায় ৮৯ একর। ৭১ প্রজাতির বৃক্ষের সমারোহে রমনা ছিল এক সবুজ অরণ্য। আর এরই মাঝে আয়োজন করা হতো মেলা, প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১৯৫২ সাল থেকে সরকারিভাবে বাগানটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং স্থাপনার জন্য কিছু কিছু এলাকা ছেড়ে দেওয়ার কারণে বর্তমানে প্রায় ৬৯ একর এলাকা নিয়ে পার্কটি অবস্থিত। এর মধ্যে কৃত্রিম হ্রদ রয়েছে প্রায় ৯ একর জুড়ে। বর্তমানে ৭১ প্রজাতির ফুল জাতীয় গাছ, ৩৬ প্রজাতির ফলদ গাছ, ৩৩ প্রজাতির ঔষধি গাছ, ৪১ প্রজাতির বনজ গাছ এবং ১৯ প্রজাতির অন্যান্য গাছ নিয়ে রমনা পার্ক ঢাকাবাসীর একটি প্রিয় গন্তব্য স্থান। আর ছুটির দিনগুলোয় রাজধানীবাসীর নানারকম বন্ধুত্বের মিলন ঘটে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘেরা রমনা পার্কে। তখন রমনা পার্ক হয়ে ওঠে সাত রঙে রঙিন।

□ বুলবুলি

বাঙালি জাতির জীবনে এ যাবৎ যতগুলো অত্যাচারের চিহ্ন পড়েছে তার মধ্যে বর্গীদের অত্যাচার অত্যন্ত গভীর এবং মর্মবিদারক। ১৭৪২-১৭৫২ সালের মধ্যে বর্গীদের হামলায় বাংলার ধন সম্পদ শূন্য হয়ে যায়। বাংলার সাহসী বীর নবাব আলিবর্দী খান পর পর কয়েকটি যুদ্ধের পর .... ১ বার কৌশল করে বাংলার দুশমন ২৩ জন বর্গী লিডারকে তরবারি দিয়ে খতম করেন। নবাব আলিবর্দী খাঁর আমলে বাঙালি মা বর্গীদের আক্রমণের ভয় দেখিয়ে তার শিশুকে ঘুম পাড়াতেন। যার প্রচলন আজও গ্রামবাংলায় আছে। আর শিশু বর্গীদের কাল্পনিক আক্রমণের কথা শুনে কান্না থামিয়ে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে : "ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে? ধান ফুরালো পান ফুরালো খাজনার উপায় কি? আর কটা দিন সবুর করো রসুন বুনেছি।"

কিন্তু এ গল্পকথা সেকেলে, সে তো নবাব আলিবর্দী আমলের। সেই যুগ, এই যুগ, প্রতিযুগেই কি শহর, কি গ্রাম- সবখানেই বাড়িঘরের আশপাশের গাছপালায় পাখিটিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। ঢাকা শহরে এখনো বেশ ভালো সংখ্যায়ই এরা টিকে আছে বুলবুলি। একে ইংরেজিতে বলে রেড-ভেন্টেড বুলবুল, বাংলায় কেবল বুলবুলি বলে। এর লেজের নিচে লাল একটি জায়গা বিপুলসংখ্যায় দেখা যায়। সেটি হলো সিপাহি বুলবুলি। এর মাথার টোপরটা

www.pathagar.com

বেশি দর্শনীয়। বাংলাদেশে আরও গোটা তিনেক বুলবুলি দেখা যায়। সচরাচর আমরা যে বুলবুলিটি দেখি, সেই পাখিটির গায়ের রং বাদামি। পিঠ ও বুক বাদামি। পালকের অগ্রভাগ সাদাটে ধূসর। এই হালকা সাদার কারণে পাখিটির পিঠে ও বুকে অনেকটা মাছের আঁশের মতো দাগ তৈরি হয়েছে। মাথার রং প্রায় কালচে। মাথায় ছোটখাটো মুকুট রয়েছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয় পাখি দেখতে প্রায় একই রকম। এরা সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় কিংবা ছোট ছোট দলে থাকে। পোকামাকড়, ফল, ফুলের মধু এদের প্রধান খাবার। এর মধ্যে পাকুড়, ডুমুর, বট জাতীয় ফলই এদের প্রধান খাবার। অন্য ফলে ভাগ বসানোর সাধ্য ওদের নেই। কখনো কখনো মানুষের ফেলে দেওয়া খাবারও খেতে দেখা যায়। তবে পাখিটি মূলত মাঝামাঝি উচ্চতার বৃক্ষচারী। ছোটখাটো ঝোপেও বসতে দেখা যায়। ঢাকা শহর যত বেশি বৃক্ষশূন্য হচ্ছে, এদের সংখ্যাও তত কমছে। সিপাহি বুলবুলিও (Redwhiskered Bulbul) ঢাকা শহরের কোথাও কোথাও মাঝে মধ্যে দেখা যায়। এদের দেখতে সাধারণ বুলবুলির চেয়ে কিছুটা ছোট মনে হবে। এদেরও গায়ের রং বাদামি। তবে মাথার উপর বেশ বড়সড় একটি মুকুট রয়েছে, যা দেখে সহজেই এদের শনাক্ত করা যায়। চোখের নিচটায় বা গালে রয়েচে লাল রং। এটিও শনাক্ত করার জন্য সহায়ক। এ ছাড়া পাখিটির ঠোঁট থেকে বুক পর্যন্ত সাদা। খাবার গ্রহণ ও আচরণে এরা সাধারণ বুলবুলির মতোই। সংরক্ষণের কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হলে ঢাকা শহরেও এরা টিকে থাকতে পারবে। বিশেষ করে, রমনা পার্ক ও বোটানিক্যাল গার্ডেনসহ ছোট বাগানগুলোতে এদের খাওয়ার উপযোগী গাছের সংখ্যা বাড়ানো হলে এবং কিছু পরিমাণে নিরাপত্তা দেওয়া হলে ঢাকা শহরকে এরা বড্ড বেশি আপন করে নিবে।

☐ পাখিপ্রেমী নারী

রাহেলা বেগম নন্দীপাড়ায় মেসে রান্না করেন। রান্নার কাজ করে অল্প কিছু পান। এই টাকায় পাখিদের খাবার কিনে খাওয়ান। তিনি রান্নার কাজ করে বাসায় ফিরে পাখিদের খেতে দেন। আধা কেজি চাল শিকায় ঝোলা সানকিতে দেন। চারপাশ থেকে শ'খানেক চড়ুই পাখি উড়ে এসে সেগুলো খেয়ে যায়। চড়ুই পাখি খুব ভোরে খাবার খেতে আসে। তারা সাধারণত তিন বেলা খাবার খায়। তিনি বলেন আমাকে দেখলেই পাখিদের ডাকাডাকি, উড়াউড়ি শুরু হয়। আমি ঘরে ঘুমাই, সে ঘরের জানালার পাশে সকাল থেকেই চড়ুই পাখিরা বসে থাকে লাইন ধরে।

তিনি বাসার বারান্দার এক পাশে ঝুলিয়ে দিয়েছেন চালের সানকি; অপর পাশে কলা, পাকা পেয়ারা, কামরাঙা, পেঁপে ঝুলিয়ে দেন। এসব ফল খেতে আসে বুলবুলি, শালিক। রাহেলা বেগম জানান, চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় পাখিদের ঠিকমতো খাবার দিতে পারছেন না। প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৫০ টি চড়ুই পাখির জন্য কম হলেও দেড় কেজি চাল দরকার।

www.pathagar.com

শাহজাহানপুর মাঠে ফকিরেরা যেখানে ভিক্ষার চাল বিক্রি করে সেখান থেকে কম মূল্যে চাল কিনে আনেন। প্রতিদিন পাঁচ-ছয়টা বিচিকলা বা পাকা পেয়ারা লাগে। ফলের জন্য প্রতিদিন অন্তত ২০ টাকা করে লাগে বলে রাহেলা বেগম জানান। রাহেলা বেগম বড় ছেলের সঙ্গে নন্দীপাড়া থাকেন। তিনি বলেন, 'ছোটকাল থেকেই পইক-পাখি আমার খুব ভালো লাগে। আমার দুই ছেলে তরকারি বিক্রি করে। পাখি নিয়ে আমার এই পাগলামির জন্য তারা কিছু বলে না, উল্টো পাখির জন্য খাবার নিয়ে আসে। আমি কোনো পাখি বন্দি করে রাখি না। পাখিরা নিজের মতো আসে, খেয়ে আবার উড়ে যায়।' রাহেলা বেগমের দেশের বাড়ি ছিল সন্দ্বীপে। নদী তিনবার তাঁদের ঘরবাড়ি ভেঙে নিয়ে গেছে। একসময় স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে পালিয়ে যায়। রাহেলা বেগম বলেন, 'মানুষের ঘরের বারান্দায় বস্তিতে থেকে দুই পোলারে বড় করছি। হেই যে মানুষের ঘরের বারান্দায় রইছি, হিয়ানে ভাড়া দিচ্ছি। তখন থেকেই পইক-পাখিরা আমার লগে আছিল, অহনও আছে। মানুষ যত খারাপ হতে পারে, পাখিরা ততটা খারাপ হয় না।'

☐ ঢাকায় ওড়ে কত পাখি

সেই আদিকাল থেকেই ঢাকায় সংখ্যার দিক থেকে পাখিদের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করে আছে আবাবিল। ইংরেজি নাম হাউস সুইফট, আদর করে অনেকে তাদের বাতাসি পাখি বলে ডাকে। এবার নিশ্চয়ই আপনার মনে বিশাল এক প্রশ্ন - ওই পাখি কোথায় থাকে, দেখি না যে। পাখি দেখতে হয় খোলা চোখ দিয়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে, আমাদের নাগরিক জীবনের রিকশা, সিএনজি আর টেলিভিশন দেখে বেড়ানোর চোখ দিয়ে নয়। এখনই বাসার ছাদে গিয়ে তাকান না একটু আকাশের দিকে। দেখুন বাতাস গায়ে মেখে ছোটখাটো হালকা-পাতলা গড়নের বাতাসি পাখি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার ওপর হয়তো বিশাল ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে তুখোড় শিকারি বাজ তুরমতী। আরও স্পষ্ট করে দেখতে চাইলে কিনে আনুন একটা দুরবিন। নিজে দেখে সেটা দিন আপনার শিশুর চোখে। বেরিয়ে পড়ুন না তাদের নিয়ে।

ঢাকায় পাখি নেই, শেষ হয়ে গেল বলে যারা হা-হুতাশ করে তাদের অনেকেরই চোখটা আসলে বন্ধ। কারণ ঢাকা শুধু মানুষেরই রাজধানী নয়, পাখিদেরও রাজধানী। মানুষের মতোই পাখিদেরও কেউ এখানে আসে বসবাসের জন্য, কেউ দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, কেউ রাত্রিকালীন আবাসনের জন্য কেউবা স্রেফ যাত্রাকালীন বিরতির জন্য কারও বা স্থায়ী বসবাসই এই ঢাকা শহরে। আর পুরো ঢাকায় রয়েছে প্রায় ২১৯ প্রজাতির পাখি। একটু চোখ মেলে তাকালেই তাদের ডানার ঝাপটা এসে লাগবে আপনার গায়ে।' কথাগুলো বিশ্বাস না হলে গোধূলিলগ্নে আপনার বাচ্চাকে নিয়ে চলে যান না ডেমরা মাতুয়াইল এলাকায়। জায়গাটা একটু দূর মনে হলে খোলা চোখে তাকান কমলাপুর অথবা মতিঝিল এলাকার আকাশে। সব পাখি ঘরে ফেরার

www.pathagar.com

মতো ফিরে আসে এই এলাকায়। সেই সাত সকালে তারা বেরিয়ে পড়েছিল খাবারের সন্ধানে ঢাকা এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। রাত একটু বাড়তে থাকলে ওই এলাকাতেই ল্যাম্পপোস্ট অথবা দালানের কার্নিশে দেখা মিলবে ইঁদুর শিকারে ব্যস্ত লক্ষ্মীপেঁচার দল। মতিঝিল দিলকুশা এলাকার অফিস-আদালতের ফাঁকে যে ইঁদুরগুলোর বসবাস তারা রাতের আঁধারে একটু ছাদ ভ্রমণে বের হলেই পরিণত হয় লক্ষ্মীপেঁচার শিকারে।

ছুটির দিনের সকালে বাচ্চার গলায় ঝুলিয়ে দিন একটা দুরবিন। ক্যামেরাটাও সঙ্গে রাখতে পারেন। নিঃশব্দ পায়ে চলে যান বাসাবোর রাজারবাগ কালী মন্দিরের ঐতিহাসিক গঙ্গাসাগর দিঘি এবং লাগোয়া দক্ষিণগাঁও জেলে গ্রামে। সেখানে নেচে নেচে, গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হলদে বউ, মৌটুসি, টুনটুনি, ফুটফুটি, ছোট সাদা বক, কাঠশালিক, হুকো, সুইচোরা, নিশিবক, কাঠঠোকরা, ঝুঁটিশালিক, কোকিল, টিয়া, দোয়েলসহ রংবেরঙের পাখি।

ঘুরে আসতে পারেন কমলাপুর রেলস্টেশনের পূর্ব দিকের মেহগনি বাগান, রমনা পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা এলাকা, মিরপুর সিরামিক, শিশু একাডেমি চত্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, নতুন বিমানবন্দর, খিলগাঁও তালতলা মার্কেটের পেছনের ঝিল। ঘরের পাশে ঘুরঘুর করা পাখি ছাড়াও আরও নানা রকমের পাখি পাবেন সেখানে। পুরো বাংলাদেশের মধ্যে পাখিগুলোর সবচেয়ে নিরাপদ এবং নিরুপদ্রব জায়গাটা ঢাকা শহরেই। সেটা বঙ্গভবন। সেখানকার দুটি ছোট পুকুরে দেখা যায় দুই-তিন রকমের মাছরাঙা, আশপাশে বাসা বেঁধে ডিম পাড়ে কমলাবউ। সবুজ ঘুঘুর পাশাপাশি সন্ধ্যা নামতেই সেখানে ভিড় করে হরেক রকম পাখি। শীতকালে নানান জায়গায় পরিযায়ী পাখিদের বেশ আনাগোনা থাকে। ঢাকার পাশেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস পুকুরের লাল শাপলা আর পাখির চমৎকার সহাবস্থান সেখানে। একটু সময় নিয়ে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান আর মুন্সিগঞ্জের পদ্মা নদীতেও দেখা মিলবে দেশি-বিদেশি নানান পাখির। এসব তো গেল আয়োজন করে পাখি দেখার বিষয়। এবার একটু আমাদের ঘরের পাশের পাখি নিয়ে কথা বলি। আপনি কি জানেন, আপনার বারান্দায় যে দুটি ফুলের গাছ আর বাসার ছাদে যে গাছ সেখানে প্রতিদিন কারা হানা দেয়? খেয়াল করেননি কখনো? ওখানে কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই পোকামাকড় আর ফুলের মধুর লোভে আসে টুনটুনি, বুলবুলি, মৌটুসি, নীল টুনি, চড়ুইসহ আরও অনেক পাখি। আজ থেকে আপনার বাচ্চাকে নিয়ে একটু গোয়েন্দার দৃষ্টি রাখুন না এগুলোর ওপর। দেখবেন, পাখিগুলো কী সুন্দর নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, ওড়ার সময় আওয়াজ হচ্ছে- ফুড়ুৎ, ফুড়ুৎ। বাসার বারান্দায় যদি চালজাতীয় একটু খাবার কৌটায় করে ঝুলিয়ে দেন দেখবেন চড়ুই আপনার আতিথ্য গ্রহণে মোটেও দেরি করবে না। বাসার সামনের ভাঙা ল্যাম্পপোস্টটার দিকে ভালো করে তাকিয়েছেন কখনো? ওখানেই কিন্তু বাসা বেঁধেছে ঝুঁটিশালিক। রাতে সেখান থেকেই অদ্ভুত

www.pathagar.com

চোখে তাকিয়ে থাকে পেঁচা। বাড়ির পেছনের ড্রেনটায় তাকান। ওখানে অবশ্যই একটা দোয়েল বসে শিস দিচ্ছে। আর আপনার পায়ের আওয়াজ পেয়ে কার্নিশ থেকে এইমাত্র উড়াল দিল যে বুনো কবুতর। এই পাখিদের প্রতি ভালোবাসার হাত সম্প্রসারিত করুন। আর আজকের শিশু কিশোর ও তরুণ প্রজন্মকে তা শেখান। তাহলে ঢাকা শহরের মতো এরাও আপনাকে আপন করে নিবে।

□ চিড়িয়াখানা

ঢাকা চিড়িয়াখানার অবস্থান রাজধানীর মিরপুরে। চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করলেই চোখে পড়বে। বানরের খাঁচা। আরেকটু এগুলেই দেখা মিলবে সিংহের। এরপর ভল্লুক, চিতা। উত্তরে রয়েছে লেক এবং তার পাশে সুন্দরবনের বাঘ। কৃত্রিম জলাশয়ে রয়েছে জলহস্তি। দক্ষিণে আছে আরেকটি লেক, তার মাঝে বাবলা দ্বীপ। লেকে আছে হাঁসজাতীয় নানা পাখি। আরও রয়েছে- কানি বক, পানকৌড়ি, কালো শকুন, শঙ্খচিল, মাছরাঙাসহ অনেক পাখি বের হওয়ার পথে চিত্রা হরিণ দেখতে পাবেন। এছাড়া বিলুপ্তপ্রায় অনেক প্রাণীর দেখা মিলবে ঢাকা চিড়িয়াখানায়।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, এনিমেল প্লানেট কিংবা ডিসকভারি টিভি চ্যানেলে যেসব প্রতিবেদন দেখানো হয়, সেগুলোতে আমরা বন্যপ্রাণীর জীবন সম্পর্কে একটা সুন্দর ধারণা পাই। আমাদের চিড়িয়াখানায় প্রাণীদের দেখে যতটা না আনন্দ হয়, তারচেয়ে কষ্ট হয় অনেক বেশি। প্রথমত, চিড়িয়াখানার পরিবেশ। চিড়িয়াখানায় প্রাণীদের যথাযথ জায়গা দেওয়া হয় না। অনেকটা গাদাগাদি করে খোঁয়াড়ের মতো রাখা হয়। আর প্রাণীদের খাবারের মান সম্পর্কে আমার জানা নেই; তবে চেহারা দেখে ওদের বিষণ্ন মনে হয়। পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত খাবারের সংকট নিয়ে নিকট অতীতে দু-একটি প্রতিবেদন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। ওদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে- ওরা কি পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা পায়? আমরা উপরোল্লিখিত টিভি চ্যানেলগুলোতে দেখি, কী অসীম মমতায় প্রাণীদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে, খাবারের ব্যাপারে ওরা কতটা সজাগ! শিশুদের আনন্দ দেওয়ার জন্য আমরা চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাই- ফিরে আসি বিষণ্নতা নিয়ে। দেখি একটি বড় খাঁচার মধ্যে একই প্রজাতির অনেক প্রাণীর হাঁটাচলা। এতে আমাদের শিশুদের মনে শৈশবেই বন্যপ্রাণীর জীবন সম্পর্কে একটি বিরূপ ধারণা হতে পারে। আজকাল অনেক দেশেই 'ন্যাচারাল কনজারভেশন অব ওয়াইল্ড লাইফ' ধারণাটি জোরদার হচ্ছে। 'ইকো ট্যুরিজম' একটি জনপ্রিয় কনসেপ্ট। যেহেতু মানুষ একটি বুদ্ধিমান প্রাণী, যেহেতু মানুষ প্রাণী হত্যা করে এবং তাদের মাংস, হাড়, চামড়া অত্যন্ত লোভাতুর ব্যবসা; সেহেতু এসব হিংস্র মানুষ থেকে আমাদের বিশ্বের অসহায় প্রাণীদের বাঁচাতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের শিশুদের ধারণা দিতে হবে, প্রাণীরা হিংস্র-অহিংস্র যা-ই হোক না কেন - আমাদের বিশ্বপরিবারের অংশ। গাছ যেমন একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস,

www.pathagar.com

বন সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার; তেমনিভাবে বন্যপ্রাণীও প্রকৃতির অংশ- বিশ্বপরিবারের অংশ। আমরা পর্যাপ্ত বনভূমি ও স্থানীয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা ছাড়া পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারব না। গাছপালা সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সম্পর্কে ধারণা, বৃক্ষ চেনাজানা শিক্ষার বড় অংশ। যে শিশুটি তার নিজস্ব ভূখণ্ডের জীবজগৎ, পাখি, গাছপালা নিজের চোখে দেখতে পেল না, সে পৃথিবী সম্পর্কে জানবে কী করে! আর প্রকৃতিকে ভালোবাসতে না জানলে মানুষের মধ্যে সৌহার্দ জন্ম নেয় না- মানুষের মধ্যে অপূর্ণতা, সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়; লোভ, কাম, ক্রোধে পরিপূর্ণ মানুষ নামের জন্তুতে পরিণত হয়; মানুষকে স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক হতে হয়- কোনো ধরনের শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যার ঘাটতি পূরণ হওয়ার নয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, অতিবৃষ্টি, অতি বন্যা, অতিখরা ইত্যাদির কারণে আজ মানুষ বুঝে গেছে- বনভূমি সংরক্ষণ দরকার, সীমিত করা দরকার প্রকৃতিবিরূপ সামগ্রীর ব্যবহার (যেমন, পলিথিন); সেই সঙ্গে দরকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।

আমাদের সন্তানেরা বড় হোক আলো-বাতাসপূর্ণ মঙ্গলময় প্রকৃতির মাঝে, যেখানে সে প্রকৃতি থেকে শিখবে। বৃক্ষ, বন্যপ্রাণী, মানুষ- সবার প্রতি ভালোবাসা তৈরি হবে। একটি অনাবৃত জগতের মধ্যে যেন সে বেড়ে ওঠে মুক্ত পরিবেশে। সাধারণত চিড়িয়াখানাকে পশুপাখি চেনার জায়গা বলে মনে করা হয়। বোটানিক্যাল গার্ডেন যেমন গাছের জগৎ। তবে আমাদের চিড়িয়াখানাগুলোতে ঢুকলে মনে হয়, বন্যপ্রাণীরা বিকট দুর্গন্ধযুক্ত হিংস্র প্রাণী, যা থেকে শত হাত দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ তথাকথিত চিড়িয়াখানা নামক খোঁয়াড় নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনার সময় এসেছে। আমরা কি এমন ইকো পার্ক গড়তে পারি না, যেখানে স্থানীয় বন্যপ্রাণী, বৃক্ষ ও ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি! সেটা করতে হলে অবশ্যই অনেক বড় জায়গা প্রয়োজন। যেখানে প্রত্যেক প্রজাতির প্রাণীর জন্য থাকবে পর্যাপ্ত জমি, যাতে তারা অনুকূল বৃক্ষ, জলাভূমি, ভূপ্রকৃতি পেতে পারে। আর দর্শনার্থীরা নিরাপদ রাস্তা দিয়ে ওই বিশেষ প্রজাতি ও তার পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

☐ টমটম

ঢাকার রাজপথে ঐতিহ্যবাহী ঘোড়ার গাড়ি বা টমটম। চার চাকার এই গাড়ি এখন চলছে দুই চাকায় ভর করে। আর দুই ঘোড়ার জায়গায় গাড়ি টানছে একটিমাত্র ঘোড়া। ঢাকা শহরের বেড়ানোর জায়গাগুলোয় দিনে দিনে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এক ঘোড়ার এই এক্কা গাড়ি।

ঘোড়ার গাড়ি নগরীতে চলছে দেড় শ বছরেরও বেশি সময় ধরে। ১৮৫৬ সালে আর্মেনীয়রা ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন করে ঢাকা শহরে। দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এই বাহনটি। সে সময়ে ঘোড়ার গাড়িতে যাত্রীদের বসার জায়গাটা ছিল খোলামেলা। তবে এক সময়কার দরকারি এই গাড়ির চাহিদা আর আগের মতো

www.pathagar.com

নেই। দ্রুতগামী যান্ত্রিক যানের যুগে ঘোড়ার গাড়ি এখন ঐতিহ্যপ্রেমীদের বিনোদন বহনে পরিণত হয়েছে। ঐতিহ্যপ্রেমী আর শৌখিন যাত্রীদের জন্যই গুলিস্তান-সদরঘাট রুটে এখনো টিকে আছে কিছুসংখ্যক ঘোড়ার গাড়ি। এ ছাড়া বিয়ে শোভাযাত্রার মতো অনুষ্ঠানেও অনেকে ভাড়া করেন এই বাহন। বিনোদনপিয়াসীদের জন্যই কয়েকজন গাড়োয়ান দুই চাকার ঘোড়ার গাড়ি নামিয়েছেন নগরীর সড়কে। এক ঘোড়াচালিত এসব যান শুধু ভ্রমণপিয়াসীদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। নাটোর, পাবনা, বগুড়ায় এই গাড়ি আছে অনেক বছর ধরে। সম্প্রতি ঢাকায় তৈরি হয়েছে তিনটি গাড়ি। উত্তরা, বনশ্রী, ধানমণ্ডি আর টিএসসি এলাকায় এই গাড়িগুলো চলাচল করছে। গুলশান-বনানী এলাকায়ও দেশি-বিদেশি লোকদের নিয়ে ঘোরাফেরা করে গাড়িগুলো গাড়ি যেমন সুদৃশ্য, তেমনি ঘোড়াও বেশ নাদুসনুদুস। তাজা ঘোড়া আর চমৎকার গাড়ি দেখে ভ্রমণপিয়াসীরা আগ্রহের সঙ্গে ওঠে গাড়িতে। গাড়ি যখন চলা শুরু করে তখন ঘোড়ার গলায় বাঁধা ঘণ্টা আর খুরের আওয়াজে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে।

□ বইল গাড়ি

মালামাল বহনের গরুর গাড়িকে ঢাকাইয়ারা বলে 'বইল গাড়ি'। মানুষ সমান উঁচু হরিয়ানার মোটাতাজা দুটি গরু দিয়ে এ গাড়ি টানা হয়। গাড়িগুলো সোয়ারীঘাট থেকে ডাল নিয়ে আসে ইমামগঞ্জের ডাল পট্টিতে। শুধু ডাল টানে, এমন বইল গাড়ি আছে ৫০টির মতো। মাল নামিয়ে আবার চলে যায় সোয়ারীঘাটে। সোয়ারীঘাট থেকে মালামাল বোঝাই করে যখন বইল গাড়ি এগিয়ে আসে, তখন গরুর বিশাল শিং দেখে লোকজন পথ খালি করে দেয়।

বইল গাড়ির মালিকেরা বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে থাকেন। সারা দিন মালামাল আনা-নেওয়া করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যান। সকালে এসে আবার শুরু হয় মালামাল টানার কাজ। বইল গাড়ির মালিকেরা সবাই তাঁদের গরুর যত্ন নেন। পরিবারের সদস্যদের মতোই। গরুর মোটাতাজা স্বাস্থ্য দেখেই বোঝা যায়, এদের খাইয়ে-দাইয়ে ভালোই রাখা হয়েছে। কিন্তু বইল গাড়ির আগের দিন নেই বলে জানালেন অনেক চালক।

□ বাংলার তাজমহল

ভারতের বিশ্বখ্যাত তাজমহলের অনুকরণে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলার তাজমহল নির্মাণ করা হয়েছে। দিগন্ত বিস্তৃত অনাবিল সবুজের সমারোহ, নাম না জানা পাখির কিচিরমিচির তাজমহলে আসা দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে। ঐতিহ্য এবং প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটক বাংলার তাজমহল দেখে আসতে পারেন। সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য তাজমহলের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে ১৭২ টি কৃত্রিম ডায়মন্ড। এগুলো বেলজিয়াম থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। তাজমহলে প্রবেশের আগে অপূর্ব ১০ টি ঝরনা রয়েছে। ঢাকা থেকে মাত্র ২৫ কিমি দূরত্বে নারায়ণগঞ্জে এর অবস্থান।

www.pathagar.com

☐ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর

সোনারগাঁও একটি অতি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক জনপদ। এর প্রাচীন নাম সুবর্ণ গ্রাম। মোগল আমলের বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ঈশা খাঁর রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। সোনারগাঁও থেকে রাজধানী স্থানান্তর হলেও আজও সেখানে সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় প্রাচীন নিদর্শন এবং ইংরেজদের সময়ে তৈরি অসংখ্য ইমারত। এখানেই লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের মূল আকর্ষণ লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর। জাদুঘরে প্রায় চার হাজার তিনশ নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। গ্যালারিতে আছে কাঠ খোদাই কারুশিল্প, বাংলার গ্রামীণ জীবনযাত্রার চিত্র, পটচিত্র, দেশের বিভিন্ন এলাকার নৌকা, বাদ্যযন্ত্র, বাংলার পোড়ামাটির শিল্প, তামা-কাঁসা-পিতলের তৈজসপত্র, লোকজ অলঙ্কার, বাঁশ, বেত ও শীতল পাটি। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এটি খোলা থাকে। বুধ ও বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক বন্ধ।

☐ ঢাকার বসন্তে ফুলের বাহার

পাখিফুল: পাখিফুল নাম হলেও পাখির সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্য নেই। পুরোপুরি ফোটার পর ফুলটি বলের মতো দেখায়। বসন্তের শুরুতে গাছ গোটা গোটা গোলাপি রঙের কলিতে ভরে যায়। গোলাকার কলি থেকে একেকটি ফুল ফুটে বলের আকার ধারণ করে। বলের মতো যে ফুলটি দেখা যায়, এটি আসলে অনেক ফুলের সমাহার। ফুলের রং টকটকে লাল। ফুটন্ত ফুলে মৌমাছি লুটোপুটি খায়, আসে ভ্রমরের দল। অপূর্ব সুন্দর এই ফুলটির কোনো গন্ধ নেই। সবুজ পাতার মাঝে গোলাকার এই ফুলটি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার লাল বৃত্তের মতো দেখায়। ফুলটি যখন সম্পূর্ণ ফোটে, চোখ ফেরানো যায় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের কাছে বড় একটি গাছ ফুলে ভরে থাকে। কার্জন হল বাগান, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বলধা গার্ডেন ও রমনা পার্কের গাছগুলোয় ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকে পাখি ফুল।

লাল ঝুমকোলতা : নীল ঝুমকোলতা এখন সহজলভ্য। নগরে দেখা মেলে সাদাটে ঝুমকোলতারও। টকটকে লাল পাপড়ির মধ্যে সাদা-খয়েরি রং, এর ওপর অ্যান্টেনার মতো কেশর ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে 'লাল ঝুমকোলতা' ফুলটিকে। মিরপুর জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে এর দেখা মেলে।

পালান : রমনা পার্কের তরুণ গাছটিতে কয়েক বছর ধরে ফুল ফুটেছে। পাতাহীন গাছটি হালকা সবুজ পাতায় ভরে উঠেছে দিন কয়েক আগে। এখন ডালের শীর্ষে ফুল ফুটেছে। দেখতে গাবের ফুলের মতো, তবে রং কালচে লাল। ফুলের গন্ধে মাদকতা আছে। মিরপুরের জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানেও দেখা যায় পালান।

কর্ডিয়া : কর্ডিয়া ফুল আকর্ষণীয়। সুন্দর এই ফুলটি নগরে দুর্লভ নয়। গাঢ় সবুজ পাতার মাঝে সিঁদুরলাল ফুল দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গাছে সারা বছর ফুল থাকলেও বসন্তে ফোটে বেশি। এরই মধ্যে জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্সের সামনে তিনটি গাছ ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকে।

www.pathagar.com

□ ঢাকার বাগিচায় তুলসী

অতি প্রাচীনকাল থেকে তুলসী গাছ নানান রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার হয়ে আসছে। এ গাছটি আগে বন-জঙ্গলে প্রচুর জন্মাতো। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় প্রতি বাড়িতে এখনও তুলসী গাছ আছে। তারা পূজা অর্চনায় তুলসী পাতা ব্যবহার করে থাকে। গাঢ় সবুজ পাতার এ গাছের বেশ কয়েকটি জাত আছে। ইউনানী মতে রাম তুলসী জাতের ব্যবহার বহুল। এ জাতের বোটানিক্যাল নাম ওসিমাম গ্রাটিসিমাম লন। অপর এক জাত আছে যাকে লোকে বাবুই তুলসী বা দুলাল তুলসী বলে থাকে। এর বোটানিক্যাল নাম হচ্ছে ওসিমাম ব্যাসিলিকাম লিন। বন তুলসীর জাতটি সবচেয়ে বেশি দেখা মিলে। এর বোটানিক্যাল নাম হচ্ছে ওসিমাম আমেরিকানাম লিন। কর্পূর তুলসী নামে আরো এক জাতের তুলসী গাছ আছে। এ গাছ থেকে কর্পূর পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বহুকাল আগে থেকে মানুষের ধারণা হলো তুলসী গাছ স্পর্শ পাওয়া বাতাস সংক্রামক ব্যাধিকে দূরে রাখে। তুলসী একটি ব্যাকট্রিয়াল গুল্ম জাতীয় গাছ।

সর্দি-কাশি চিকিৎসায় সুদূর অতীতকাল থেকেই তুলসীর ব্যবহার হয়ে আসছে। বাচ্চাদের সর্দি-কাশি হলে ২ বা ৫ ফোঁটা মধুর সাথে ৫ বা ১০ ফোঁটা তুলসী পাতার রস একত্রে মিশিয়ে খাওয়ালে সেরে যায়। এমনকি এতে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। আগের দিনে জ্বরে আদার সাথে তুলসী পাতার রস সেবন সার্বজনীন ওষুধ ছিল। শিশুদের পেট কামড়ানিও লিভারের রোগ চিকিৎসায় বৈদ্যগণ তুলসী পাতার রস ব্যবহার করতেন।

অকালে যাদের শরীর ও মন বুড়িয়ে যাচ্ছে তারা আধা ইঞ্চি পরিমাণ তুলসী গাছের শিকড় পান পাতার সাথে মিশিয়ে সকাল-বিকাল খেলে নতুন করে উদ্দীপনা ফিরে পাবেন। তুলসী পাতা ও কাঁচা হলুদের রস আখের গুড়ের সাথে মিশিয়ে খেলে আমবাত সেরে যায়। তুলসী পাতার বীজ পানিতে ভিজিয়ে রেখে চিনির সাথে মিশিয়ে খেলে প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়ে থাকে। হাম বসন্তের দাগ মিলাতে তুলসী পাতার রস শরীরে মাখতে হয়। চর্মরোগ চিকিৎসায় তুলসী পাতার ব্যবহার হয়ে থাকে। দাঁদ চিকিৎসায় লবণের সাথে তুলসী পাতা মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়।

তুক্মা বিলেতি তুলসী ও গঙ্গা তুলসী নামেও পরিচিত। এই প্রজাতির আদি বাসভূমি দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলে। তবে বাংলাদেশ ও ভারতের অনেক অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবেই জন্মে আসছে বহু বছর ধরে। আমাদের দেশে অনেক কবিরাজ বাড়ির বাগানে তুকমা গাছ দেখা যায়। সুগন্ধি এক ছোট জাতের বিরুৎ। তিন-চার ফুট উঁচু হতে পারে। পাতা সরল ও বিপরীত। নরম রোমে আবৃত। ফুল ফোটে সাধারণত শরৎ শেষে। ফল হয় শীতকালে। ফুলের পাপড়ি হালকা বেগুনি। পাতা ও বীজ সুগন্ধি। এই প্রজাতি তুলসী পরিবারভুক্ত (Labiatae)। তুক্মার বৈজ্ঞানিক নাম Hyptis suaveolens। আসাম ও বাংলাদেশের বন-জঙ্গলে তুক্মার আরও কয়েকটি ঘনিষ্ঠ প্রজাতির সন্ধান পাওয়া

www.pathagar.com

যায়। এইসব ছোট বর্ষজীবী গাছের পাতা ও ডাল তুলসী গন্ধে সুবাসিত। এরা ঔষধি গুণসম্পন্ন। বিশেষ করে কৃমি দমনে ও পেটের অসুখে বেশ উপকারী। উল্লেখযোগ্য প্রজাতিরা হচ্ছে H. capitata ও Pectinata।

□ অতিথি পাখি

অতিথি পাখিদের অবাধ বিচরণের একটি স্থান হলো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝিল। শীতকালে অজস্র অতিথি পাখির আনাগোনা আর কলকাকলিতে মুখর থাকে এই ঝিল। প্রকৃতিশোভিত বিশ্ববিদ্যালয়টির রেজিস্ট্রার ভবন লাগোয়া পথ ধরে একটু সামনের দিকে অগ্রসর হলেই পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ জানান দেবে যে ঝিলটি সন্নিকটে। ঝিলে পৌঁছাতেই চোখে পড়বে অজস্র শীতের পাখি রোদ পোহাচ্ছে। নানা বর্ণের নানা আকারের শীতের পাখি উড়াউড়ি করছে, দিচ্ছে ডুবসাঁতার। দর্শনার্থীরা চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখে অতিথি পাখিদের কর্মকাণ্ড। একে তো ঝাঁকে ঝাঁকে অতিথি পাখি, তার ওপর শীতল ঝিলের পানিতে ফুটে আছে অসংখ্য লাল শাপলা- দুইয়ে মিলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌন্দর্য যেন বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ।

ট্রান্সপোর্ট চত্বরের কাছাকাছি ঝিলের দুটি অংশকে যুক্ত করা হয়েছে একটি ছোট্ট কালভার্ট দিয়ে। এই কালভার্টের আশপাশে বসে শিক্ষার্থীদের আড্ডা। সকালে ভোরের আলো ফুটতেই ঝিলের যেদিকে রোদ পড়ে, সেখানে গিয়ে ভিড় জমায় অতিথি পাখিরা। রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের অবস্থান বুঝে পাখির দল তাদের নিজস্ব অবস্থানেও আনে পরিবর্তন। ঝিল ঘিরে তাদের কলকাকলির মুখরতা চলতে থাকে সন্ধ্যা অবধি। ঝিলের বুকে প্রস্ফুটিত লাল শাপলা আর অতিথি পাখিদের সুরেলা স্বর- সব মিলিয়ে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ এই ক্যাম্পাস ছেড়ে আসতে চায় না মন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনীভূত হতে থাকলে দল বেঁধে পাখিরা আকাশে উড়াউড়ি করতে থাকে। পাখিদের সারিবদ্ধ উড়াউড়ির দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে সবাই।

□ প্রকৃতির নাচন

ঢাকা বিভাগের সাভার আশুলিয়ায় থাকাকালীন গ্রাম্য প্রকৃতি খুব কাছ থেকে উপভোগ করেছি। আমার মতে টাপুর টুপুর, বৃষ্টির মৌসুমে গ্রামে থাকার মজাই আলাদা। বর্ষায় গ্রামের কদম ফুল গাছে ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটে কদমফুল। বৃষ্টির তালে তালে ব্যাঙের নাচন। ফুলগাছে টুনটুনি পাখির ছোট ছোট বাসা। গেছো ব্যাঙের ১ গাছ থেকে আরেক গাছে দৌঁড় ঝাঁপ বন্ধুরা সব কিছু ১ কথায় মন ভোলোনো দৃশ্য। তাইতো গ্রাম্য গান বৃষ্টির যেন প্রকৃতির প্রাণ।

ঈশান কোণের সেই মেঘমাল্লার ডাকে এখন ঘুম ভেঙেছে ব্যাঙেদের। ওরা এখন একসঙ্গে গাইছে মন ভোলোনো প্রেমের গান। বর্ষা যে ওদের প্রেমের ঋতু।

www.pathagar.com

ডাহুক তাদের কুচকুচে কালো ছানাদের নিয়ে নেমে পড়ে বিল-ঝিলে, ধানক্ষেতের জলে। এখন অনেক খাবার এসব জায়গাতে। গ্রাম্য দূরন্ত ছেলেরা তখন ডাহুকের ছানা ধরতে পানিতে নামে। কিন্তু এই বর্ষায় টুইটম্বর জলে খুব চতুর ও ডুবপটু ছানাদের সঙ্গে ছেলেরা পেরে ওঠে না। অগত্যা ঘরে ফেরে। নীল হয়ে জেগে ওঠে ঢোলকলমি ফুল, ঝাউয়ের সরু পাতায় লেগে থাকে বৃষ্টির কণা।

হাঁসের জলকেলি খেলে এবং গ্রামের উঠানে কাদা চষে বেড়ায় তার চ্যাপ্টা ঠোঁট দিয়ে। আষাঢ়-শ্রাবণের বৃষ্টিভেজা মাঠে হা-ডু-ডু খেলার আনন্দে মেতে ওঠে গাঁয়ের কিশোর। ছোট শিশুরা মেতে ওঠে 'আয় বৃষ্টি ঝেপে, ধান দেব মেপে' এমন সব বর্ষার গান নিয়ে। সেই সঙ্গে থাকে কাগজের নৌকা বানিয়ে বর্ষার জলে নৌকা ভাসানোর আয়োজন। ব্যাঙ গান ধরে। বর্ষার জলে ধুয়েমুছে যায় ধুলোমাখা প্রকৃতি। খুব জোরে একটা নিশ্বাস নেয় মানুষ। কারণ বর্ষা প্রকৃতির বিশুদ্ধ সময়।

☐ ফাগুনের ঢাকা

পয়লা ফাল্গুনের বসন্তের হয় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। ফাল্গুনের রং নিয়ে প্রকৃতি রাঙিয়ে দিতে শুরু করে প্রেমিক প্রেমিকার মনও । বিনিময় হয় ভালোবাসার। বিনিময় হয় আনন্দ ভাগাভাগির। প্রকৃতির আনন্দ আর মানুষের আনন্দ মিলেমিশে হয় একাকার। এই দিন আনন্দ পালনে উৎসবের শুরু হয় সব স্থানে। উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে এর চলটা সবচেয়ে বেশি। তাই তো দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেজে উঠে ফুলেল সৌরভে। চারুকলার বকুলতলায় উদযাপন করা হয় বসন্তবরণ উৎসব। প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মিলে। মনের সঙ্গে মন। বসন্তবরণ নিয়ে তরুণ মনে থাকে বেশ পরিকল্পনা। প্রতীক্ষা। চলে পূর্বপ্রস্তুতি। ছেলেরা গায়ে জড়াবে পাঞ্জাবি। মেয়েদের বাসন্তী শাড়িতে খোঁপায় গোঁজা ফুল। দুই হাতভর্তি রিনিঝিনি কাচের চুড়ি, নয়তো হাতে পেঁচানো হলুদ গাঁদার মালা। সপ্তাহ খানেক আগে থেকেই ফাগুনের প্রথম দিনটায় বাসন্তী রঙের শাড়িটার সঙ্গে সাজগোজ কেমন হবে, কোথায় বেড়াতে যাবেন, কোন বন্ধবী কোন শাড়িটা পরবে, তার পূর্বপ্রস্তুতি এবং তদারকি নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত থাকেন সকলেই। বসন্ত আসলে আবহাওয়ার সাথে সাথে ফুরফুরে হয়ে ওঠে মন। বাঙালির আনন্দমুখর উৎসবের অন্ত নেই। বসন্তবরণ উৎসবে সবার সাবলীল উপস্থিতি দেখার, অনুভবের মজাই আলাদা।

রাজধানী ঢাকায় ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ করার অন্যতম উৎসবই হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে। চারুকলার শিক্ষার্থীরা ছাড়াও ক্যাম্পাসের অন্য শিক্ষার্থীরা ভোর থেকে চলে আসেন বকুলতলায়। বসন্ত বরণে। শিক্ষার্থী ব্যতীত নগরের সব বয়সি নর-নারীর মূল আকর্ষণ বকুলতলা। সবাই আনন্দ-অভিযানে শামিল হন। বাদ যায় না শিশুরাও। মা-বাবার হাত ধরে গুটিগুটি পায়ে তারাও চলে আসে আগত ঋতুরাজের আগমনি উৎসবে। চুড়িদার সালোয়ার-

www.pathagar.com

পাঞ্জাবির ছোট্ট ছেলে শিশু নয়তো একপেঁচে বাসন্তী ছোট শাড়িতে দেখা যায় ছোট্ট মেয়ে শিশুটিকে। গালে থাকে নানা ধরনের বাসন্তী অঙ্কন। আর এই অঙ্কন আয়োজনের মূল হোতা থাকেন চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীরা। সকাল থেকে হাতে রং-তুলি নিয়ে লেগে যান তাঁরা মুখ অঙ্কনে। বসন্তবরণ উৎসবে প্রাণের উচ্ছলতায় উদ্বেলিত থাকে সবার মন। সেই সঙ্গে মন আকুল থাকে কোকিলের কুহু কুহু ডাক শোনার। কিন্তু কংক্রিটের এই নগরে কুহুতানে বিমূঢ় হওয়ার ভাগ্য কি সবার জোটে? যদি শুনতে চান কোকিলের আকুলতা, একটু সময় নিয়ে চলে আসতে পারেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ, নয়তো সবুজে ঘেরা রমনায়। এসে প্রাণ জুড়াতে পারেন সুরের জাদুতে। চোখ জুড়ানোর জন্য এ ঋতুতে একটু আপনার আশপাশে তাকালেই দেখতে পাবেন নানা রঙের ফুলের বাহার। চোখের সঙ্গে মনও জুড়াবে। পলাশ-শিমূল তো আছেই; শীতের সময় খোলসে ঢুকে থাকা কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, নাগলিঙ্গম এখন অলৌকিক স্পর্শে জেগে উঠেছে। সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে বসন্ত রাঙিয়ে দেয় মানুষের মন। ঝরাপাতার নিরানন্দ শুষ্কতাকে উপেক্ষা করে তাজা নতুন ফুলের কোমল মুখচ্ছবি প্রকৃতির সতেজতাকেই বয়ে নিয়ে আসে। তাই বসন্ত এত মনোরম। সবাই বসন্তবন্দনা করে। প্রতীক্ষা করে বারবার আসুক ফাগুন-বনে ও মনে। শুভ হোক ফাগুন। শুভ হোক বসন্ত।

□ মোহাম্মদপুরে মোস্তাকিমের কাবাব

নগরের একটি বিখ্যাত কাবাবের দোকান 'মোস্তাকিমের চাপ ও কাবাব'। কাবাবের অন্তত ১০টি পদ পাওয়া যায় এখানে। প্রতিটি পদের স্বাদ ভিন্ন। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন এ কাবাবের স্বাদ নিতে জেনেভা ক্যাম্পে চলে আসে। মোস্তাকিমের বঁটি কাবাব, মাংসের চাপ, মগজের কাবাব, টিকা কাবাব খাওয়ার জন্যই এখানে লোক আসে বেশি। নিজেরা তো খায়ই, পছন্দের চাপ আর কাবাব প্যাকেটে করে নিয়েও যায় বাড়ির সবার জন্য। এমনই লোভনীয় এর স্বাদ।

□ সেন্ট যোসেফ

ক্রুশ সংঘের উদ্যোগে ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়- দর্শনীয় এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ব্রাদারদের আন্তরিক সহযোগিতা, ক্রুশ সংঘের নিয়মনিষ্ঠা আর যত্নের চমৎকার রেওয়াজ চলে আসছে বছরের পর বছর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ছোঁয়া স্কুলটির সবখানে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির চারপাশ সবুজ গাছ-গাছালিতে ঘেরা।

□ ফলবীথি হর্টিকালচার সেন্টার

আসাদগেটের পাশেই রয়েছে ফলবীথি হর্টিকালচার সেন্টার। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এই হর্টিকালচার সেন্টারে ঢুকতেই চোখে পড়ে দুই পাশে নানা রকম দেশি-বিদেশি ফলের কলম করা চারা। এক পাশে রয়েছে চালতা,

www.pathagar.com

বিলাতি গাবসহ দেশীয় বিভিন্ন জাতের কলম করা ফলের চারা। দেশি-বিদেশি সব রকম ফলের চারা পাওয়া যায় এখানে।

☐ মোহাম্মদপুরে কাপড়ে কারচুপি

জেনেভা ক্যাম্পের সামনের রাস্তা দিয়ে গেলে চোখে পড়ে ছোট খুপরি দোকান। ছোট্ট দোকানে একটি কাঠামোর ওপর ঝুঁকে কাজ করছেন কর্মীরা। দেখা গেল, একটি কাঠের ফ্রেমে এক টুকরা কাপড় বাঁধা রয়েছে। কাপড়ের জমিনে সুই দিয়ে একটার পর একটা জরি, পুঁতি বসিয়ে যাচ্ছেন কারিগর। কারিগরের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যেই কাপড়ের জমিনে একটি সুন্দর নকশা ফুটে উঠল। কারিগর জানালেন, এ কাজের নাম 'কারচুপি'। কারচুপির কাজ জেনেভা ক্যাম্পের বাসিন্দাদের প্রধান পেশা বলে জানালেন ওই কারচুপি শিল্পী।

জেনেভা ক্যাম্পে ৫০০-এর মতো দোকানে কারচুপির কাজ করা হয়। ক্যাম্পের অসংখ্য মানুষ এ পেশায় নিয়োজিত আছে। মেয়েদের সালোয়ার কামিজ, শাড়ি-ব্লাউজ, পাঞ্জাবি ও ফতুয়াতে নকশা করা হয়। গাউসিয়া মার্কেট, ইস্টার্ন প্লাজাসহ নগরের বিভিন্ন বিপণিবিতানের কাপড়ের দোকানগুলো কারচুপির কাজের ফরমায়েশ দেয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ফ্যাশন হাউসও তাদের কাপড়ের কাজ করিয়ে নেয় এখান থেকে। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে ফরমায়েশ দিয়েও কাপড়ে কারচুপি কাজ করিয়ে নেয়। নিউমার্কেট, চকবাজার ও সদরঘাট থেকে জরি, সুতা, পুঁতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনে আনেন কারচুপি শিল্পীরা।

☐ নবান্ন উৎসব

অগ্রহায়ণ মাসে ধান পাকে। চারদিকে শুরু হয় ধান কেটে বাড়িতে তোলার আয়োজন। গ্রামের কৃষক কেউ ধান কাটে, কেউ ধানের বোঝা মাথায় করে বাড়িতে আনতে ব্যস্ত। মাড়াই করা, ঝেড়ে ধান পরিষ্কার করা- সব মিলিয়ে মহা কর্মযজ্ঞ। অপরদিকে কিষানীর কাজ আরও বেশি। মাড়াই করা, ধান পরিস্কারের কাজ তো আছেই। ধান কুটে চাল, আবার চাল কুটে তারা তৈরি করেন পিঠা বানানোর জন্য চালের গুঁড়া। চিতই পিঠা, ভাপা পিঠা, পুলি পিঠা, সন্দেশ পিঠা, দুধ চিতই আরও কত নাম যে আছে পিঠার। অনেক বাড়িতে সব পিঠা তৈরি করে একই দিনে। আবার কেউ তৈরি করেন চিড়া। মুড়ি তৈরিতেও ব্যস্ত হয়ে যায় অনেকে। সব মিলিয়ে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে এ সময়টা পরিণত হয় নবান্নের মহা উৎসবে। ইট-পাথরের এ নগরীতে সেটা আর সম্ভব নয়। তাই তো গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে আয়োজন করা হয় নবান্ন উৎসবের। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনে নিয়মিতই আয়োজন হচ্ছে নবান্ন উৎসবের। (১৫ নভেম্বর) ১ অগ্রহায়ণ সকাল সাতটা ১৫ মিনিটে বাঁশির সুরে শুরু হয় নবান্ন উৎসবের আয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার বকুলতলায় মঞ্চে চলে নবান্নের গান। মুড়ি-মুড়কি-মোয়া বিতরণের ধুম। মঞ্চে নাচ-গান-

www.pathagar.com

কবিতার নানা রকম আয়োজন। মঞ্চের বাইরে পিঠা তৈরির কর্মচঞ্চলতা। দুধ চিতই, চিতই, তেলের পিঠাসহ নানা রকম পিঠার খাবার প্রতিষ্ঠান। পিঠাপ্রেমীরা হুমড়ি খেয়ে পড়েন সেখানে।

□ ঢাকার বাংলা নববর্ষ

ডুগ, ডুগ, ডুগ- হাতে হাতে বেজে চলছে ডুগডুগি। একতারা, দোতারা, বাঁশি, বাংলা ঢোলও বাজাচ্ছেন কেউ কেউ। প্রতিটি রাস্তায়ই এক-দুজন বাউল আপন মনে গান পরিবেশন করছেন। আনন্দ ধ্বনিতে চারপাশ মুখরিত করে ছুটে চলছে তরুণের দল। শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ-যুবক আজ একই সঙ্গে আত্মহারা। বাঙালিয়ানার উৎসবে মানব-মানবীর ভেদরেখাও যেন উবে গেছে। নববর্ষকে বরণ করে নিতে অভূতপূর্ব এক মাতম দোলায় মেতে থাকে বাঙালি!

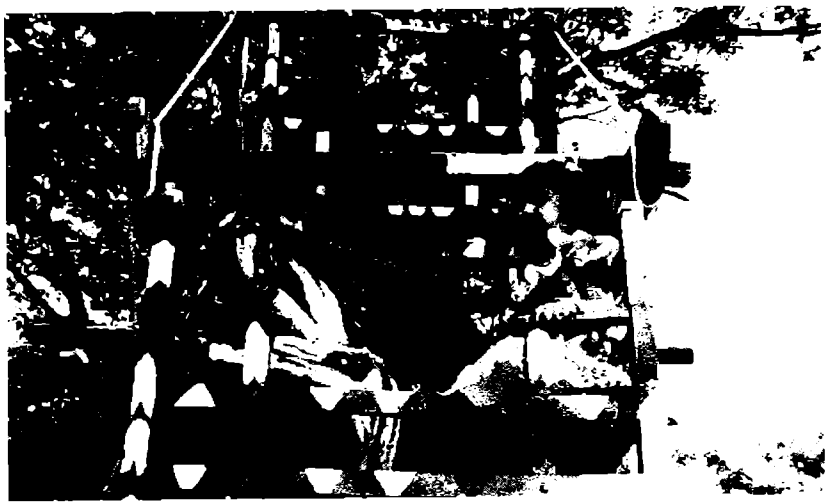

বাংলা নববর্ষে রঙে নাগর দোলায় বন্ধুদের সাথে ফিজ্জা এ ফাতমী

পয়লা বৈশাখে ঘুরেফিরে এই দৃশ্যপটই চোখে পড়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। মনে হয় পুরো নগরটাই যেন জমায়েত হয়েছে রমনা পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, চারুকলা ইনস্টিটিউট ও টিএসসিতে। অবশ্য সকালবেলা সবার লক্ষ রমনা বটমূল। সূর্যদের উঁকিঝুঁকি মারার আগ মুহূর্ত থেকেই মানুষ ছুটে যেতে থাকে রমনা পার্কের দিকে। ততক্ষণে ছায়ানটের বর্ষবরণের আয়োজনও শুরু হয়ে যায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ভিড়ও বাড়তে থাকে। সবার পরনে বাহারি পোশাক। লাল-সাদা রঙের প্রাধান্য লক্ষ করা যায় পোশাকে। মেয়েদের পরনে ছিল শাড়ি। তবে তাঁদের খোঁপায় শোভা পায় গাঁদা অথবা বেলী ফুলের মালা। হাতে-কানে দেশীয় গহনা জড়িয়ে অনেকে হয়ে উঠেন

www.pathagar.com

আবহমান বাংলার নারী। ছেলেরা পরে পাঞ্জাবি ও ফতুয়া। নববর্ষের দিনে এ পোশাক পরে হারানো ঐতিহ্যকে একটু স্মরণ করে সকলে। দেখা যায় লাঙল-জোয়াল কাঁধে কৃষকবেশী তরুণদের। সাথে আরও কত কিছু।

বাংলা নববর্ষে বন্ধুদের সাথে শাহজেব

□ প্রাণের ঢাকা

বেশ কয়েক বছর ধরে সারা বাংলাদেশে পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। গাছ কাটা, বনাঞ্চল উজাড়, পাহাড় কেটে সমান করে ফেলা, নদী দখল, নদীদূষণ, জলাশয় ভরাট, ধানক্ষেত দখল করে তার ওপর কারখানা তৈরি ইত্যাদি পরবেশ ধ্বংসকারী তৎপরতায় দেশের বারোটা বাজছে। বিশেষ করে হঠাৎ করে দেশের পার্বত্য অঞ্চলে গাছ কেটে বন উজাড়ের যে সংবাদ পত্রিকাগুলোতে ছবিসহ প্রকাশিত হচ্ছে তাতে শঙ্কিত না হয়ে উপায় নেই।

এক সময় ঢাকা শহরের প্রতিটি বাড়িতে বড়-ছোট বিভিন্ন ধরনের গাছ দেখা যেতো। বর্তমানের এ দৃশ্য আর তেমন দেখা যায় না। ঢাকায় গাছ কেটে অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে বিল্ডিং। অথচ একটু যত্নবান ও আন্তরিক হলে গাছগুলো অক্ষত রেখেই বিল্ডিং নির্মাণ করা সম্ভব। ঢাকা মহানগরীর ধানমণ্ডি, গুলশান, ডিওএইচএস, খিলক্ষেত, বারিধারা, বনানী, শান্তিনগর, মালিবাগ, ওয়ারি ইত্যাদি এলাকায় বিশাল আকারের ফ্ল্যাট গড়ে উঠছে। অথচ এসব আলিশান বাড়ির সামনে ও ভেতরে বড় বা ছোট গাছ তো দূরের কথা একটি ঘাসও নেই। ফলে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পরিবেশ। রাজধানীর নিম্ন অঞ্চল এলাকাতেও এক সময় আবাদি জমি ভরাট করে নির্মিত হয় বিশাল আকারের বাড়ি। এসব বাড়ির ভেতরে নেই ছোট-বড় কোনো গাছ, নেই কোনো ফুলের

www.pathagar.com

বাগান। গাছের সঙ্গে মানুষ ও জীবের গভীর সম্পর্ক হযরত আদম (আ) এর সময় থেকে চলে আসছে। সেইদিন দূরে নয়, যেদিন গাছশূন্য বাড়ি নির্মাণের মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করবে। কাজেই আর দেরি নয়। সারা বাংলাদেশে বাড়ির আকার-আয়তন বিভেদে ছোট-বড় প্রতিটি বাড়িতে অন্তত দু-তিনটি গাছ লাগানো ও তার পরিচর্যা, বাধ্যতামূলক করা উচিত সরকারিভাবে। পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন এ ব্যাপারে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা নিলে বেঁচে যাবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গাছহীন নির্দয় পরিবেশ থেকে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৫০ সালে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ছিল মাত্র চার লাখ ১৭ হাজার। আর এখন দাঁড়িয়েছে এক কোটিরও বেশি। ২০১৫ সালে দুই কোটি ছাড়িয়ে যাবে। গত ১০০ বছরে ঢাকা শহরের তাপমাত্রা দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেক বেড়েছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, ঢাকা শহর পরিণত হচ্ছে উত্তপ্ত ভূখণ্ডে এবং পরিবেশ হচ্ছে বিপন্ন। গাছপালা কেটে ফেলা, জলাশয় ভরাট, যানবাহন ও কংক্রিটের স্থাপনা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়াই এর অন্যতম প্রধান কারণ। সে জন্য ঢাকা মহানগরীর বাসাবাড়ি, ফ্ল্যাট বা ভবনের ছাদে শুধু ফুলের বাগান নয়, ফলমূলের বাগান কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য ইতোমধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সামাজিক সংগঠন ইনিশিয়েটিভ ফর টোটাল রিফর্ম (আইটিআর) সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে।

উল্লেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন নগরের তাপমাত্রা কমানোর জন্য উদ্যান স্থাপন এবং ভবনের নকশা অনুমোদনের জন্য ছাদে বাগান স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জাপানের রাজধানী টোকিওর মেট্রোপলিটন সরকার টোকিও সিটির ভবনগুলোর ছাদে ন্যূনতম ২০ শতাংশ জায়গায় বাগান কার্যক্রমকে ২০০১ সালে আইন পাস করে বাধ্যতামূলক করেছে। ফলে টোকিও সিটির গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট হ্রাস পেয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার জন্য ঢাকা শহরের বাসাবাড়ির ছাদে ফলমূলের বাগান কার্যক্রমকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। বিশিষ্ট কৃষিবিদের অভিমত এ বাগান কার্যক্রমের মাধ্যমে নগরবাসী সময় কাটানোর জন্য ছাদের সবুজ চত্বরে সৌন্দর্যবর্ধন ও বিনোদনের সুবিধা, পরিবার-পরিজন নিয়ে তাজা শাকসবজি, ফল ও ফুলের প্রাপ্যতা লাভ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ জৈব বর্জ্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ, পারিবারিক শ্রম ব্যবহারের মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা আনয়ন এবং কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। ছাদে বাগান কার্যক্রমের সফলতার জন্য এ মুহূর্তে রাজউক ও রিহ্যাবের ভূমিকাকে খাটো করে দেখা ঠিক হবে না; বরং তারা এক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। সিঙ্গাপুরের মতো দেশে এখন রাস্তার ফুটপাতগুলো সবুজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ছাদে শুধু বাগান নয়, চৌবাচ্চা করে মাছ চাষ করাও যেতে পারে। ঢাকা শহরের পরিবেশ রক্ষার জন্য ছাদে বাগান কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব নগরবাসীর। বিজ্ঞ কৃষিবিদদের

www.pathagar.com

মতে, ছাদগুলোকে ব্যবসায়িকভাবে ব্যবহার না; করে নিজ দেশের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ফলের চাষাবাদ করাই শ্রেয়। এতে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হওয়া সহজতর। এ ছাড়া নগরীর সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে বাগান কর্মসূচিকে উৎসাহিত করা উচিত।

এমতাবস্থায় আগামী প্রজন্মের ও নগরবাসীর স্বার্থে ঢাকা শহরের প্রতিটি বাসাবাড়ি, ফ্ল্যাট, এমনকি স্কুল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ছাদেও ফুল-ফলের বাগান সৃজন করতে আইন পাস করা যেতে পারে। এসব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য ঢাকা সিটি করপোরেশন, রাজউক, রিহ্যাব, গণপূর্ত অধিদপ্তর, এনজিও, টি.ভি চ্যানেল, এফ.এম রেডিও, পত্রিকা-ম্যাগাজিন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানাই।

কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর

পদ্মা, গড়াই, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব বিধৌত ইতিহাস ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ খুলনা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলা। বাংলাদেশের সাহিত্যও সাংস্কৃতিক অঞ্চল বলে খ্যাত এই কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর। বাংলার বীর নবাব আলিবর্দী খান নিজ নবাবি আমলে দরিদ্র ও দুঃখী প্রজাদের দুঃখের সমান অংশীদার হতে নাতি সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে অনেকটা নিরবেই বেরিয়ে পড়তেন বাংলার আনাচে-কানাচে। এই ধারাবাহিকতায় নবাব আলিবর্দী, নাতি সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁর বিশ্বস্ত কিছু সঙ্গীরা ভৈরব নদী পথে এ অঞ্চলে আসেন এবং কুষ্টিয়ার বাগোয়নে হঠাৎ ঝড়ের কবলে পড়লে বিধবা গোয়ালিনীর বাড়িতে সকলে যাত্রা বিরতির জন্য অবস্থান নেন এবং গোয়ালিনীর নম্র আচার-ব্যবহার ও আতিথিয়তায় মুগ্ধ হয়ে নবাব আলিবর্দী খান তাঁর পুত্র রাজগোঁসাইকে বাগোয়ান পরগনা দান করেন। একই সাথে নবাব তাকে রাজা গোয়ালা চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করেন। নবাব আলিবর্দীর আদর্শ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গোয়ালা চৌধুরী পরবর্তী দিনগুলোয় কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর অঞ্চলের উন্নয়নে নিজেকে আত্ম নিয়োগ করেন। কোনো এক সময় এ অঞ্চলে নীলকরদের অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার দরুন এখানে নীল বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। স্বার্থান্বেষী হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) বিদ্রোহের ডাক দেন এবং এ অঞ্চলের মানুষ তাঁকে প্রাণখুলে সমর্থন দেন। হাজী শরীয়তউল্লাহ (১৭৮১-১৮৮৮) ও তাঁর পুত্র দুদুমিয়া (১৮১৯-১৮৪০) কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতি থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ফরায়েজী আন্দোলন শুরু করেন। এ অঞ্চলের মুসলমানদের কাছে এই আন্দোলন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠে। অতীত ইতিহাস বলে কোনো ১ যুগে এ অঞ্চল নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীনতা প্রাপ্ত হলে এ অঞ্চল পাকিস্তান অংশে

www.pathagar.com

াড়ে। অল্প সময় পর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের সিদ্ধান্তের লে নদীয়া জেলাকে দু'খণ্ড করে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ফেলা হয়। বিভক্ত নদীয়া জেলার মোট আয়তন ছিল ২৮৪১ বর্গমাইল। এর মধ্যে ১৩৪১ র্গমাইল পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং ১৪৭০ বর্গমাইল ভারতভুক্ত য়। খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দীতে অঙ্কিত টালেমির মানচিত্রে গঙ্গা নদীর অববাহিকায় ুষ্টিয়ার পশ্চিমাংশকে দ্বীপ দেখানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন নবাব আলিবর্দী ানের নবাবি আমলের প্রথমদিকে কুষ্টিয়ার অস্তিত্বের কথা জানা যায়।

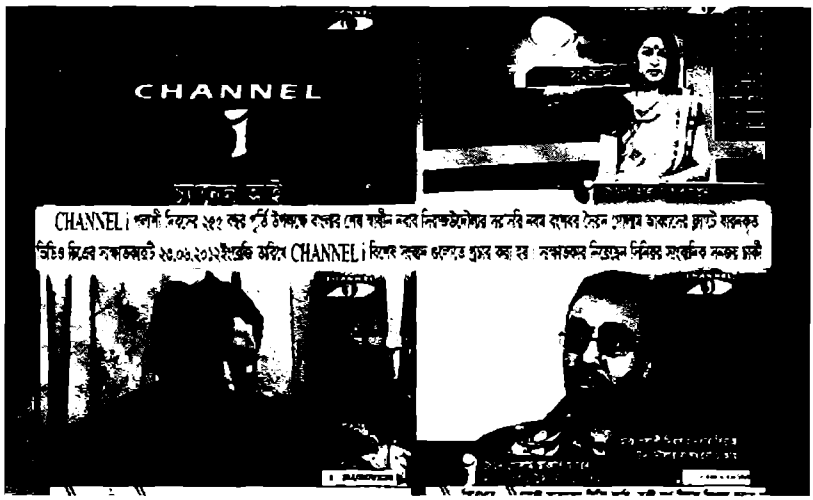

ুষ্টিয়ার কৃতী সন্তান সঞ্জয় চাকী সর্বপ্রথম বেসরকারী টিভি চ্যানেল-এ নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারকে বাংলার মানুষের সাথে পরিচিতি ঘটান

ঝাউদিয়া শাহি মসজিদ কুষ্টিয়া জেলার পুরাকীর্তির একটি বিশেষ নিদর্শন। ুষ্টিয়া সদর থানার অন্তর্গত ঝাউদিয়া গ্রামের এই মসজিদটির ভিতরে মোগল শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন রয়েছে। মসজিদটি ৩ গম্বুজবিশিষ্ট। গম্বুজের মেহরাবে, মসজিদের ভিতরের দেওয়ালে শিউলি, গাঁদা, পদ্ম প্রভৃতি ফুল, ফুলের সাজি বা ুলদানি, লতাপাতা দ্বারা অঙ্কিত। কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার াতবাড়িয়া গ্রামে মোগল সম্রাট নির্মিত সাতবাড়িয়া মসজিদ। ৩ গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদের ৪ কোণায় ৪টি মিনার আছে। দেয়ালে ফুল ও লতাপাতার অলংকরণ দেখতে পাওয়া যায়। কুষ্টিয়া শহর সংলগ্ন বাড়াদী গ্রামের হাটের কিছু দক্ষিণে ঙ্গলের মধ্যে একটি মঠ ছিল। এটি নবাব সিরাজউদ্দৌলার আমলে নির্মিত। মঠটি প্রায় ২০ হাত উঁচু। প্রবেশ পথে দেয়ালের গায়ে বৃষ, অশ্ব, শঙ্খ, রাধাকৃষ্ণ, সৈন্য ও যুদ্ধের অপূর্ব শিল্পকলা বিচিত্র মঠটি অযত্ন অবহেলায় কিছুদিন পূর্বেও

www.pathagar.com

ছিল। যা আজ স্মৃতির পাতায় আর মানুষের কথায় কথায় রয়ে গেছে। খাজা মইনউদ্দিন চিশতীর মাজারের অনুসরণে কুষ্টিয়ায় লালনশাহের মাজার নির্মাণ করা হয়। এই লোককবি নিরক্ষর হয়েও অসংখ্য লোক সংগীত রচনা করেছেন। বাউল সম্রাট লালন শাহ কুমার খালী ছেউড়িয়াতে দীর্ঘ সময় আশ্রয় লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে উক্ত স্থানে মৃত্যুর পর তাঁর সমাধি স্থলেই এক মিলন ক্ষেত্র গড়ে ওঠে। আদিকাল থেকে কুষ্টিয়া তাঁতের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। ব্রিটিশ ভারতে বিলাতি কাপড় বর্জন করে স্বদেশি কাপড় প্রস্তুত করা তখনকার সময়ে কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। মোহিনী মোহন বস্ত্রশিল্পে বাংলাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার মানসে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মিলের কাপড় বাংলার মানুষ ব্যবহার করে আরাম পেতেন। দীর্ঘ সময় যাবত মিলটি বন্ধ থাকলেও তার প্রচেষ্টা অন্যান্যকে অনুপ্রাণিত করায় এ শিল্পে খ্যাতি ধরে রেখেছে নতুন কিছু প্রতিষ্ঠান। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ... ব্রিটিশ আমলে কুষ্টিয়ার সঙ্গে কলকাতার রেল যোগাযোগ ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় পূর্ববাংলা রেলওয়ে কোম্পানি পোড়াদহ রেলওয়ে জংশন থেকে উত্তর দিকে সম্প্রসারণের চিন্তা করে। সেজন্য ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া) পাকশী (ঈশ্বরদী) সংযোগের জন্য পদ্মা নদীর উপর একটা ব্রিজের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯১৫ সালে ব্রিজের কাজ শেষ হয়। হার্ডিঞ্জ ব্রিজটি লম্বায় প্রায় ১ মাইল। এতে ১৮টি স্প্যান আছে। আর এটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ রেলসেতু। এখন পর্যন্ত এ ব্রিজ দেশি বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের দর্শনীয় একটি স্থান। কুষ্টিয়া শহর থেকে ৬-৭ কি.মি. দূরে গড়াই নদীর তীর ঘেঁষে শিলাইদহের বিখ্যাত রবীন্দ্র কুঠিবাড়ির অবস্থান। প্রতিদিনই সংস্কৃতিমনা লোকজন নির্মল আনন্দের সন্ধানে এখানে এসে থাকেন। ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম বার্ষিকীতে উক্ত স্থানে জমজমাট মেলা বসে থাকে। যার দরুন কুঠিবাড়িও তার চারপাশে আবহমান বাংলার সংস্কৃতির ছোঁয়া মেলে। গড়াই ব্রিজ... ১৮৭১ সালে গড়াই নদীর উপর একটি রেলসেতুর কাজ শুরু হয়। গোয়ালন্দ পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের জন্যেই এই রেলসেতু তৈরির প্রয়োজন হয়। ১৮৭২ -এ এই সেতুর উপর দিয়ে রেল চলাচল শুরু হয়। উপরিউক্ত স্থানগুলো ছাড়াও কুষ্টিয়ায় রয়েছে আরও বেশকিছু দর্শনীয় স্থান, তার মধ্যে : কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম, এর চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-, দালানকোঠার নির্মাণ শৈলি, সবকিছুই সত্যিই অপরূপ। আরও ঘুরে আসতে পারেন... আবুরী মসজিদ, কাহ সুজার মসজিদ, স্বস্তিপুর শাহি মসজিদ, বানিয়াকান্দি মসজিদ, পাটিকাবাড়ি শাহি মসজিদ, গোপীনাথ জিউর মন্দির, মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতিসৌধ, টগোর লজ, পাবলিক লাইব্রেরী, পৌরভবন, পরিমল থিয়েটার ইত্যাদি। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় দু'টি নাম। বাঙালি জাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই দুই ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। যতদিন বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি, লাল সবুজের হৃদয় ও বাংলাদেশ থাকবে ততদিন এই দু'টি নাম বার

www.pathagar.com

বার নানাভাবে উচ্চারিত হবে। ২০০৮ সালের স্বাধীনতার মাসে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের মানুষ এই দুই মহান ব্যক্তির নামে দুটি কলেজ নামকরণ করে ১টি নতুন দেশপ্রেমের ইতিহাস সৃষ্টি করে। এই কলেজ দুটি নামকরণের স্বপ্নদ্রষ্টা হলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক কুষ্টিয়ার কৃতি সন্তান ড. মুহাম্মদ ফজলুল হক। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেছে দৌলতপুরের সর্বস্তরের মানুষ। ড. মুহাম্মদ ফজলুল হক কুষ্টিয়ার শিক্ষা ও অর্থ সামাজিক উন্নয়নে দীর্ঘকাল ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে চলেছেন। তিনি কুষ্টিয়ার বিভিন্ন নামিদামি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। এলাকার সড়ক উন্নয়ন, মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও মানব কল্যাণে তিনি নিবেদিতপ্রাণ মানুষ। আমি বিগত কয়েক বছর যাবৎ তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা সাপ্তাহিক পলাশী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখা বইপত্র প্রকাশের কাজে তাঁর সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ফলে তাঁকে আমার ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। ১০ মার্চ ২০০৮ কুষ্টিয়া (দৌলতপুর, গোয়ালগ্রাম) এক বিশাল অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ মোঃ মনিরুজ্জামান বলেন... ড. মুহাম্মদ ফজলুল হকের পরিকল্পনায় এলাকাবাসীর আন্তরিক ইচ্ছায় আমাদের কলেজের নাম পরিবর্তন করা হলো এবং এখন থেকে কলেজটির নাম হবে 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলেজ'। তিনি বলেন ড. মুহাম্মদ ফজলুল হক সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন, এজন্য আমরা তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ। অনুষ্ঠানে মানপত্র পাঠ করেন বাংলা বিভাগের প্রভাষক মোঃ মিজানুর রহমান ও শারমিন আকতার। বক্তব্য রাখেন শিল্পী সুবর্ণ কাজী, সমাজসেবক মোঃ ইছারউদ্দিন, সমাজসেবক আফিল উদ্দিন মিয়া, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রেজাউল করিম, পলাশীর নির্বাহী সম্পাদক মুহাম্মদ রবীউল আলম প্রমুখ। সমাজসেবক আফিল উদ্দিন মিয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলেজের জন্য ৭ বিঘা জমি দিয়ে কলেজটি সু-প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগিতা করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও নবাব সিরাজউদ্দৌলা গবেষক ড. মুহাম্মদ ফজলুল হক তাঁর ভাষণে বলেন, তোমরা লেখাপড়া ভালোভাবে কর, আমি তোমাদের সহযোগিতা করব। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলেজের জন্য কুষ্টিয়ার সর্বস্তরের মানুষকে সহযোগিতা করতে হবে। তিনি বলেন, নবাব সিরাজউদ্দৌলা এই দেশের জন্য নিজ জীবনকে উৎসর্গ করে ছিলেন। তাঁর স্মরণে এই কলেজটির নামকরণ করা হয়েছে। এজন্য এলাকাবাসীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। অনুষ্ঠানে ড. মুহাম্মদ ফজলুল হক রচিত 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও বাংলার মসনদ' ও 'স্বাধীনতার প্রথম শহীদ নবাব সিরাজউদ্দৌলা'সহ বেশকিছু গ্রন্থ নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলেজ কর্তৃপক্ষকে উপহার দেয়া হয়। বাংলাদেশের বেসরকারি মালিকানাধীন টি. ভি. চ্যানেল, চ্যানেল আই-এ কর্মরত রয়েছেন কুষ্টিয়া জেলার কৃতি সন্তান খ্যাতনামা সিনিয়র সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় সঞ্জয় চাকী। তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ভালোবাসায় ২৩ জুন ২০১২ ইং সালে বাংলাদেশের বেসরকারি টি. ভি. চ্যানেলে সর্বপ্রথম নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারে নতুন প্রজন্ম সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেবের সাক্ষাৎকার তুলে ধরেন।

www.pathagar.com

উক্ত দিনে চ্যানেল আই এর বিশেষ সংবাদগুলোতে গুরুত্বসহকারে প্রচার কর হয়। কুষ্টিয়াবাসীর ভালোবাসায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন, আছেন, থাকবেন তাইতো কুষ্টিয়াবাসীর মন কামনা পূরণে বারবার এগিয়ে এসেছেন আজকে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বরা। কখনো চ্যানেল আইয়ের পক্ষ থেকে সঞ্জয় চাকী আদিত্য শাহীন, কখনোবা স্ব উদ্যোগে এগিয়ে এসেছেন ড. মুহাম্মদ ফজলুল হকের মতো গুণী শিক্ষাবিদেরা। আর তাঁরা এগিয়ে এসেছেন বলেই কুষ্টিয় সদরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের নামকরণ করা হয়েছে বীর নবাব সিরাজউদ্দৌলা নামে।

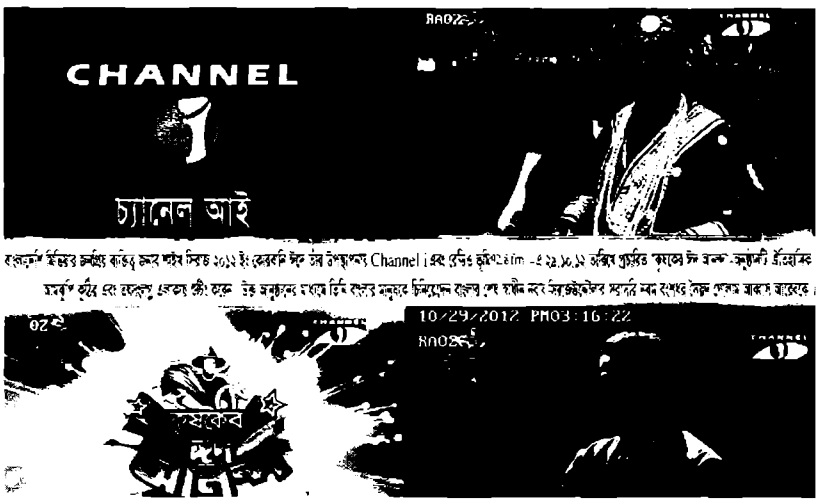

কৃষি ব্যক্তিত্ব জনাব শাইখ সিরাজ কৃষকের ঈদ আনন্দ (নভেম্বর ২০১২) অনুষ্ঠানে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের অজানা কথা বাংলার মানুষের সামনে তুলে ধরেন। উক্ত অনুষ্ঠানের চিত্রায়ন ঐতিহ্যবাহী আমঝুপি কুঠীর সংলগ্ন মেহেরপুরে চিত্রায়িত হয়েছে।

বন্ধুরা চলুন এবার আমরা মেহেরপুর জেলার কথা জেনেনি... মেহেরপুর জেলা শহর থেকে ১৫ কি.মি. দক্ষিণে সীমান্ত লাগোয়া বৈদ্যনাথ তলার আমবাগানে মুজিবনগরের অবস্থান। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার এখানে আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করে। উক্ত স্থানে মূল স্মৃতিসৌধ ছাড়াও স্মৃতিসৌধকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয়েছে গণপূর্ত বিভাগের বিশ্রামাগার, জেলা পরিষদ ডাক বাংলা, স্বাধীনতা ক্লাব ও পাঠাগার উদ্যান, মঞ্চ ইত্যাদি। মুজিবনগর স্মৃতিসৌধটি ভবেরপাড়া মৌজায় অবস্থিত মুজিবনগরের ২০.১০ একর জমি পরিধিতে সহস্রাধিক বৃক্ষের আম্রকাননের নিরিবিলি সবুজ শান্ত পরিবেশ, পাখিদের ডাকাডাকি; এসব কিছুর সাথে এব

www.pathagar.com

গর্বিত অহংকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই স্মৃতিসৌধ। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুজিবনগরকে নতুন দেশের অস্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করেন। একই বছর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তর মুজিবনগর থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। বাঙালির সকল সংগ্রাম ও আন্দোলনে মেহেরপুরের রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। ফকির মনজু শাহ, চেরাগ আলী শাহ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানীদের নেতৃত্বে পরিচালিত ফকির সন্ন্যাসী (১৭৬০-১৮০০) মেহেরপুরের গাংনীর ইন্দুভুষণ সন্ন্যাসীরা গড়ে তোলে সংগ্রাম প্রতিরোধ। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ ফজলুল হকের জন্ম মুর্শিদাবাদে। ৪৭-এ দেশ ভাগের সময় স্বপরিবারে বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় চলে আসেন। বর্তমানে সেখানেই তাদের সব কিছু। ছোটবেলা থেকেই ফজলুল হক সাহেবের শ্রদ্ধা ভালোবাসা আগ্রহ ছিল নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁর পরিবারের প্রতি। সে থেকেই দীর্ঘ সময় যাবৎ এ বিষয়টা নিয়ে তিনি গবেষণা করতে থাকেন এবং ৮০-র দশকের শুরু থেকে বর্তমানে (২০১৪ সাল) সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ অ-লাভজনকভাবে সাপ্তাহিক 'পলাশী' পত্রিকাটি প্রকাশ করে যাচ্ছেন, শুধু সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁর পরিবারের ভালোবাসায়। উক্ত পত্রিকার নির্বাহ সম্পাদক মুহাম্মদ রবীউল আলম। যিনি এ পত্রিকার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ড. হককে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। মুহাম্মদ রবীউল আলম মেহেরপুর জেলার কৃতি সন্তান। চ্যানেল আই তাঁদের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'কৃষকের ঈদ আনন্দ'–২০১২ সালের পর্বটি ঐতিহ্যবাহী মেহেরপুরের আমঝুপি কুটির ও তৎসংলগ্ন এলাকায় শুটিং করে। আমঝুপি কুটির সাথে নবাব আলিবর্দী ও সিরাজউদ্দৌলার ইতিহাস জড়িত। তাই অনুষ্ঠানটির উপস্থাপক ও পরিকল্পনাকারী জনাব শাইখ সিরাজ উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীদের দিয়ে সিরাজউদ্দৌলা নাটকটি মঞ্চস্থ করান, পাশাপাশি তিনি নিজে নবাবি পোশাক পরেন এবং গ্রামবাসীকে বীর সিরাজউদ্দৌলার বীরত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এখানেই শেষ নয় জনাব শাইখ সিরাজ উক্ত অনুষ্ঠানের এক অংশজুড়ে খুব গুরুত্বসহকারে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ৯ম প্রজন্ম গোলাম আব্বাস আরেবের বলা নবাব পরিবারের অজানা সব কথা তাঁর অনুষ্ঠান মালায় তুলে ধরেন। এটি প্রচারিত হয় ২৯.১০.২০১২ ইং সালে চ্যানেল আই এবং রেডিও ভূমি 92.8 Fm-এ। আমঝুপি কুঠিরে একটি বৃহৎ আম বাগান নবাব আলিবর্দী খান স্বউদ্যোগে করেছিলেন। ওখানে তিনি আপনজনসহ আসতেন, কাজলা নদী দিয়ে বজরায় করে। এলাকাটি এ কারণেও বিখ্যাত। তাছাড়া অনেকেই বলে থাকেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে পতনের পরিকল্পনা এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। যাই হোক বন্ধুরা মেহেরপুরের আমঝুপি কুঠির সত্যিই ১টি দৃষ্টিনন্দন দর্শনীয় স্থান।

www.pathagar.com

শান্ত স্নিগ্ধ খুলনা

একনজরে খুলনা... সুন্দরবন, সুন্দরবনের নদ নদী, চিংড়ির ঘে মংলাবন্দর, ষাট গম্বুজ মসজিদ, রূপসা সেতু, মুজিবনগর, শিলাইদহ, খুল বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও অনেক কিছু খুলনা বিভাগের গর্ব। সাহিত্য, সংস্কৃতি অর্থনীতি, রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে, কালে কালে ব গুনীজন খুলনাকে করেছেন ধন্য। বৃহত্তর খুলনা জনপদের মানুষ দেশ তথ উপমহাদেশের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও বিকা যুগ যুগ ধরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এ অঞ্চলের মানুষ অত্য সাহসী, সমাজ সচেতন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অগ্রণী সৈনিক। জাতীয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খুলনার মানুষ সর্বক্ষেত্রে সাফল্যের বিজয়গাঁথা অব্যাহত গ রচনা করে চলেছে। আকাশচুম্বী ভবনের ডিজিটাল যুগেও খুলনার পুরাতন ভবন মসজিদ-মন্দির-গির্জা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের গঠন শৈলী ও নির্মা রীতি দিয়ে। এ অঞ্চলের বেশিরভাগ মসজিদ তৈরি হয় মোগল আমলে। সময় বিভিন্ন দরবেশ আউলিয়া ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য খুলনায় আসেন তাদের তত্ত্বাবধানেই বেশকিছু দৃষ্টি নন্দন মসজিদ তৈরি হয়। পরবর্তীকা মসজিদের আশেপাশেই তাদের মাজার স্থাপিত হয়।

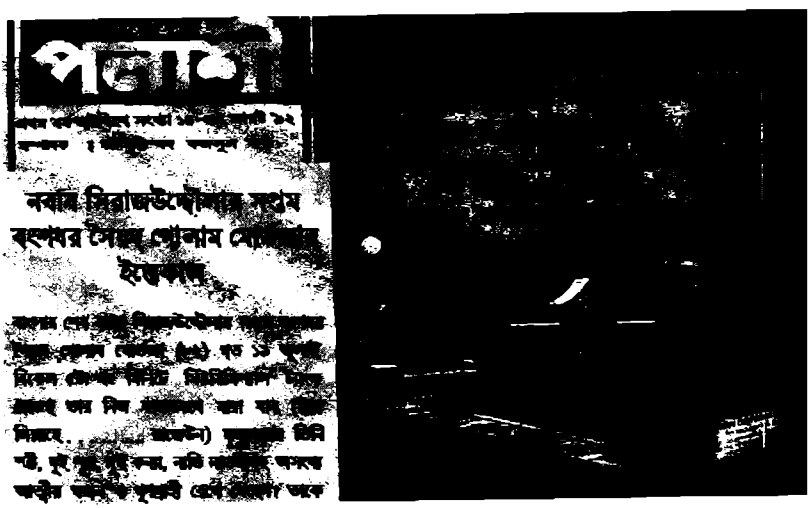

নবাব সিরাজউদ্দৌলার সপ্তম বংশধর চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন শান্ত স্নি খুলনায়। তার মৃত্যুর সংবাদ ১৯৯২ সালের আগস্ট সংখ্যায় ড. মুহাম্মদ ফজলু হক সম্পাদিত সাপ্তাহিক পলাশীতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

বন্ধুরা চলুন অল্প কথায় খুলনা শহরের কিছু দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে জেনে নি.... ১) খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ২) জাতিসংঘ পার্ক ৩) খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর (শিববাড়ির মোড়ে অবস্থিত) ৪) বীরশ্রেষ্ঠ রহুল আমিনের মাজার ৫) কবি কৃষ্ণচন্দ্র ইনিস্টিটিউট ৬) খুলনা আর্ট কলেজ ৭) খান জাহান আলী রোডে অবস্থিত রূপসা সেতু। অনেকের কাছে দর্শনীয় এই সেতুটি খান জাহান সেতু নামে পরিচিত। ৮) গোল্লারি স্মৃতিসৌধ এবং বধ্যভূমি ৯) হাদিস পার্ক (পিকচার প্যালেস এবং ডাক বাংলা মোড়ে এর অবস্থান) ১০) শিববাড়ি চত্বর ১১) প্রেম কানন (খালিশপুর এবং জোড়া গেটের কাছে এর অবস্থান) ১২) সার্কিট হাউজ ১৩) বোট ঘাট, এটি আবার কাস্টম ঘাট নামেও পরিচিত (খুলনা সার্কিট হাউজের উত্তর পার্শ্বে) ১৪) খুলনা চিড়িয়াখানা, এর অবস্থান গিলা তলায়। এর সাথেই আছে শিশু পার্ক। এটি খুলনা ক্যান্টনমেন্ট আর্মিদের দ্বারা পরিচালিত। ১৫) খুলনা জেলা/জিলা স্কুল ১৬) খ্রিস্টান মিশনারি কর্তৃক পরিচালিত ফাতেমা/ফাতিমা স্কুল, অল্প কয়েক বছর উক্ত স্কুলের জুনিয়র ক্লাসের শিক্ষার্থী ছিলাম আমি। গাছ-গাছালিতে ঘেরা উক্ত স্কুলের পরিবেশ সত্যিই প্রশংসনীয় ১৭) সেন্ট যোসেফ স্কুল ১৮) খুলনা প্রেসক্লাব ১৯) খুলনা মিউনিসিপাল ট্যাংক রোড, এটি আবার এম.টি. রোড নামেও পরিচিত। এই রোডেই একটি বাড়ির অবস্থান। যেখানে ভারত পাকিস্তান ভাগের পর, ভারতের মুর্শিদাবাদ হতে খুলনার এম.টি রোডে বাড়ি খরিদ করে অবস্থান নেন.... বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবার। আর বাংলাদেশের খুলনা শহরে আমার জন্ম। এই শহরেই আমার বেড়ে ওঠা। এম.টি. রোডের খুব নিকটেই সান ফ্লাওয়ার কিন্ডারগার্ডেন ও ফাতেমা স্কুলের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলাম। ৯০ দশকের শেষ দিকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের সকলে ঢাকায় চলে আসলে, এম.টি. রোডের বাড়িটি সিরাজ পরিবারের ৮ম প্রজন্ম এস. জি. মোস্তফা পারিবারিক সম্মতিক্রমে ইরান সরকার পরিচালিত একটি (N.G.O) কে হস্তান্তর করেন। বর্তমানে উক্ত বাড়িটি সকলের কাছে ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইরানের ৭০% অর্থায়নে চলে, পাশাপাশি নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবার ও অন্যান্যদের ৩০% অর্থায়নে পরিচালিত হয়। যেহেতু নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের পূর্বপুরুষ আলিবর্দী খান নিজ জন্মভূমি ও মাতৃভূমি ইরান থেকে বাংলায় এসেছিলেন, পরবর্তীকালে তার নবাবি আমলে সিরাজউদ্দৌলা ১৭২৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন তৎকালীন দু'বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে। এ কারণে সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ সব কিছুতেই লক্ষ করা যায় ইরান এবং ভারতের ঐতিহ্যের ছোঁয়া। যা নবাব আলিবর্দী খান থেকে শুরু করে নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং তাঁর পরের প্রতিটি প্রজন্মই সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে। যুগ ও সময়ের সাথে তা কিন্তু বিন্দুমাত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেনি, সিরাজউদ্দৌলার নতুন প্রজন্মরা। ২০)

www.pathagar.com

খুলনার এম টি রোডের উক্ত বাসস্থানটি নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের। ছবিতে বেগম লুৎফুন্নিসা বংশের অষ্টম প্রজন্ম সৈয়দা হোসনে আরা বেগম।

এম.টি. রোডের কাছে দৃষ্টি নন্দন পুরাতন একটি রাজকীয় বাড়ির অবস্থান। এটি সাউস সেন্ট্রাল রোডে অবস্থিত। উক্ত বাড়িটির পেছনেই সিরাজ পরিবারের বাড়ির অবস্থান। সাউথ সেন্ট্রাল রোডের দৃষ্টিনন্দন বাড়িতে কোনো এককালে সানফ্লাওয়ার কিন্ডারগার্ডেন এর অবস্থান ছিল, তখন উক্ত স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়াকালীন সময়ে দৃষ্টিনন্দন বাড়িটি খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাই। উক্ত বাড়িটি খুলনার বিখ্যাত রাজনীতিবিদ সবুর খানের ভাই-এর ২১) রূপসা সেতুর ওপারে আছে বিখ্যাত ভূতের বাড়ি এবং তৎসংলগ্ন দর্শনীয় পার্ক ২২) বড় বাজার ২৩) খুলনা নিউ মার্কেট ২৪) খুলনার কিছু উল্লেখযোগ্য সিনেমা হল : পিকচার প্যালেস, শঙ্খ, সোসাইটি, সংগীতা, ঠল্লাসিনি। বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের বিখ্যাত দু'টি সিনেমা বেদের মেয়ে জোসনা এবং দাঙ্গা, দীর্ঘ কয়েক বছর শুধু বাংলাদেশের খুলনা শহরের সিনেমা ারগুলোতে প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত চলচ্চিত্রগুলো পরবর্তী সময়ে কলকাতায় রিমেক হলে, সেখানেও ব্যাপক ব্যবসা সফল হয়। বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের ১ মাত্র ফল অভিনেত্রী শাবানার শ্বশুরবাড়ি খুলনা শহরে। শাবানার অধিকাংশ চলচ্চিত্র লনাবাসী ব্যবসা সফল করে। এগুলো ওপার বাংলায় রিমেক হয়। যার দরুন বাংলায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বন্ধুত্বের সেতুবন্ধ স্থাপিত হয়। বন্ধুরা লনা ভ্রমণে আসলে শহরটি আপনাকে নিরাশ করবে না। আলোচিত স্থাপনা াড়াও খুলনায় আরও আছে দৃষ্টিনন্দন নতুন পুরাতন মসজিদ, মন্দির, পার্কসহও ারও অনেক কিছু। খুলনার হৃদয় জুড়ে আছেন সবুর খান, পাক্ষিক ফজর াত্রিকার প্রকাশক মোঃ ইকবাল, ফজর সম্পাদক মোঃ জাকির হোসেন, সহকারী ম্পাদক মল্লিক শিহাব ইকবাল, মুন্নুজান সুফিয়ান, ড. নাজিম আলি, অভিনেত্রী াবানার স্বামী, যদি বাংলাদেশ ব্যবসা জগতের সফল ব্যবসায়ী, খুলনার টুটপাড়া

www.pathagar.com

কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা বংশের ৭ম প্রজন্ম গোলাম মোর্তজা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়ি খুলনায়, শিল্পী ফিরোজ মাহমুদ, তাঁর জন্ম ১৯৭৪ সালে খুলনা শহরে। খুলনাতেই তাঁর পরিবার-পরিজন থাকেন। তিনি ২০১১ সালে ১৩-২২ নভেম্বরে ঢাকার বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টস-এ সোলো পেইন্টিং এক্সিবিশনের আয়োজন করেন। ১০ দিনব্যাপী প্রদর্শিত উক্ত পেইন্টিং প্রদর্শনির মূল আলোচ্য বিষয় ছিল 'Dismal cry of heritage. খুলনার সন্তান ফিরোজ মাহমুদের অঙ্কিত চিত্রগুলোতে অতীতের বেদনাদায়ক কান্নার চিত্র ফুটে উঠে, নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও নবাবের প্রিয় পরিবারকে ঘিরে। সিরাজ পরিবারের ৯ম প্রজন্ম হিসেবে উক্ত চিত্র প্রদর্শনীতে আমার আগমন ঘটে। শিল্পীর চিত্র দেখে কিছুক্ষণের জন্য অতীতে আমিও হারিয়ে যাই। খুলনার হৃদয়জুড়ে আরও যারা আছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম কর্নেল (অব.) শেখ আকরাম আলী। কর্নেল স্যার আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন। তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁর বর্তমান পরিবারের ভালোবাসায় সাম্প্রতিক সময়গুলোতে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।

রানী ভবানীর নাটোরে

রানী ভবানীর নাটোর, উত্তরা গণভবনখ্যাত নাটোর এবং জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেনের জন্মস্থান নাটোর। এই নাটোরকে নিজের চোখে দেখতে কার না মন চায়? বন্ধুরা চলুন ঘুরে আসি নাটোর থেকে। সড়কপথে ঢাকা থেকে নাটোরের দূরত্ব ২২৩ কিলোমিটার।

নাটোরের দর্শনীয় স্থানসমূহ

নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলেজ : বাংলার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক সন্তান সিরাজউদ্দৌলার প্রতি লাল সবুজের দেশপ্রেমী হৃদয়ের শ্রদ্ধার নিদর্শন নবাব সিরাজউদ্দৌলা সরকারি কলেজ। যা দর্শনার্থীদের তার বীরত্ব ও দেশপ্রেমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

উত্তরা গণভবন : প্রধান ভবনে ৯টি শয়ন কক্ষ, একটি অভ্যর্থনা কক্ষ; একটি খাবার কক্ষ ও একটি সম্মেলন কক্ষ আছে। বড় কক্ষটির ছাদ প্রায় ২৫ ফুট উঁচু। প্রাসাদটির বিভিন্ন স্থানে রয়েছে রানীমহল, গোছারি, অতিথি ভবন ইত্যাদি। ভবনটি অপূর্ব সাজে সজ্জিত। এটি মূলত একটি জমিদারবাড়ি। ১৯৫১ সালে জমিদারি বিলুপ্ত হওয়ার পর এটি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়। রাজবাড়িটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেওয়ান দয়ারাম রায়। এ জেলার সিংড়া থানার কলম গ্রামে তার জন্ম। ১৭৬০ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। প্রাণনাথের দত্তক পুত্র প্রসন্ননাথ রাজার দায়িত্ব পালনকালে এই রাজপ্রাসাদটি সুন্দরভাবে গড়ে তোলেন।

www.pathagar.com

রানী ভবনীর রাজবাড়ি : শহরের বঙ্গজল এলাকায় এটি অবস্থিত। রানী ভবানীর স্বামী ছিলেন রামকান্ত রায়। তিনি মারা গেলে রানী ভবানী নবাব আলিবর্দী খানের অধীনে জমিদারির দায়িত্ব নেন। তার জমিদারির আয়তন ছিল ১৩ হাজার বর্গমাইল এবং বার্ষিক আয় ২৭ লাখ টাকা।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে খাদ্যাভাবে বহু লোক মারা যায়। এ সময় তিনি প্রজাদের জীবন বাঁচানোর জন্য রাজভাণ্ডার খুলে দেন। ফলে প্রজারা নিদারুণ খাদ্য কষ্ট থেকে রক্ষা পান। তিনি দীর্ঘ সময় প্রায় ৫০ বছর রাজত্ব করে ১৮০২ সালে ৭৯ বছর বয়সে মারা যান। তিনি ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার আদর্শ ও চেতনার অনুসারী দেশপ্রেমিক সৈনিক।

রাজদিঘি : রাজবাড়ির পাশেই রাজদিঘিটি দেখতে পারেন। ৫০ বিঘা জমি নিয়ে এটি বিস্তৃত। দিঘির পাশে বসার জন্য শ্বেত পাথরের বেঞ্চ রয়েছে। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর একটুখানি বসলে মন্দ লাগবে না।

চলন বিল : বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিলের নাম চলন বিল। পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলায় এটি অবস্থিত। এটি ৪০০ বছরের পুরনো। আপনি বর্ষাকালে গেলে এ বিলের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। বিলে ইচ্ছে করলে বোটিং করতে পারেন।

চলন বিল জাদুঘর : এবার আসুন চলন বিল জাদুঘরে। এটি নাটোরের গুরুদাসপুর থানায় অবস্থিত। ১৯৭৮ সালে সম্পূর্ণ বেসরকারিভাবে জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বহু মূল্যবান সামগ্রী দেখতে পাবেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বাদশাহ আলমগীর ও সুলতান নাসির উদ্দীনের নিজ হাতে লেখা কোরআন শরিফ, গাছের ছালে লেখা পত্রাবলি, দুর্লভ মুদ্রা, সেকেলে সমরাস্ত্র, মূল্যবান পাথরের মূর্তি। নয়ন হোটেল কিংবা হোটেল রাজে থাকতে পারেন। আর ফেরার সময় নিয়ে আসবেন নাটোরের বিখ্যাত কাঁচাগোল্লা।

পুণ্ড্রনগরী বগুড়া

দুধ থেকে নানা রকম খাবার তৈরি হয়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দধি। অতিথি আপ্যায়নে টক-মিষ্টি স্বাদের এই খাবারটির জুড়ি মেলা ভার। একসময় বিয়ে-শাদির মতো বড় বড় আয়োজনে ভূরিভোজনের শেষ পর্বে মিষ্টান্নের সঙ্গে অত্যাবশ্যকীয় ছিল দই। তবে এখন ফিরনি, জর্দার দাপটে এসব আয়োজন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে খাবারটি। তবে বগুড়ার এমন কিছু মিষ্টান্নের দোকান আছে, যেখানে দই তৈরি ও সংরক্ষণে অনুসরণ করা হয় সনাতন রীতি। গরুর খাঁটি দুধের দই পাওয়া যায় সেসব দোকানে। তাই বগুড়ার মিষ্টান্নের দোকানগুলোর

www.pathagar.com

দইয়ের চাহিদা আছে আগের মতোই। কোনো এক সময় চার-আনা সের দুধ ছিল। এখন দুধের দাম অনেক বেশি। তবে বগুড়ার দধির খ্যাতি আজও টিকে আছে আগের মতোই। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে দিনে দিনে বগুড়ার দধির নাম ছড়িয়ে পড়ছে দূর দূরান্তের দেশগুলোতে। ঐতিহ্যবাহী এই বগুড়াতেই স্বাধীন বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক বীর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্ম। বগুড়ার দধি জিয়াউর রহমানের পছন্দের তালিকায় ছিল, তাই অনেকে তার বাড়িতে নিয়ে গেছেন তারই জন্মভূমির খাঁটি দধি। নবাব সিরাজউদ্দৌলার আদর্শ ও চেতনার সৈনিক রানী ভবানী বগুড়া জেলার আদমদীঘি থানার ছাতিনগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রানী ভবানী স্বীয় জন্মস্থানকে চির অক্ষয় করার জন্য জয়দুর্গা মন্দির নির্মাণ করেন আর তার পাশেই শিব মন্দিরের দেখা মেলে। বগুড়া শুধু মিষ্টি বা দধির জন্য খ্যাত নয়, এই অঞ্চল ঘুরে আসা মানে ইতিহাসের টাইম মেশিনে করে হারিয়ে যাওয়াকালে ১ বার নিজেকে ঘুরিয়ে আনা। প্রত্যক্ষ করা গুপ্ত থেকে সুলতানি/মোগল আমলের গৌরবোজ্জ্বল অনেক কীর্তি। ক্ষত্রীয় নরপতি পরশুরামকে পরাজিত করে শাহ সুলতান বলখী সাহী সাওয়ার মহাস্থানগড়ে ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলন করেন। মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে মহাস্থানগড়ের উৎপত্তি হয়। এর খুব কাছেই রয়েছে বগুড়া আর্ট কলেজ। বগুড়া খুব ছোট ও শান্ত শহর এর সব কিছুই দর্শনীয়। বগুড়া শহরে অবস্থিত হোটেল আকবরিয়া স্বল্প মূল্যে থাকা ও খাওয়ার জন্য একটি মানসম্মত জায়গা। বগুড়া শহরেই রয়েছে কারুপল্লী এবং প্যালেস মিউজিয়াম। কারুপল্লী আপনাকে মনে করিয়ে দেবে মিনি স্বপ্নপুরির কথা। আর এখানকার আদিম মানুষের গুহায় প্রবেশ করলে দেখতে পাবেন আদিম মানুষের জীবন সংগ্রাম। আলো আবছার এ গুহাটি একেবারে জীবন্ত মনে হবে আপনার কাছে। বগুড়া শহরের ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে রয়েছে বহুল আলোচিত বেহুলার বাসর ঘর। কথিত আছে, বেহুলা লখিন্দরের বাসর রাতে সর্প কর্তৃক দংশনে লখিন্দর মারা যান। এরপর কর্মগুণে বেহুলা তার স্বামী লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তুলতে সক্ষম হন। আর তারই নিদর্শন এই বেহুলার বাসর ঘরটি ১৩ মিটার উঁচু। খ্রিস্টীয় ৬-৭ শতকে এটি নির্মিত হয় বলে অনুমান করা হয়। প্রতিদিন শত শত পর্যটকের পদচারণায় মুখরিত হয় এ স্থানটি। এ ছাড়া এখানে আরো যে স্থানসমূহ দেখতে পাবেন তা হলো মহাস্থানগড়, গোবিন্দভিটা, গোকুল মেধ, খরস্রোতা করতোয়া নদীর মরারূপ, শীলাদেবীর ঘাট, জিয়ৎকুণ্ড, পরশুরামের সভাবাটী, সত্যপীরের ভিটা ইত্যাদি। এসব স্থান ঘুরতে ঘুরতে যদি আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন তবে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ দাম বেশি হলেও হরহামেশাই পাওয়া যাবে কোমল পানীয়। আর সবুজে ভরা পরিবেশে শীতল তো হবেনই।

www.pathagar.com

বাংলার যুবরাজ
সৈয়দ গোলাম আব্বাস (আরেব)

বিশেষ কারো সম্পর্কে বিশেষভাবে জানতে সবাই আগ্রহী হন। তারা কীভাবে খান, কী করে ঘুমান, কী করে আনন্দ পান আরো কতকিছু, তাইনা বন্ধুরা? বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আস্থা, বিশ্বাস, ভালোবাসায় বীর নবাব সিরাজউদ্দৌলা আর তাঁর প্রিয় পরিবারের নাম। নবাব আলিবর্দী খান, শরফুন্নিসা বেগম, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, বেগম লুৎফুন্নিসা প্রত্যেকেই বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রেখেছেন অবিস্মরণীয় ভূমিকা। সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে এগিয়ে এসেছেন প্রকৌশলী এস. জি. মোস্তফা ও সৈয়দা হোসনে আরা বেগমের পুত্র আর একই বংশের ৯ম প্রজন্ম ঐতিহ্যের যুবরাজ এস. জি. আব্বাস। তাঁর কথা জানাচ্ছেন.... ঐতিহ্যবাহী নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ৮ম প্রজন্ম সৈয়দ গোলাম মোস্তফা।

অল্প স্বল্প গল্প...

❑ নাম : এস. জি. আব্বাস ওরফে নবাবজাদা আলি আব্বাসউদ্দৌলা।

❑ ডাক নাম : আরেব। প্রিয়জন কিংবা বন্ধুরা অন্য যেসব নামে ডাকে : সৈয়দ গোলাম আব্বাস, সিরাজউদ্দৌলা; সাইয়্যাদ ওয়ারেস রেজা, তুহিন, হৃদয়, রাব্বি, আরিফ, তুহি, রুবেল, তুষার, আলি-উদ-দৌলা, নবাব, আরও অনেক নাম।

❑ জন্ম তারিখ ও স্থান : ৪ঠা আশ্বিন, খুলনা, বাংলাদেশ।

❑ পেশা : সাংবাদিক।

❑ পিতার নাম : এস. জি. মোস্তফা।

❑ মায়ের নাম : সৈয়দা হোসনে আরা বেগম।

❑ ভাই-বোন : মাসুম, ইমু, মুনমুন।

❑ প্রথম স্কুল : মিনি টিউটোরিয়াল, লালমাটিয়া, ঢাকা।

❑ প্রিয় উক্তি : কারো উপকার না করতে পারলে ক্ষতি করো না।

❑ প্রিয় পোশাক : পরিস্থিতির সাথে মানানসই যেকোনো পোশাক।

❑ সাফল্যের সংজ্ঞা : বিনয়।

❑ প্রিয় খাবার : খিচুড়ি, ভাত, ডাল, লালশাক, মাছ, আচার, সালাদ, রুটি, শুটকি ভর্তা, আলু ভাজি, থাই স্যুপ, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চকলেট, জুস, আইসক্রিম, চটপটি, ফুচকা।

❑ নিজেকে বিশ্লেষণ করেন যেভাবে : প্রথমত... একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে। দ্বিতীয়ত... সব কিছুকে বেশিমাত্রায় সরল ভাবা। তৃতীয়ত... আমার জন্ম হয়েছে অনেকগুলো দায়িত্ব পালন করতে, সেটা পরিবার থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে। চতুর্থত... আমি এই পৃথিবীতে নিজের জন্য শুধু আসিনি। তাই প্রকৃতি,

www.pathagar.com

ঐতিহ্য, পশুপাখি, মানুষ আর লাল সবুজের বাংলার জন্য আমার ভালোবেসে গাজ করে যেতে হবে।

□ আপনার শিক্ষা জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন?

– এস. এস. সি- লালমাটিয়া (হাঃ সোঃ) বয়েজ হাইস্কুল; এইচ. এস. সি- াকা কলেজ; নাট্যকলা- থিয়েটার স্কুল; ডিপ্লোমা ইন গ্রাফিক্স এন্ড মাল্টিমিডিয়া- ানন্দ আই আই টি; অনার্স- দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, মাস্টার্স- আহসান ল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

মা সৈয়দা হোসনে আরা বেগমের সাথে লেখক

□ ক্যাম্পাসের শেষের দিনগুলো কেমন ছিল?

– শেষের বছরটি অনেক আনন্দময় ও রঙিন ছিল, যা আজও মিস করি।

□ ক্যাম্পাসে কোন কারণে আপনি সেরা ছিলেন?

– আহসান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত মবস্থায় ছাত্রদের বিপুল ভোটে নির্বাচিত প্রধান ছাত্র নেতার দায়িত্বে ছিলাম মামি। দীর্ঘ সময় থেকে প্রচলিত ছাত্রনেতাদের কার্যক্রমের ধারা থেকে বেরিয়ে ন্নয়ন ও গঠনমূলক কার্যক্রমে নিজেকে এবং শিক্ষার্থীদের সকলকে সম্পৃক্ত করতে পারায় সকলের প্রিয়জন ছিলাম।

□ ক্যাম্পাসে সেরা মুহূর্ত কোনটি?

– প্রথমত... প্রতিটি শিক্ষকসহ জনাব শরীফ সুলতান মাহমুদ এবং জনাব ফিজ স্যারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং শিক্ষার্থীদের সমস্যাদি তুলে ধরে সেগুলো সমাধানে এগিয়ে আসা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত... অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করা।

তৃতীয়ত... শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিনোদন কার্যক্রমের আয়োজনে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে সেগুলো স্মরণীয় করে রাখা।

চতুর্থত... আমার প্রিয় তিন বন্ধু রুহুল, অলিভিয়া আর বিপুর সাথে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত।

☐ একজন মানুষের কথা বলুন, যিনি সবসময় আপনাকে অনুপ্রেরণা দেয়?

– আমার আম্মা সৈয়দা হোসনে আরা বেগম।

☐ ৩টি কারণ বলুন যে জন্য নিজেকে ভালো মানুষ মনে হয়?

– প্রথমত... আমি স্বচ্ছ ও সুন্দর মনের মানুষ। দ্বিতীয়ত... নিজের লাভে জন্য কারও ক্ষতি করি না। তৃতীয়ত... চিন্তাও করতে পারি না, আমি কখনও কারও সাথে প্রতারণা করব।

☐ ৩টি দোষ, যা পাল্টাতে চান?

– প্রথমটি... কেউ প্রতারণা করলে/মিথ্যা কথা বললে ভয়ঙ্কর রেগে যাই।

দ্বিতীয়টি... সহজেই সবাইকে বিশ্বাস করি।

তৃতীয়টি... সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধায় ভুগি।

☐ প্রিয় শিক্ষা ব্যক্তিত্ব?

– ডক্টর মুহাম্মদ ফজলুল হক স্যার, মোহাম্মদ ইবনে ইনাম স্যার, শরীফ নুলতান মাহমুদ স্যার।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ঘেরা মিরপুরের উক্ত বাসস্থানে লেখক

www.pathagar.com

❑ সম্মাননা : সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য সাক্ষাৎকা প্রকাশিত হয়েছে, 'দ্যা ডেইলী স্টার' (দ্যা স্টার ম্যাগাজিন); ফর দ্যা লাভ অ নেচার (২৫.১২.২০০৯)। দৈনিক কালের কণ্ঠ (শুধুই ঢাকা); ঢাকায় নবা পরিবার (১৭.০৭.২০১০)। দৈনিক সমকাল (মেট্রো ঢাকা); নবাব পরিবারে অজানা কথা (০৩.১০.২০১০)। Daily Sun (Morning tea Magazine) Nawab's Descendant (15.07.2011).

সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে, ২৩ জুন ২০১২ তারিখের চ্যানেল আই-এ সংবাদগুলোতে, ntv-র 'জানার আছে বলার আছে' ১৯.০৯.২০১২ তারিখ পে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ২৮৫তম জন্মদিনে নবাবের নবম বংশধর হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি হিসেবে দর্শকরা দেখতে পান আমাকে। একই বছর ২৯/১০/২০১২-তে চ্যানেল আই এবং রেডিও ভূমি ৯2.8fm-এ প্রচারিত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'কৃষকের ঈদ আনন্দ'তে নবাবের নবম বংশধর হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। ২৩.০৬.১৩-তে Channel 24-এ মাহমুদুর রহমান মান্নার উপস্থাপনায় 'মুক্তবাক' টকশোতে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলাম।

কারবালার উক্ত ঐতিহাসিক নিদর্শনের পাশে লেখক

❑ প্রিয় সৈন্দর্যের দেশ?

– ইরান, ইন্ডিয়া, ইরাক, ভুটান, নেপাল, রাশিয়া।

❑ প্রিয় আপনজন :

– নবাব আলিবর্দী খান, সিরাজউদ্দৌলা, বেগম লুৎফুন্নিসা, আম্মা সৈয়দা হাসনে আরা বেগম, নানী গুলশান আরা বেগম।

www.pathagar.com

❒ প্রিয় সম্পর্ক :

– হৃদয়ের বন্ধন।

❒ প্রিয় টিভি চ্যানেল :

– Mtv, Animal Planet.

❒ আপনার খুবই প্রিয় একটি বিষয় পাঠক বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন?

– প্রিয় বিষয় ভালোবাসা ভালোবাসা ভালোবাসা। আর তাইতো পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জিনিসও ভালোবাসা। হতে পারে এটা প্রকৃতি, দেশ, ছেলে কিংবা মেয়ে বা অন্য আবেগের সম্পর্ক জড়িত মানুষের প্রতি। যেখানে শুধুই রয়েছে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালো লাগার স্থান।

জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাহমুদুর রহমান মান্নার টকশোতে নবাব সিরাজ পরিবারের নবম প্রজন্ম গোলাম আব্বাস

❒ সম্পর্কের ভালোবাসাকে অটুট বন্ধনে রাখতে কোন সব বিষয়ে আলোকপাত করবেন?

– পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আস্থা থেকেই অঙ্কুরিত হতে পারে যেকোনো সম্পর্কে ভালোবাসার এক নতুন অধ্যায়।

❒ সকালে ঘুম থেকে উঠেই কি করেন?

– পবিত্র সব নাম ও স্থাপনার ছবির ওপর দৃষ্টি দেই, পরে আম্মার ছবির সাথে কথা বলি।

❒ ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে জিনিসটি খুব বেশি প্রয়োজন?

– সততা। তবে বর্তমান সময়ে সৎভাবে বাঁচাটা একটু কঠিন, কিন্তু অসম্ভব

www.pathagar.com

নয়। বর্তমানে পৃথিবীতে সততা ও মেধার মূল্য কম। অসততা, অপকৌশলের মূল্য বেশি।

□ যে স্মৃতিটা কখনও ভোলো যায় না?

– আমার আম্মার সাথে কাটানো সেইসব সোনালি দিন রাত্রি। যার মাঝে ছিল কিছু হাসি, কিছু কান্না, আর কিছু পাওয়া না পাওয়ার গল্প কথা। যা হৃদয়ের গভীরতায় আজও অনুভব করি। আর বলতেই চাই Love u & Miss u Amma.

□ প্রায়ই খুব ইচ্ছে করে?

– লাল সবুজের বাংলায় এমন কিছু স্মরণীয় কাজ করে যেতে চাই, দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই। যখন থাকবো না এই পৃথিবীতে! তখন লাল সবুজের আকাশ বাতাস প্রকৃতির আর মানুষেরা নিজের দোয়া ও ভালোবাসায় যুগ যুগ মনে রাখবে আমায়।

□ ঐতিহ্যের তরুণ কণ্ঠ বর্তমান প্রজন্মকে কি বলতে চায়?

– প্রকৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, দেশ, সমাজ, পরিবারকে ভালোবাসুন হৃদয় থেকে R আমাদের তারুণ্যের সংগঠন "Shab" এর সাথে থাকুন। www.shabplus.yolasite.com এটি আমাদের ওয়েব সাইট। যে কেউ সম্পৃক্ত হতে পারেন আমাদের সাথে, ভালোবাসার বন্ধনে ঐতিহ্যের নতুন ইতিহাস রচনা করতে।

ঐতিহ্যের ফুল
সৈয়দা হোসনে আরা বেগম

বিশ্ব জুড়ে ৮ মার্চ যে নারী দিবস পালিত হচ্ছে। তার সূত্র একদিনে গড়ে ওঠেনি। ১৯০৩ সালে যুক্তরাজ্যে নারীমুক্তি আন্দোলন একটি আশাব্যঞ্জক মাত্রা অর্জন করে। সাংগঠনিকভাবে প্রথম নারী দিবস উদ্‌যাপিত হয় ১৯১১ সালের ১৯ মার্চ। জার্মানি, ডেনমার্কসহ আরো কিছু ইউরোপীয় দেশে যুগপৎভাবে উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সময়ের ধারাবাহিকতায় নারী অধিকারের বিস্তৃতি ঘটে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্ত জুড়ে। ১৯৭৫ সাল ছিল জাতিসংঘের নারী অধিকার দশক। এ বছরই প্রথম ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্বীকৃতি অর্জন করে। জাতিসংঘের এই স্বীকৃতিই নারী দিবসকে দেশে দেশে পরিচিত লাভ করার ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যায়। নারী তোমার জন্য... "নতুন প্রাণের স্পন্দনে পৃথিবীকে আলোড়িত কর তুমি। মানবসভ্যতাকে নিজস্ব কক্ষপথে চলার চিরন্তন প্রক্রিয়া রচিত হয় তোমার কল্যাণেই। কর্ম উদ্দীপনা দিয়ে পুরুষের সাফল্য নিশ্চিত করার গুরুভারটিও তোমার। আবার তোমার মাঝেই বসত গড়ে বেগম

www.pathagar.com

লুৎফুন্নিসা, শরফুন্নিসা, আমিনা বেগম, মাদার তেরেসা, রানী ভবানী, লতা মঙ্গেসকর, রাবড়ি দেবির মতো মহিয়সীরা যারা নিজেদের কর্ম দিয়ে পৃথিবীর বুকে রেখে গেছেন সফলতার স্বাক্ষর। এক জীবনে এতগুলো ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া ও সৎ সাহসের সঙ্গে ভূমিকাগুলো পালন করা কেবল তোমার পক্ষেই সম্ভব। তাই তুমি নারী এ তোমার অহঙ্কার। কুণ্ঠিত চিত্তে নয়; বরং বলিষ্ঠ কণ্ঠে বল তোমার এ গর্ব গাঁথার কথা। জন্মের পর থেকেই বিচিত্র সব চরিত্র ধারণ করে পথ চলতে হয় নারীকে। নানামুখী সম্পর্কের আভরণেই সমৃদ্ধ হয় নারী জীবন। কিন্তু নারীর এ ভূমিকাগুলো হোঁচট খায় সমাজের ছকে বাঁধা নিয়মের বেড়াজালে। তবুও কন্যা, জায়া, জননীর মতো নানা সম্পর্কের আভরণে নারী সবসময়ই অনন্যা, তাই অন্যরকম এক অভিবাদন নারী, শুধু তোমারই জন্য।" আমাদের এবারের আয়োজন ঐতিহ্যবাহী বেগম লুৎফুন্নিসা পরিবারের গর্বিত ৮ম প্রজন্ম সৈয়দা হোসনে আরা বেগমকে নিয়ে যিনি নিজের মেধা ও মননকে কাজে লাগিয়ে ঐতিহ্যের সৌরভ ছড়াচ্ছেন বাংলার সকল প্রাণে। তাঁর কথা জানাচ্ছেন ঐতিহ্যের ৯ম প্রজন্ম... এস. জি. আব্বাস আরেব ওরফে নবাবজাদা আলি আব্বাসউদ্দৌলা।

অল্প স্বল্প গল্প

* নাম : সৈয়দা হোসনে আরা বেগম।
* জন্ম তারিখ : ১৯ মার্চ।
* বাবার নাম : ডাক্তার সৈয়দ নাসির আলী মির্জা।
* মায়ের নাম : গুলশান আরা বেগম।
* স্বামীর নাম : প্রকৌশলী এস. জি. মোস্তফা।
* প্রিয় খাবার : হালাল সব খাদ্য।
* প্রিয় পোশাক : শাড়ি।
* প্রিয় চলচ্চিত্র : 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' এবং নিকাহ (সালমা আগা ও রাজ বাব্বার অভিনীত)।
* প্রিয় সংগীত : নিকাহ ফিল্মের সব শ্রুতি মধুর গান।
* প্রিয় মানুষ : আমার ছেলে আরেব।
* অবসর কাটে যেভাবে : পরিবারের সাথে।
* প্রিয় মুহূর্ত : ভোর বেলা। নামাজ পড়া; কোরআন শরীফ পড়া, এতে মনে শান্তি পাই। আর প্রকৃতি ও আপনজনের সেবায় কাটানো মুহূর্তগুলো বেশ উপভোগ করি।
* প্রিয় উক্তি : সদা সত্য কথা বলো, সত্যের পথে চলো।
* নিজেকে বিশ্লেষণ করেন যেভাবে : সবকিছুকে বেশি মাত্রায় সরল ভাবা।
* সাফল্যের সংজ্ঞা : সততা আর পরিশ্রম।

www.pathagar.com

* আপনি সিরাজের পত্নী বেগম লুৎফুন্নিসা পরিবারের কততম প্রজন্ম : ৯ম।

* ভালো রাঁধুনী হতে চাইলে যে ৩টি গুণ ভীষণ জরুরি : রান্নার ধৈর্য, যত্ন নিয়ে রান্না করার ইচ্ছা, আর সময় দেওয়ার সদিচ্ছা।

* সুযোগ মিললে যাকে সবার আগে নিজের রান্না খাওয়াতে চান : দরিদ্র মানুষদের।

* আপনার প্রিয় রান্নার উপাদান : তাজা শাক-সব্জি।

* আপনি নিজে যাঁর রান্নার ভক্ত : আমার আম্মা গুলশান আরা বেগম।

* যাঁর হাতে প্রথম হাতে খড়ি : আম্মার হাতে।

* প্রথম বিদেশ সফর : ইন্ডিয়া!

* যে রান্নাটি সবচেয়ে কঠিন মনে হয় : দেশি বিদেশি কোনো রান্নাই কঠিন মনে হয় না।

* প্রিয় স্বাদ : টক, ঝাল, মিষ্টি তিনটিই।

* প্রিয় মুখ : নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রিয়তমা স্ত্রী বেগম লুৎফুন্নিসা এবং আমার আম্মা গুলশান আরা বেগম।

* নিজের যে দিকটি বদলাতে চান : মানসিকভাবে আরও কঠিন হতে চাই, কিন্তু পারি না।

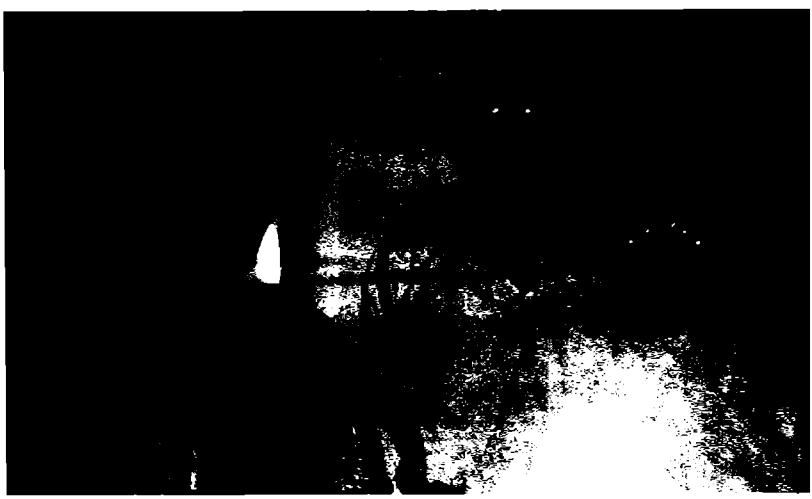

ঐতিহ্যের ফুল সৈয়দা হোসনে আরা বেগমের সাথে স্বামী সৈয়দ গোলাম মোস্তফা এবং শাশুড়ী নিখাত আরা

www.pathagar.com

* ঐতিহ্যবাহী নবাব পরিবারের গৃহবধূর কাছে উক্ত পরিবারের কিছু প্রিয় াদ ও গল্প কথা জানতে আগ্রহী আজকের নতুন প্রজন্ম : ঐতিহ্যবাহী বেগম লুৎফুন্নিসা ও নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নবাবিখানা'। একবার যিনি খেয়েছেন জীবনে ভুলবেন না। বিশেষ করে নবাবি াবাব স্বাদে অতুলনীয়। নবাবি খানা তৈরির জন্য যে সাজসরঞ্জাম এবং প্রশস্ত ায়গার প্রয়োজন তা ১০০ ভাগ নিখুঁত হওয়া চাই। সিরাজ পরিবারের প্রিয় নেক ধরনের নবাবি কাবাব আছে, তার মধ্যে দু'তিনটি স্বাদে অসাধারণ। যা এখনও নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ঐতিহ্যের প্রতীক। একটি হলো 'শাহি াবাব' ২য়টি 'নবাবি কাবাব'। নবাব আলিবর্দী ও সিরাজ আমলে গরুর মাংস দিয়ে 'শিক কাবাব' খুব জনপ্রিয় ছিল। এরপরে ভেড়ার মাংস কুচি কুচি করে কিমা তৈরি করে 'নবাবি কাবাব' এলো। সেকালের নবাবি খানা তৈরি করতে ায় ১০০ রকমের মশলা লাগে এবং ১টি পদ রান্নায় সময় যায় কয়েক ঘণ্টা। মালিবর্দী ও সিরাজ আমলের আর ১টি বিখ্যাত খাবার 'নামশ'। সুগন্ধি ঘন ুধের ওপরে জাফরান এবং কাজু, কিসমিস, আখরোট, মধু এবং সর্বোপরি রূপালী তবকে মোড়া অনির্বচনীয় স্বাদ যেন অমৃত। মিষ্টির মধ্যে 'কুলফি' আর একটি অনবদ্য জিনিস। সুগন্ধি মিঠে পান নবাব আলিবর্দী খান ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার আর ১টি বিখ্যাত ঐতিহ্যের প্রতীক। সিরাজ পরিবার এখনও সেই নবাবি ঐতিহ্য ধরে রাখার ব্যাপারে খুবই একনিষ্ঠ।

উক্ত ছবিতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা, সৈয়দা হোসনে আরা বেগম, নবাব আলিবর্দী খান, নবাবজাদা আলী আব্বাসউদ্দৌলা এবং বেগম লুৎফুন্নিসা

www.pathagar.com

নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে আজও এই পরিবারের নতুন প্রজন্মরা যথেষ্ট যত্নশীল। তাইতো এই পরিবারের সদস্যদের আচার-আচরণ কথা বলার ভঙ্গি এতটাই সুন্দর যে, যে কারো দৃষ্টি সহজেই আকর্ষিত হয়। আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী পরিবারের আদব-কায়দায় নবাবি আচার-ব্যবহারের সব রকম সৌরভ ও শিল্পরুচির প্রকাশ পায়।

সিরাজ পরিবারের ঐতিহ্য চারু কারুশিল্প, স্বচ্ছ যেকোনো বস্ত্রের ওপর নিখুঁত হাতের কাজ এক কথায় অনবদ্য। চিকনকারী মূলত হাতের কাজ, এক একটি শাড়ি এবং কুর্তা পায়জামায় ভরাট চিকনের কাজ করতে কম করে সময় লাগে ৬/৭ মাস। এ কাজে নবাব পরিবারের নারীরা অত্যন্ত পারদর্শী। নবাব আলিবর্দী ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার পছন্দের কয়েকটি পদ... নাওয়াবী চাঁদনী : এই ডিশটি আমাদের নবাব পরিবারে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই নবাবি খানা নবাব আলিবর্দী-সিরাজউদ্দৌলা খেতেন পূর্ণ চাঁদের রাতে দুগ্ধ সফেন পাত্রে।

শাহী স্যুপ : ঘনদুধ, পেস্তা বাদাম এবং হোয়াইট সসের মিশ্রণে তৈরি হয় এটি।

নবাবে শাহী ক্ষীর : ঘন দুধের মধ্যে সুগন্ধি সরুচাল, কাজু, কিসমিস, পেস্তা সামান্য মাখন এবং সুগন্ধির জন্য ঈষৎ আতর ব্যবহার করা হয়। এটি অনেকটা পায়েসের মতো।

শাহী কাবাবে আফতাবি : কুচানো চিজ, আলু সেদ্ধ, ডিম, চিজসসস এবং দারুণ সুগন্ধি কিছু মশলা দিয়ে এই কাবাব তৈরি করতে হয়। চুলোর আঁচ খুব অল্প থাকে। সঙ্গে পুদিনার চাটনি দিয়ে পরিবেশন করতে হয়।

মুর্গ লাখন ভি : ১টি আস্ত মুরগি আদা এবং রসুন বাটা দিয়ে ঘন করে মাখিয়ে কিছুক্ষণ রাখতে হয়। রান্নার পরে কাজু বাদাম কুচি, নারিকেল কুচি দিয়ে, উপরে সুদৃশ্য রূপালী তবকের সাহায্যে পরিবেশন করা হয়।

এই হলো আমাদের ঐতিহ্যবাহী বেগম লুৎফুন্নিসা ও সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের আদাব, প্রিয়পদ-এর সৌন্দর্য এবং ঐতিহ্য। পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী এই পরিবারের পছন্দের কিছু মেন্যু আপনাদের বিস্তারিত বলতে চাই...

তরমুজের শরবত : চার বাটি তরমুজ, ১ কাপ চিনি, ৪/৫ টি কাগজী লেবু পাতা। তরমুজের লাল অংশটি সুন্দর করে কেটে ব্লেন্ডারে দিতে হবে, সাথে সামান্য পানি এবং চিনি দিলে ভালো হয়। তৈরি কৃত শরবতে কিছুক্ষণ লেবু পাতা ডুবিয়ে রাখার পর, পাতাগুলো তুলে নিতে হয়। আর এর পরেই নবাব পরিবারের আপনজনদের জন্য পরিবেশন করা হয় ঠাণ্ডা তরমুজের শরবত।

www.pathagar.com

কাঁচা আমের শরবত : কাঁচা আম-৪টি, চিনি-৪ টেবিল চামচ, লবণ-পরিমাণ মতো, জিরা ভাজা গুঁড়া- আধা চা চামচ, মরিচ ভাজা গুঁড়া- আধা চা চামচ, পানি-১ কাপ। কাঁচা আম ফালি করে কেটে সিদ্ধ করে নিতে হয়। সিদ্ধ আম লবণ চিনি জিরা ভাজা গুঁড়া মরিচ আর পানি একসাথে মিশিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করার পর বরফ কুচি দিয়ে নবাব পরিবারের আপনজনদের সামনে পরিবেশন করা হয়।

আমের রায়তা : কাঁচা পাকা আম- ৬টা, দই- ২ টেবিল চামচ, লবণ পরিমাণ মতো, জিরা ভাজা গুঁড়া- আধা চা চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি- ১ চা চামচ, ধনে পাতা কুচি- সামান্য, সাদা সরিষার গুঁড়া আধা চা চামচ। এবার আম পাতলা স্লাইস করে কেটে, একটা পাত্রে দই লবণ ফেটে নিতে হবে। তারপর আমের স্লাইস কাঁচা মরিচ কুচি পরিবেশন পাত্রে নিয়ে সাদা সরিষা গুঁড়া ও জিরা ভাজা গুঁড়া ছিটিয়ে পরিবেশন করে থাকি।

আমের মিষ্টি আচার : কাঁচা আম- ৮টা, হলুদ গুঁড়া- ১চা চামচ, লবণ পরিমাণ মতো মরিচের গুঁড়া- ১চা চামচ, আখের গুঁড়া- ১ চা চামচ, পাঁচফোড়ন- ১ চা চামচ, চিনি পরিমাণ মতো। কাঁচা আম শক্ত দেখে বেছে নিয়ে কুরিয়ে নিতে হয়। কোরানো আম হলুদ মাখিয়ে.... চুলায় সরিষার তেল গরম হলে পাঁচফোড়ন, আখের গুড়, আম কোরানো, মরিচের গুঁড়া ও লবণ দিতে হয়। ৮/১০ মিনিট জ্বাল করে প্রিয়জনদের পরিবেশনের উপযোগী হয়ে যায়।

ফিশ স্যুপ : নবাব পরিবারের আপনজনদের পছন্দের মাছ নির্ধারণের পর, কাঁটা ছাড়া মাছের টুকরা ২৫০ গ্রাম, চিংড়ি মাছ ১০০ গ্রাম, কচি লেটুস পাতা ৪/৫ টি, ধনে পাতা ১ আঁটি, পিঁয়াজ পাতার গাছ ২টি, সয়াসস ১টি-চা, গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ, স্বাদ নুন ১টা-চামচ, লবণ। এবার দেড় লিটার পানিতে মাছের কাঁটা ও চামড়া দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে। পানি ১লি হলে নামিয়ে ছেঁকে নিতে হয়। তৈরি হলো মাছের স্টক। চিংড়ি ছোট করে কেটে ধুয়ে ফেলতে হবে। মাছের স্টক হাঁড়িতে করে চুলায় চাপিয়ে ফেললাম। স্টক টগবগ করে ফুটতে শুরু করলে মাছ পিঁয়াজ পাতা, সয়াসস, লবণ, গোলমরিচ গুঁড়া ও ১ চা চামচ তেল দিলাম। লেটুস পাতা ধুয়ে মিহি করে কুচিয়ে রাখলাম। প্রতিটি স্যুপের বাটিতে ২ টে চামচ করে লেটুস পাতা কুচি দিলাম। আর স্যুপ রান্না শেষে প্রিয় পরিবারের আপনজনের বাটিতে স্যুপ ঢেলে ধনে ও পিঁয়াজ পাতা কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করলাম। হলো না সব নবাবি ব্যাপার স্যাপার।

www.pathagar.com

ঐতিহ্যের তারকা প্রোফাইল
সৈয়দ গোলাম মোস্তফা

বলা হয় যে কর্কট রাশির জাতকদের বোঝা প্রায় অসম্ভব। যেকোনো আড্ডায় এদের গুরুত্ব দিলে এরা খুশি হয়। ভালোবাসার সঙ্গী হিসেবে পাশে কেউ না থাকলে, দ্রুত সময়ের মধ্যে পাশে কেউ চলে আসে। কর্কটদের সেন্স অব হিউমার খুব প্রখর। তাই যেকোনো কিছু এরা সহজেই সমাধান করতে পারে। এদের আবেগ, মেজাজ-মর্জি বুঝার সহজাত ক্ষমতা আছে। ফলে সঙ্গীকে আগে থেকে এরা বুঝে ফেলে। সঙ্গীর মেজাজ মর্জি বুঝলেও অনেক ক্ষেত্রে এরা নিজেরাই নিজেদের মেজাজ মর্জি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জলীয় বৈশিষ্ট্যের কর্কট সহজে প্রবাভিত হয়। এরা সংবেদনশীল, মধ্যপন্থী, তবে বেশ কল্পনাপ্রবণ। অনমনীয়তা তাদের চরিত্রের ১টি বৈশিষ্ট্য বলে এরা ক্ষমাশীল নয়। দুঃখ এদের কাছে অতি সহজেই ধরা দেয়। এতো গেল রাশির কথা। রাশি আর বাস্তবে কত মিল চলুন দেখি। আমাদের এবারের আয়োজন কর্কট রাশির জাতক ইঞ্জিনিয়ার এস. জি. মোস্তফাকে নিয়ে। তিনি ছোটবেলায় খুব দুরন্ত ছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা আর গল্পের বইয়ের দিকেই আগ্রহটা বেশি ছিল তাঁর। মনের চাওয়াগুলো বরাবরই প্রাধান্য পেত তার কাছে। অজানাকে জানার আগ্রহটা তার ছিল খুব বেশি। অনেক তুচ্ছ ব্যাপারেও আলোড়িত হতো তার চিন্তার জগৎ। এই জানার স্পৃহাই তাকে নিয়ে আসে সফলতার দ্বারপ্রান্তে। আর এই ঐতিহ্যবাহী নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৮ম বংশধরকে মুখোমুখি পেয়ে আলাপচারিতায় তার কথা আপনাদের মাঝে তুলে ধরছেন ঐতিহ্যের ৯ম প্রজন্ম এ. জি. আব্বাস আরেব ওরফে নবাবজাদা আলি আব্বাসউদ্দৌলা।

এক নজরে ঃ

সৈয়দ গোলাম মোস্তফা।

আম্মা : নিখাত আরা।

আব্বা : গোলাম মুর্তজা।

স্ত্রী : সৈয়দা হোসনে আরা বেগম।

যেই নামে বেশি পরিচিত : ইঞ্জিনিয়ার এস. জি. মোস্তফা।

জন্ম : ৬ জুলাই ১৯৪৬ দু'বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে। রাশি : কর্কট।

উচ্চতা : ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি। প্রথম স্কুল : লোকনাথ হাইস্কুল, রাজশাহী।

চাকরি জীবনের শুরু : প্রথমে শিক্ষকতা পরে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন।

www.pathagar.com

যা কিছু প্রিয়

❑ রং : মেরুন

❑ শখ : ঘুরে বেড়ানো।

❑ স্বপ্ন : সুখে-দুঃখে গরিব ও বিপদগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের উন্নয়নে আজীবন সাহায্য-সহযোগিতা করে যাওয়া।

❑ খারাপ লাগে : বিশ্বাসঘাতকতা।

❑ সেরা সাফল্য : চাকরি জীবনে যেকোনো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে প্রত্যেকটিতে সফল হয়েছি।

❑ স্বীকৃতি : জাপানিরা ৮০-র দশকে পি.ডি.বি-তে কর্মরত অবস্থায়, আমার কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠানে উচ্চ সম্মানিতে কাজের প্রস্তাব দেয়। তাদের মতে "আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার মতো প্রথম বাংলাদেশি তুমি।"

ছবিতে ঐতিহ্যের তারকা সৈয়দ গোলাম মোস্তফার সাথে স্ত্রী সৈয়দা হোসনে আরা বেগম

❑ কখনো ভুলব না : আমার আম্মা এবং স্ত্রী সৈয়দা হোসনে আরার কথা। তাঁদের মতো গুণী মহিলা আমার জীবনে আজও দেখিনি।

❑ ব্যক্তিত্ব : নবাব আলিবর্দী খান।

❑ পোশাক : পরিস্থিতির সাথে মানানসই সব কিছু।

❑ চলচ্চিত্র : নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং নিকাহ (হিন্দি ফিল্ম)।

www.pathagar.com

☐ পরিবার : আপনজনকে ঘিরে (২ ছেলে, ২ মেয়ে, স্ত্রী)।

☐ ইঞ্জিনিয়ার নাহলে : আর্মি অফিসার হতাম।

☐ প্রিয় উক্তি : আমানতের খেয়ানত করো না।

☐ অবসর কাটে যেভাবে : দুঃখী মানুষের সেবা করে।

☐ সাফল্যের সংজ্ঞা : নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারা।

☐ নিজেকে বিশ্লেষণ করেন যেভাবে : খুবই সাধারণ মানুষ যে সর্বদা কাজ করতে ভালোবাসে।

☐ নিজের সম্পর্কে আপনার যে বিশ্বাসটি খুব প্রবল?—কাজ। শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছি, প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করেছি। এখনও কাজ করছি। কাজই আমার জীবন।

☐ শৈশবে কৈশোরে ও তারুণ্যে যে মানুষটিকে নায়ক মনে হতো।- ১৭২৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলার কোলে জন্মগ্রহণকারী, বাংলার বীর পুত্র সিরাজউদ্দৌলা। তাঁকে আজও নায়ক মনে হয় এবং তিনিই বাংলার প্রকৃত নায়ক।

☐ যে অপ্রাপ্তিটা মাঝে মধ্যে বিষণ্ন করে আপনাকে। - কই তেমন কোনো অপ্রাপ্তি তো দেখিনা। যা হতে চেয়েছিলাম, হয়েছি।

☐ আপনার সাফল্যের পেছনের কারণ বলবেন কি?

– অধ্যবসায়, সততা, আম্মার দোয়া, স্ত্রীর দোয়া ও অনুপ্রেরণা।

☐ যে উপদেশটি সবসময় মেনে চলার চেষ্টা করেন— মানবসেবা, মানবসেবা আর মানবসেবা।

☐ সুযোগ পেলে যে অভ্যাসটি বদলাতে চান?- বদলানো নয়। তবে অতীতে ফিরে যেতে পারলে সবকিছু আরও মসৃণভাবে করতাম।

☐ সারাদিনের ক্লান্তি শেষে ঘুমানোর আগে যে কথাটি মনে হয়।- আরও ১টি দিন জীবন থেকে চলে গেল।

☐ আপনার প্রিয় ৩টি মুখ- স্ত্রী সৈয়দা হোসনে আরা বেগম, শাশুড়ি গুলশান আরা বেগম আর পুত্র এস. জি আব্বাস আরেব।

☐ যে স্বপ্নটা প্রায় দেখেন- মানব কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া।

☐ নিজের সবচেয়ে ভালো দিক- অন্যদের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করি।

☐ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য দরকার : ভালোবাসা ও সহযোগিত করার মানসিকতা।

www.pathagar.com

ঐতিহ্যের মিষ্টি আলো
গুলশান আরা বেগম

গুলশান আরা বেগম ১৫.৫.১৯১৯ইং সালে ভারতের বর্তমান 'গোয়া' রাজ্যের একটি ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গোলাম আব্বাস। মাতার নাম রওশন আরা বেগম। আর তিনি বাংলার দেশপ্রেমী বীর নবাব সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রী বেগম লুৎফুন্নিসা ও তাঁর ভাই ইরান খান বংশধারার ৭ম গর্বিত বংশধর। খুব অল্প বয়সে তিনি ডাক্তার ও উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী সৈয়দ নাসির আলী মির্জার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর তিনি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় তাঁর স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁদের বৈবাহিক জীবনের প্রথম সন্তান মোবারক হোসেনের জন্ম হয় ১৯৫৩ সালে। ১৯৫৬ সালে একমাত্র কন্যা সন্তান সৈয়দা হোসনে আরা বেগম এর জন্ম হয়। তাঁদের কন্যা সৈয়দা হোসনে আরা বেগমের স্বামী সৈয়দ গোলাম মোস্তাফা একজন স্বনামধন্য প্রকৌশলী হিসাবে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। সৈয়দ গোলাম মোস্তাফা বাংলার বীর নবাব সিরাজউদ্দৌলা রক্তধারার সরাসরি ৮ম বংশধর। সৈয়দা হোসনে আরা বেগম এবং প্রকৌশলী সৈয়দ গোলাম মোস্তাফা দম্পতির কৃতি সন্তান সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেব ওরফে নবাবজাদা আলি আব্বাসউদ্দৌলা। গুলশান আরা বেগম অসংখ্যা মানুষের কর্মসংস্থান করেছিলেন। তিনি সাহসিকতার সঙ্গে দো-নলা বন্দুক চালাতে পারতেন বাড়ির নিরাপত্তার স্বার্থে। তিনি তাঁর সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। তাঁর একমাত্র পুত্র মোবারক হোসেন নিঃসন্তান। গুলশান আরা বেগম ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। সর্বদা নিয়মমাফিক নামাজ ও কোরআন তেলোয়াত করতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর, যা কিনা বয়সের সাথে বিন্দুমাত্র লোপ পায়নি। তাঁর বুদ্ধিমত্তা তার সন্তাদের এবং আপনজন প্রিয়জনদের মধ্যে অমর হয়ে আছে, থাকবে। তিনি কখনো কাউকে কষ্ট দেননি। দু'হাত তুলে সব সময় তিনি, সবার জন্য দোয়া করতেন এবং কেউ তাকে সালাম করলে মাথায় হাত দিয়ে আশির্বাদ করতেন।

মানুষের জন্য কাজ করে যে আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায়, সেই শিক্ষাটা তিনি অর্জন করেছেন পরিবার থেকেই। ঐতিহ্যবাহী বেগম লুৎফুন্নিসা পরিবারের সকলেই মানুষ-পরিবেশ-প্রকৃতি নিয়ে কাজ করেছেন সারাজীবন। সেই ধারাবাহিকতায় তিনিও জড়িয়েছিলেন মানব কল্যাণমূলক সব কাজে। সংসার সামলে তিনি সীমিত পরিসরে মানবসেবামূলক স্মরণীয় বেশকিছু কাজ করেছেন। পোশাকের বেলায় গুলশান আরা বেগম সবসময় বেছে নেন দেশীয় পোশাক। তাঁর পোশাকের নকশাগুলো ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে। নিজ হাতে তৈরি হস্তশিল্পের জন্য সকলে তাঁর প্রশংসা করেন। এছাড়া তিনি নানা ধরনের বাহারি রুপার গয়না পরতেন। ছবি আঁকায় খুঁজে পান আনন্দ। আঁকা শুরু করলে কখন

www.pathagar.com

যে সকাল থেকে সন্ধ্যা গড়িয়ে যায় বুঝতে পারেন না। তাঁর অতীত কর্মজীবনের দিকে দেখলে বোঝা যায় ব্যস্ত থাকতেই বেশি পছন্দ করতেন মহীয়সী এই নারী। শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও চলেছে প্রকৃতির মাঝে ঘোরাঘুরি। ঘাস, ফুল, নদী, পাহাড়, হ্রদ আর ঝরণা ছিল তাঁর প্রিয়জন। ছোটবেলা থেকেই এগুলোর প্রতি তাঁর প্রবল টান ও আকর্ষণ ছিল। তাইতো জীবনের অধিকাংশ সময় প্রকৃতির সেবায় কাটিয়েছেন। মহীয়সী এই নারী ১৯৭৫ সালের ২৪ মে মায়ার এই পৃথিবী থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে অন্য এক অজানা ভুবনে চলে যান। ঐতিহ্যবাহী বেগম লুৎফুন্নিসা বেগমের ৭ম রক্তধারা গুলশান আরা বেগম বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় সংলগ্ন ইস্পাহানি কারবালা ইমামবাড়া মসজিদের পাশ ঘেঁষেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। তিনি চলে গেছেন ঠিকই তবুও তিনি রয়ে গেছেন সকলের হৃদয়ের গভীর কোণে, বছরের পর বছর, মাসের পর মাস, দিবা নিশি, ক্ষণে ক্ষণে।

বাংলার গর্ব নবাব সিরাজ পরিবারের স্মরণীয় দিবসসমূহ

স্বামী-স্ত্রী	◇	নবাব আলিবর্দী খান (জন্ম: ১৯.৯.১৬৭৪ইং; মৃত্যু: ১০.৪.১৭৫৬ইং)
	◇	শরফুন্নিসা বেগম (জন্ম: ১৫.৫.১৬৭৮ইং; মৃত্যু: ২৪.৫.১৭৬৬ইং)
স্ত্রী-স্বামী	□	আমিনা বেগম (জন্ম: ১৯.৩.১৬৯৯; মৃত্যু: ১০.১.১৭৬৬ইং)
	□	হাশেম জায়েন উদ্দিন (জন্ম: ৬.৭.১৬৮৭; মৃত্যু: ২.৭.১৭৫২ইং) (পিতা- মির্জা আহমদ ওরফে হাজী আহমদ- নবাব আলিবর্দীর বড় ভ্রাতা; মাতা- আমিনা বেগম)
পিতা-পুত্র	▷	ইকরামউদ্দৌলা (জন্ম: ৩১.১২.১৭২৯; মৃত্যু: ২৪.৫.১৭৫৩ইং)
	▷	মুরাদউদ্দৌলা (জন্ম: ১৯.৯.১৭৫৩ইং; মৃত্যু: ২.৭.১৭৯৫ইং)
স্বামী-কন্যা	❐	নবাব মনসুরুল মুলক মীর্জা মোহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলা বাদশাহ কুলি খান হায়বত জঙ (জন্ম: ১৯.৯.১৭২৭ ইং; মৃত্যু: ২.৭.১৭৫৭ইং)
	❐	বেগম লুৎফুন্নিসা (জন্ম: ১৯.৯.১৭৩৪ইং; মৃত্যু ১০.১০.১৭৮৬ইং)
	❐	উম্মে জোহরা (জন্ম: ৩১.১২.১৭৫৩ইং; মৃত্যু ২৪.৫.১৭৯২ইং) (নবাব সিরাজ বংশের প্রথম চেরাগ)
নবাব সিরাজের বংশধর	২য়▽	শমশের আলী খান (জন্ম: ৭.১.১৭৮০ইং; মৃত্যু: ১০.১.১৮২৬ইং)
	৩য়▽	সৈয়দ লুৎফে আলী (জন্ম: ৮.১.১৭৯৭; মৃত্যু: ১০.১.১৮৩৩ইং)
	৪র্থ▽	ফাতেমা বেগম (জন্ম: ৬.১.১৮১৯; মৃত্যু: ১৮.১০.১৮৭০ইং)
	৫ম▽	হাসমত আরা বেগম (জন্ম: ১.১.১৮৪৯ইং; মৃত্যু: ২.৮.১৯৩১ইং)
	৬ষ্ঠ▽	সৈয়দ জাকি রেজা (জন্ম: ৩১.১২.১৮৬৮; মৃত্যু: ২৬.৯.১৯৩৪ইং)
	৭ম▽	গোলাম মোর্তজা (জন্ম: ১৭.১০.১৯১০ইং; মৃত্যু: ১৯.৭.১৯৯২ইং)
	স্ত্রী	নিখাত আরা (জন্ম: ১৫.৫.১৯১৯; মৃত্যু: ৪.৪.২০০৩ইং)

www.pathagar.com

◈	নবাব আলিবর্দী খান ১৭৪০ সালের ১৪ এপ্রিল বাংলার মসনদে বসেন।
◈	বাংলার যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলা ও ইকরামউদ্দৌলার বিবাহ সম্পন্ন হয় ১৭৪৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি।
◈	যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলা বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব হন ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল। আনুষ্ঠানিকভাবে নবাব হন একই সালের ১৪ এপ্রিল।
◈	নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও বেগম লুৎফুন্নিসা দম্পতির একমাত্র কন্যা উম্মে জোহরার বিবাহ সম্পন্ন হয় আপন চাচাতো ভাই মুরাদউদ্দৌলার সাথে, ১৭৬৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি।
◈	নবাব সিরাজউদ্দৌলা রক্তধারার ৮ম বংশধর সৈয়দ গোলাম মোস্তাফা এবং বেগম লুৎফুন্নিসা রক্তধারার ৮ম বংশধর সৈয়দা হোসনে আরা বেগমের এক ঐতিহাসিক বিবাহ সম্পন্ন হয় ১৪.৭.১৯৭০ইং সালে।
◈	ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ গোলাম মোস্তাফার জন্ম ৬.৭.১৯৪৬ইং।
◈	নবাব সিরাজউদ্দৌলা রক্তধারার ৯ম প্রজন্ম সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেব ওরফে নওয়াবজাদা আলি আব্বাসউদ্দৌলার জন্ম ৪ আশ্বিন ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে।

ঐতিহ্যবাহী বেগম লুৎফুন্নিসা পরিবারের স্মরণীয় দিবসসমূহ

১ম বংশধর	বদরুন্নিসা বেগম (পিতা: ইরান খান; ফুফু: নবাব সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রী বেগম লুৎফুন্নিসা; স্বামী: মুরাদউদ্দৌলা- সিরাজউদ্দৌলার ভ্রাতুষ্পুত্র) জন্ম: ৩১.১২.১৭৫৩ইং; মৃত্যু: ১০.১১.১৭৯৯ইং।
২য় বংশধর	উলফাতুন্নিসা বেগম (জন্ম: ৭.১.১৭৯৪ইং; মৃত্যু: ১০.১.১৮২৯ইং)
৩য় বংশধর	সৈয়দ হাদী রেজা (জন্ম: ৮.১.১৮১৫; মৃত্যু: ১০.১.১৮৬৭ইং)
৪র্থ বংশধর	তিলাত আরা বেগম (জন্ম: ৬.১.১৮৪৫ইং; মৃত্যু: ১০.১.১৯২৯ইং)
৫ম বংশধর	শাহজাদি বেগম (জন্ম: ১৯.১.১৮৬৪; মৃত্যু: ২৪.৫.১৯৩০ইং)
৬ষ্ঠ বংশধর	রওশন আরা বেগম (জন্ম: ১৫.৫.১৯০৬; মৃত্যু: ১০.১১.১৯৮৮ইং)
৭ম বংশধর	গুলশান আরা বেগম (জন্ম: ১৫.৫.১৯১৯ইং; মৃত্যু: ২৪.৫.১৯৭৫ইং)
৮ম বংশধর	সৈয়দা হোসনে আরা বেগম (জন্ম: ১৯.৩.১৯৫৬ইং; মৃত্যু: ১০.১.২০০১ইং)

www.pathagar.com

সমকালীন প্রতিক্রিয়া

■ সিরাজউদ্দৌলার নাম মনে হতেই হৃদয়ে অনুরণন করবে কিছু অনুভূতি- তা দুঃখের আর একই সাথে গৌরবের। তাঁর দেশপ্রেম বাঙালি জাতির প্রেরণার এক গভীর উৎস। নবাব পরিবারের নবম উত্তরাধিকার সৈয়দ গোলাম আব্বাস- তিনি তাঁর লেখায় সিরাজউদ্দৌলার অনেক অজানা বিষয় আমাদের কাছে উন্মোচন করেছেন। আমার বিশ্বাস নতুন প্রজন্ম তাতে উপকৃত হবে।

— ইয়াসমিন সুলতানা
যুগ্ম সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
yasminsultana99@gmail.com

■ নবাব সিরাউদ্দৌলার নবমতম বংশধর সৈয়দ গোলাম আব্বাসকে প্রথমে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি তার লেখনী প্রতিভার সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি এবং এটা প্রত্যাশা রইল যে তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারের ইতিহাস, ঐতিহ্যকে যথাযথভাবে সুসংরক্ষণ করবেন। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বইটি যিনি প্রকাশ করেছেন তাঁকে; প্রকাশক শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ জুম্মা ভাইকে।

০৭.০৬.১৫
— উম্মুল খায়ের
ঔপন্যাসিক, কবি

■ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় এ অঞ্চল। সেই অবস্থা থেকে উঠে আসতে প্রায় ২০০ বছর পার করতে হয়েছে জাতিকে। কিন্তু নবাব সিরাজউদ্দৌলা এক বছরের শাসনামলে দেশ-জাতি- মানুষের জন্য যে ভালোবাসা দেখিয়ে ছিলেন তা অব্যাহত রাখতে পারলে হয়ত এ অঞ্চলের মানুষ অনেক আগেই আরো এগিয়ে যেত। নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৯ম বংশধর এস. জি. আব্বাসের সঙ্গে দেখা এবং আলাপচারিতায় তার দৃপ্ত প্রত্যয় দেখলাম। নবাবের আদর্শকে তিনি ছাড়িয়ে দিতে চান নতুন প্রজন্মের কাছে। তার হাতে হাত রেখে এই উদ্যোগকে এগিয়ে নেয়া উচিত আমাদেরও।

— সঞ্জয় চাকী,
সিনিয়র সাংবাদিক
চ্যানেল আই, বাংলাদেশ
২১.৬.২০১২ইং

www.pathagar.com

নবাব সিরাজউদ্দৌলা এক নামে এই বিশেষণগুলোতে পরিচিত; যথা বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব। যখন তিনি পলাশীর প্রান্তরে পরাজিত হন, তখন তিনি অতি তরুণ ছিলেন। তার অল্প কয়েকদিন পর যখন তাঁকে হত্যা করা হয়, তখনও তিনি তরুণ ছিলেন। লক্ষ লক্ষ স্বাধীনচেতা বাঙালির মানসপটে তিনি এখনও তরুণ। তাঁকে যেই অঞ্চলের নবাব আমরা কল্পনা করছি সেই অঞ্চলটির পরিচয় আজকের প্রজন্মের জন্য একটুখানি তুলে ধরি। আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের পুরো অংশ, আজকের স্বাধীন ভারতের অন্যতম প্রদেশ যার নাম পশ্চিমবঙ্গ তার পুরো অংশ, আজকের স্বাধীন ভারতের অন্যতম দুটি প্রদেশ যথাক্রমে বিহার ও উড়িষ্যার দুই তৃতীয়াংশ এবং আজকের স্বাধীন ভারতের অন্যতম প্রদেশ আসামের পশ্চিম অঞ্চলের ক্ষুদ্র অংশ। নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদে।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার নবম বংশধর সৈয়দ গোলাম আব্বাস-এর সঙ্গে পরিচয় হলো আগস্ট ২০১৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে। গোলাম আব্বাস বাংলার প্রতিটি হৃদয়ের আপনজন। সিরাজউদ্দৌলা শুধু গোলাম আব্বাসের পূর্বপুরুষ নয়। সিরাজউদ্দৌলা, আমার মতে, মুক্তিকামী সকল বাঙালির আত্মার পূর্বপুরুষ। আমি ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা। আমার আত্মার পূর্বপুরুষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা। সিরাজউদ্দৌলার স্মৃতি, নাম, পরিচয়, ইতিহাস, ঘটনা, বর্ণনা এমনকি কেশাগ্র নিয়েও যেকোনো সমালোচনা আমার আত্মাকে, আমার চেতনাকে আঘাত করে। পলাশী আমার সমস্ত চিন্তা-চেতনাকে আবৃত করে রেখেছে। পলাশীকে যারা কলঙ্কিত করেছিল, পলাশীর ষড়যন্ত্রকারীকে যারা ঘৃর্ণাক্ষরেও স্মরণ করে, অনুসরণ করে, চিন্তা করে, এমনকি প্রতিস্থাপন করে, আমি তাদেরকে ঘৃণা করি। ১০ মে ১৯৯৩ থেকে ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৫ পর্যন্ত সময়কাল আমি চট্টগ্রাম মহানগর থেকে দশ কিলোমিটার উত্তরে ভাটিয়ারিতে অবস্থিত বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির'র কমান্ডান্ট ছিলাম। আমি এগারোতম কমান্ডান্ট এবং প্রথম প্রত্যক্ষ নিয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডান্ট ছিলাম। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার অবদান রেখে আসার জন্য মনের আকুতি ছিল। তাই একাডেমির প্রাঙ্গণে সৃষ্টি করে এসেছি, ভাস্কর অলক রায়ের সাহায্যে, স্বাধীনতা মানচিত্র নামক ভাস্কর্য। তার পাশেই আছে পলাশীর আম্রকাননের প্রতিচিত্র। যেখানে ২৩টি আম গাছ আছে। ভাটিয়ারিতে প্রশিক্ষণরত ক্যাডেটগণ যেন সর্বদাই মনে করতে পারেন যে, পলাশীর আম্রকাননে স্বাধীনতার সূর্য অস্ত গিয়েছিল।

গোলাম আব্বাসের প্রতি আমার ব্যক্তিগত ভালোবাসা এবং আবেগের সূত্র একটিমাত্র কারণে, তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলার বংশধর। একবিংশ শতাব্দীর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, যেমনই বঙ্গবীর আতাউল গণি ওসমানীর বাংলাদেশ, যেমনই জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের বাংলাদেশ,

www.pathagar.com

যেমনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ, তেমনই এবং পুনশ্চ অবশ্যই তেমনই নবাব সিরাজউদ্দৌলারও বাংলাদেশ।
ঐতিহ্যের নব যুবরাজ এবং তাঁর গবেষণাধর্মী এই প্রকাশনার সর্বাধিক সাফল্য কামনা করি।

— মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি
বাড়ি নম্বর : ৩২৫, লেইন নম্বর: ২২, ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা
ইমেইল : mgsmibrahim@gmail.com
৪.৯.২০১৩ইং

যে মহান ব্যক্তিটির সাথে আমাদের বাঙালি জাতির ভাগ্য গাঁথা হয়ে গেছে তিনি হলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। আগ্রাসী কূটকৌশলী ইংরেজ ও দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের হাতে নবাবের পতন কেবল একটি ব্যক্তির পতন ছিল না, উনার পতনের সাথে সাথে আমাদের জাতিরও পতন ঘটে। একটি জাতির যখন উন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে তখন জাতিটিকে স্বাধীন জাতি বলা যাবে, কিন্তু জাতিটির যদি ক্রমাগত অবনতি ঘটতে থাকে তখন সেই জাতিটিকে পরাধীন জাতি বলতে হবে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পর থেকে জাতির ক্রমাগত অবনতি ঘটতে থাকে ও আমরাও ধীরে ধীরে শ্রীহীন হয়ে যেতে থাকি, এটাই পরাধীনতা। এভাবেই নবাবের ভাগ্যের সাথে আমাদের ভাগ্য গাঁথা হয়ে গেছে। বর্তমান বাংলাদেশের দৈন্যদশা দেখে চারিদিকে কেবল নবাবের অভাব বোধ করি। মনে মনে কেবলই কামনা করি মীরজাফরেরা দূরীভূত হয়ে সিরাজউদ্দৌলার মতো দেশপ্রেমিকে দেশ ভরে উঠুক।
নবাব পরিবারের পুরো ইতিহাস আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে পাওয়া যায় না। তাই অনেকেরই জানা নেই যে, পরম করুণাময়ের কৃপায় নবাবের বংশধরেরা টিকে আছে। আমি নিজেও এ সম্পর্কে জেনেছি সম্প্রতি। নবাব সিরাজউদ্দৌলার অষ্টম ও নবম বংশধর (সৈয়দ গোলাম মোস্তফা ও সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেব)-দের চোখের সামনের দেখে আবেগ-আপ্লুত হয়েছি। আমাদের দেশে অনেক শহীদ পরিবার, বুদ্ধিজীবী পরিবার ও ক্ষতিগ্রস্ত অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের পরিবারবর্গ সরকারি সাহায্য, সহযোগিতা ও আনুকূল্য পেয়েছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবারকেও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হোক, সমাজের কাছে এই দাবি আমি করছি।
সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেবের সাহিত্য কর্মগুলো অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ। আমি তার উত্তরোত্তর উন্নতি ও সাফল্য কামনা করছি।

— ড. রমিত আজাদ
বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞানী ও লেখক
rmt_azad@yahoo.com

www.pathagar.com

■ নবাব সিরাজউদ্দৌলা আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি দেশপ্রেমের বাস্তব উদাহরণ হয়ে যুগ যুগ ধরে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করছেন। পলাশীর শিক্ষা আমাদের স্বাধীনতার দীক্ষা। তাঁরই নবমতম বংশধর সৈয়দ গোলাম আব্বাসের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। গোলাম আব্বাসের প্রতি রইল আমার অকৃত্রিম শুভেচ্ছা। আমি তার সকল উদ্যোগে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে প্রস্তুত রইলাম।

— প্রফেসর ড. শেখ আকরাম আলী
বিভাগীয় প্রধান, আইন বিভাগ
সিটি ইউনিভারসিটি, ঢাকা।

Shab বন্ধু হোক প্রকৃতি-পরিবেশে, গড়ে তুলুক মানবিক ঐতিহ্যের বন্ধন মানুষ-মানুষে, গড়ুক বন্ধুত্বের সেতু উজ্জীবিত হোক নবাব সিরাজের চেতনায়

— গোলাপ মুনীর
সহকারী সম্পাদক, দৈনিক নয়াদিগন্ত
সম্পাদক, মাসিক কম্পিউটার জগৎ
১০.৭.১০

■ ২৫৫ বছর পর হলেও নবাব পরিবারের নবম বংশধর নবাব সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেব তার ঐতিহাসিক পরিবারের ঐতিহ্যকে এ প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার এ মহান যুদ্ধযাত্রায় আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত করতে চাই। নবাব পরিবারের সম্মান সুচ্চে অধিষ্ঠিত হোক এ প্রত্যাশা রাখছি।

— মুহা. আলমগীর হোসেন হেলাল
অধ্যক্ষ, ঢাকা সিটি স্কুল
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
সাপ্তাহিক অর্থবিত্ত।
১৯.৯.২০১২ইং

Shab সংগঠনটি সমাজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রতিভাকে বিকশিত করে আগামী প্রজন্মকে বিশ্ববাসীর কাছে সমৃদ্ধশালী বাঙালি জাতি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে, রাখবে- এই প্রত্যাশায়

— মোঃ রুহুল আমিন
শিক্ষক, বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা
২১.৮.১০

www.pathagar.com

■ উদার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে Shab এর আগমন হবে, বিকশিত হবে তারুণ্যের শুভচিন্তা, এ কামনায় শুভেচ্ছাসহ সফলতার দোয়া করছি।

— মাহমুদ বিন হাফিজ
গল্পকার ও লেখক
mahmud.binhafiz@gmail.com

■ নবাব সিরাজউদ্দৌলার গল্প প্রথম শুনেছিলাম আমার বাবার মুখে। তারপর বই পড়ে, সিনামা দেখে যতটুকু জেনেছিলাম তা মনের মধ্যে এক গর্বের একই সাথে দুঃখের ইতিহাস হিসেবে গেঁথে ছিল। টেলিভিশন মাধ্যমে কাজ করতে এসে সেই নবাবের ইতিহাসকে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তার কোনো বংশধরের সঙ্গে এ জীবনে দেখা হবে ভাবিনি। কিন্তু বাস্তবতা হলো বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের ৯ম বংশধর সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেবের সাথে দেখা হলো। তাকে নিয়ে কাজও হলো। সেই সূত্রে একটা বন্ধুত্ব হলো। এসবই আমার ক্ষুদ্র জীবনের হয়তো অতি ক্ষুদ্র ইতিহাস হয়ে থাকবে আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন। তার জীবনের উত্তর উত্তর শুভ কামনা করছি।

— জহির মুননা
সিনিয়র সাংবাদিক
চ্যানেল আই
zahir.munna01@gmail.com

■ ইতিহাসসমৃদ্ধ জাতি সবসময়ই গৌরবের। যে জাতির ইতিহাস নেই- সে জাতি কখনও বড় হতে পারে না। প্রতিদিনের পথ চলায়; প্রতিদিনের কথা বলায় ইতিহাস আমাদের সঙ্গী। আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে থাকি ভবিষ্যৎ চলাকে মসৃণ করতে। নিজেদের ঋদ্ধ করতে।

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে তাঁরই উত্তরসূরি নতুন কিছু লিখবেন নতুন কিছু করবেন- এটা আমাদের বড় পাওয়া। শুভ কামনা থাকলো।

— কাজল ঘোষ
প্রধান প্রতিবেদন
দৈনিক মানবজমিন
kajal-gosh@ yahoo.com

www.pathagar.com

■ গোলাম আব্বাস আরেব সাহেবের বাসায় এসেছি তার একটি সাক্ষাৎকার নিতে, তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৯ম বংশধর- তাঁর সঙ্গে কথা বলে, তার আচরণে মনে হলো আসলেই তিনি সৈয়দ, আসলেই তিনি নবাবের বংশধর। তার সাফল্য কামনা করি।

— লায়েকুজ্জামান
সিনিয়র সাংবাদিক
দৈনিক মানবজমিন
২৬.০৬.২০১২ইং

■ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হলে এই যুদ্ধ আমাদের নতুন করে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের চেতনা জাগ্রত করে। ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে নতুন ধারণার জন্ম দেয়। যা পরবর্তীতে আমাদের বর্তমান রাজনীতিকেও প্রভাবিত করছে। সিরাজউদ্দৌলার বংশধরেরা বাংলাদেশে বসবাস করলেও তারা অগোচরে আছেন। স্বাধীনচেতা নবাবের বংশধর হিসেবে তাদেরকে দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ভূমিকা রাখা সময়ের দাবি।

— লুৎফর রহমান
সিনিয়র রিপোর্টার
দৈনিক মানবজমিন
lutfor 82@gmail.com

■ সাক্ষাৎকারের সুবাদে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৯ম বংশধর এর সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হলো। মানুষ হিসেবে চমৎকার, আমি তার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি।

— জয়নুল আবেদীন
সিনিয়র ফটোগ্রাফার
দৈনিক মানবজমিন
২৬.০৬.২০১২

■ ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্গত অন্যতম প্রদেশ বাংলা বিহার, উড়িষ্যার মোগল শাসনের শেষ প্রান্তের মুসলিম সামন্ত রাজা নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৯ম বংশধর সৈয়দ গোলাম আব্বাসকে জানাই আরক্তিম ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার সত্য চরিত্র নতুন প্রজন্মের কাজে প্রকাশিত হোক এটাই আমার ও আমাদের কাম্য।

— এম. এ. কাদের
এল.এল.বি এবং এম.এ (বাংলা সম্মান)
নকসাবিদ, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
আবাসিক ঠিকানা : বাড়ি নং-৬০, রোড নং-১৭
সেক্টর নং-১১, উত্তরা আ: /এ, ঢাকা।

www.pathagar.com

■ বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা বললেই মনের ক্যানভাসে ভেসে উঠে নবাব পরিবারের স্মৃতিগাঁথা। ১৭৫৭ সালের বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হলেও আজও স্বাধীনতার সূর্য ভোরের আঁধার ভেদ করে উঠতে পারছে না। জানিনা আর কত অপেক্ষা! স্বাধীনতা সত্যিই কি আমরা মীরজাফরের ভয়াল থাবা থেকে আনতে পেরেছি? আজ দীর্ঘদিন পরেও স্মৃতির মণিকোঠায় খুঁজে ফিরি একজন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে। পারবে কি নবাবের বংশধররা সিরাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে? ইনশাল্লাহ পারবে। পারতেই হবে। নবাব পরিবারের বর্তমান বংশধরদের সাফল্যে হেসে উঠুক, এই আমাদের সোনার বাংলাদেশ। এই কামনায়।

— মু. নোমান শরীফ (শিক্ষার্থী)।
জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রাম : দঃ রামপুর (শ্রীপুর)
পো : বালুর চর, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।
msnoman30@gmail.com

■ যেকোনো কিছুর ভবিষ্যৎ সুন্দর হয় তার অতীত ইতিহাসের জন্য। আর তাই আমরা বাঙালিরা মনে প্রাণে লালন করি আমাদের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার শাসন আমল এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে। আর আমাদের এই শেষ স্বাধীন নবাব এর নবম বংশধর জনাব এস. জি. আব্বাস সাহেবের সাথে পরিচিত হয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। সেই সাথে তার চালিত সংগঠন SHAB এর মঙ্গল কামনা করছি।

— শাহাদত হোসাইন
বি. ফার্ম
প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
sumon_pharmacy 081@yahoo.com
আকন্দ নিবাস, মুক্তাগাছা
ময়মনসিংহ

■ আমাদের সকলের প্রিয়. বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার সর্বশেষ বংশধর নবাবজাদা আলি আব্বাসউদ্দৌলা তথা তাঁর পরিবারের সাথে মিলিত হতে পেরে আমি নিজেকে সত্যিই অনেক ভাগ্যবান মনে করছি।

— মোঃ সাইফুল ইসলাম (রানা)
শিক্ষার্থী, মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজ, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
সেক্টর : ১১, রোড : ১৭, হাউজ : ৬০, উত্তরা, ঢাকা।

www.pathagar.com

■ আমার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথা তার জীবন ইতিহাস জানার আগ্রহ অনেক আগে থেকেই। তারপর হঠাৎই তাঁর নবম বংশধর সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেব সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হলো, অনেক পুরাতন ইতিহাস জানলাম, কারণ ইতিহাস সবসময়ই অমর। এছাড়াও তার প্রতিষ্ঠিত 'শাব' এর সম্পর্কেও জানলাম। আমরা তরুণ সমাজ এই ইতিহাস অবশ্যই বুকে লালন করব। সিরাজ পরিবারের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা।

— মোঃ তারিকুল ইসলাম
শিক্ষার্থী, প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
tarikul.tfpv@gmail.com
গাবতলী (মাস্টার পাড়া), বগুড়া
০৩/১১/২০১২ইং

■ আমাদের এই বাংলার এবং ও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা তিনি আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। এখন আমরা তাহার ইতিহাস পড়িয়া জানতে পারি তার বংশধরদের কথা। সিরাজউদ্দৌলার ৯ম বংশধর এস. জি. আব্বাস আরেব, তিনি বাংলাকে ভালোবেসে সিরাজউদ্দৌলার আদর্শ চেতনা বাস্তবায়নের যে ডাক দিয়েছেন, তার এ প্রচেষ্টা সফল হোক, আমি এবং আমরা এই শুভ কামনা করছি।

— মোঃ ইয়াছিন মোল্লা (কৃষক)
গ্রাম :- কুশখালী
পো:- কুশখালী
জেলা :- সাতক্ষীরা, বাংলাদেশ ০৩/১১/২০১২

■ আমি নোয়াখালীর মাইজদী থেকে এসেছি, ঢাকায়। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরিবারের নবম বংশধর এস. জি. আব্বাস আরেব সাহেবের বাসায় এসেছি এবং তাঁকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। অনেক কথা শুনিলাম প্রথম বারের মতো।

সবচেয়ে ভাববার বিষয় এত প্রতিকূলতার মধ্যে বেগম লুৎফা থেকে শুরু করে এখন সিরাজ পরিবারের নবম বংশ কীভাবে বেঁচেছিলেন? বড় কথা হলো আল্লাহ যাকে বাঁচিয়ে রাখেন তাঁরা কোনো কোন ভাবে বেঁচে যান। সঠিক ও সত্য কথাটা পরবর্তী প্রজন্ম কে জানিয়ে যাওয়ার জন্য।

যাহা হউক আমি উনার সাফল্য কামনা করি।

— সেলিম খান
C/o. খান মঞ্জিল
গ্রাম : নবাবপুর, ডাকঘর : নবাবপুর
থানা : সোনাগাজী, জেলা : ফেনী
বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

ছোটবেলা যখন বই পুস্তকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও পলাশী প্রান্তর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু জানলাম তখন থেকেই মনে একটাই প্রশ্ন বারবার জেগে উঠত নবাবের পরিবার-পরিজন কেহ বেঁচে আছে কিনা, নাকি নবাবের মতো তাহাদেরকেও হত্যা করা হয়েছে। আর বেঁচে থাকলেও তাহারা কোথায় আছে, কেমন আছে, কিভাবে আছে, এসব প্রশ্নগুলো আমাকে প্রায় সময় নাড়া দিত। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার করুণ পরিণতির কথা শুনার পর থেকেই নবাবের প্রতি আমার খুব ভালোবাসা জন্মেছিল। যখনই কোথায়ও নবাবের কথা শুনতাম তখনই নবাবের জন্য আমার মনে খুব কষ্ট হতো। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন দৈনিক সমকাল পত্রিকার পাতায় দেখি নবাবের বংশধর আমাদের এই দেশেই বসবাস করছে। উক্ত পত্রিকাটি পড়ে জানতে পারলাম নবাবের নবম বংশধর এস. জি আব্বাস আরেব এর লেখা গবেষণাধর্মী কিছুসংখ্যক বই প্রকাশিত হওয়ার কথা। পত্রিকাটিতে এস. জি আব্বাস আরেব ভাইয়ের মোবাইল নাম্বারটিও দেওয়া ছিল। আমি নাম্বারটি পেয়ে সাথে সাথে এস. জি আব্বাস আরেব ভাই এর কাছে ফোন দেই। ভাইয়ের সাথে আমার অনেকক্ষণ ফোনে কথাবার্তা হয় এবং ওনার কাছ থেকে উক্ত বইটি সংগ্রহ করি। বইটি পড়ে আমি নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তাহার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম যাহা আমি সেই ছোটবেলা থেকে খোঁজে আসছি। বইটি পড়ে আমার কাছে খুব খারাপও লাগছিল নবাবের জন্য। একটা কথা বলতে ইচ্ছে হয় "ইতিহাসসহ আমাদেরকে বলে দিচ্ছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা তেমনি বাংলার স্বাধীনতার জন্য প্রথম শহীদ ব্যক্তিও হলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা।"

নবাব সিরাজউদ্দৌলার নবম বংশধর এস. জি আব্বাস আরেব ভাইয়ের সাথে কথা বলে আমার কাছে খুব ভালোই লাগল আর উনার কথাবার্তাও খুব সুন্দর ও অমায়িক। যাহা একজন নবাব পরিবারের থাকা দরকার। সত্যি উনার কাছে নবাব পরিবারের ঐতিহ্যের সব কিছুই আছে। আমি আরেব ভাইয়ের ও তাহার পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজনের মঙ্গল, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। আল্লাহ যেন ভাইকে ভালো কিছু করা তৌফিক ও সুযোগ করার দেয় সেই প্রার্থনাই করি।

— মহিন উদ্দিন
জজ কোর্ট, চাঁদপুর
১৫.১০.২০১৪ইং

www.pathagar.com

■ মহান সেই বংশধর নবাব সিরাজউদ্দৌলার নবম পুরুষ জনাব সৈয়দ গোলাম আব্বাসের সঙ্গে সৌভাগ্যক্রমে আমার দর্শন ও সাক্ষাৎ হওয়ায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। আমি বাংলার এ ঐতিহাসিক বংশধরের সাফল্য কামনা করছি ও বাংলার ইতিহাসকে আরো নিপুণভাবে তুলে ধরতে অনুরোধ করছি। এই প্রত্যাশায়.....

— মোঃ শাহ আলম
কচুবুনিয়া, মোংলা
বাগেরহাট
md.shahalam218@yahoo.com

নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও বেগম লুৎফুন্নিসা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com